ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

মূল
ফরিদ বেজদী আফেন্দী
(মিসর)

কোন্ প্রবৃত্তির কাছে ওরা আজ পড়িয়াছে বাঁধা?
গোলাবের পাপড়িতে ছুঁড়িতেছে আবর্জনা,কাদা
কোন্ শয়তান?
বিষাক্ত কামনা দিয়ে কে ভরায় আকাশের রঙিন খিলান?

০ ০ ০

কার হাতে হাত দিয়ে নারী চলে কাম সহচরী?
কোন্ সভ্যতার?
কার হাত অনায়াসে শিশুকণ্ঠে হেনে যায় ছুরি?
কোন্ সভ্যতার?

০ ০ ০

মানুষ তোমার হাতে করিয়াছে কবে আত্মদান,
তারি শোধ তুলে নাও হে জড়-সভ্যতা শয়তান!
শিশুর শোণিত হেসে অনায়াসে করিতেছে পান,
ধর্ষিতা নারীর দেহে অত্যাচার করিছ অম্লান,

জনতার সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বে উঠি অতি অনায়াসে,
তারে তুমি পেলে যাও পথ প্রান্তে নর্দমার পাশে।
জড়পিণ্ড হে নিঃস্ব সভ্যতা!
তুমি কার দাস?
অথবা তোমারি দাস কোন্ পশুদল?

০ ০ ০

কুক্কুর, কুক্কুরী
কোন্ ব্যভিচারে তারা পরস্পর হানিতেছে ছলনার ছুরি,
আনিছে জারজ কোন্ মৃত সভ্যতার পদতলে!
উরুর ইঙ্গিত দিয়ে তাদের নারীরা আজ মৃত্যুপথে চলে,
লোভের বিকট ক্ষুধা বুকে নিয়ে অত্যাচারী পুরুষেরা চলে,
মানুষের পথ ছেড়ে বহু নিম্নে মৃত্যুর অতলে।

-ফররুখ আহমদ

ভূমিকা

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

در رہ عشق نہ شد کس بہ یقین محرم راز
ہر کسے بر حسب فہم گمانے دارد

প্রণয় ব্যথা বলব কারে ভরসা যে নেই কারুর 'পরে,
হাজার মুনির মত হাজার যে চলছে যে যার ধরন ধরে।

✪ ✪

শিক্ষা ও চিন্তাধারার বৈষম্য আজ এ দেশবাসীকে দু'দলে ভাগ করে ফেলেছে। প্রাচীনপন্থী আর নব্য সমাজ। মিসরেও প্রায় একই দশা। নবীন আর প্রাচীনের এ বিরোধ আর বৈষম্য এখনকার মত সেখানেও বিদ্যমান। এক্ষেত্রের এ সাযুজ্য সত্ত্বেও দু'দেশের নব্য সমাজের ভেতরে একটা বড় রকমের পার্থক্য হচ্ছে এই-এ দেশে আধুনিক শিক্ষা আমাদের জন্যে একমাত্র চাকরীর সংস্থান ছাড়া জাতীয় কিংবা শিল্প সাহিত্যজাত কোন কল্যাণ আনে না। পক্ষান্তরে মিসরে এই আধুনিক শিক্ষা চাকরী বাকরীর সুরাহা করে দেয়া ছাড়াও বহু ক্ষেত্রে নিত্য নতুন কল্যাণের বার্তা বয়ে আনে। সে দেশে আধুনিক শিক্ষা নব্য দলের ভেতরে জ্ঞান শিক্ষার তৃষ্ণা ও প্রয়াসকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। ইদানীং যে সব মূল্যবান বই-পুস্তক আরবী সাহিত্যকে গৌরবের উচ্চ মার্গে তুলে ধরেছে, তার বেশীর ভাগই এই নব্য দলের সাধনার ধন।

দু'দেশের ভেতরকার এ বৈষম্যের ফল দাঁড়াল এইঃ এ দেশের নব্য দল ইউরোপের হুবহু পদাংকানুসরণ দ্বারা যুগের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতার চরম নিদর্শন দেখাতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। অথচ স্বীয় পরিবেশ ও অবস্থা সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞতার দরুণ আধুনিক শিক্ষার প্রবাহে যা কিছু বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এমন কি ভাল-মন্দ বুঝবার ক্ষমতাটুকুও তারা হারিয়ে বসেছে। অপর দিকে মিসরের নব্যদল ইউরোপের সবকিছুই অশেষ গুরুত্ব ও আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করে বটে; কিন্তু তা নেহাৎ সমালোচনার দৃষ্টি নিয়েই করে থাকে।

ইউরোপের পদাংকানুসরণ করতে গিয়ে আমাদের দেশে আজ যে নবীন ও প্রাচীনের বিরোধ ও বিতর্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তা থেকে মিসরও মুক্ত নয়। তবে সেখানে বিতর্কমূলক বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে যা কিছু লেখা হয়, তা যথেষ্ট দলীল প্রমাণের সাহায্যে অতি পরিমার্জিত ভাষায়ই লেখা হয়।

অধুনাতন বিতর্কমূলক বিষয়গুলোর ভেতরে পর্দা প্রথা বনাম নারী স্বাধীনতা অন্যতম। এদেশের মত সেদিন এ বিতর্ক মিসর ভূমিকেও তোলপাড় করে তুলেছিল। মিসরের শিক্ষাবিদ মহলের অন্যতম প্রভাবশালী দিক্‌পাল হচ্ছেন মিঃ কাসেম আমীন বেগ। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন পর্দা প্রথার একজন জোর সমর্থক। ইউরোপের নারী স্বাধীনতার আন্দোলনকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। এমনকি ইসলামের পর্দা প্রথার সমর্থনে ফরাসী ভাষায় একখানা প্রচার পুস্তিকা লিখে তিনি ফ্রান্সের বুকে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত শেষ জীবনে তিনি সুর বদলালেন। ইউরোপের নারী স্বাধীনতার আন্দোলনকে ঘৃণা করার বদলে সহসা একদিন তিনি ইসলামের পর্দা প্রথার বিরুদ্ধেই নাক সিটকাতে শুরু করলেন। এমনকি পূর্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েই তিনি নারী স্বাধীনতার সমর্থনে একে একে দুখানা পুস্তিকা লিখে ফেল্‌লেন। তার প্রথমটার নাম দিলেন 'তাহ্‌রীরুল মারআত' (নারী স্বাধীনতা) আর দ্বিতীয়টার নাম রাখলেন 'আল্‌ মারাআতুল্‌ জাদীদাহ্‌' (আধুনিক নারী)।

বলা বাহুল্য, তাঁর এ বই দুখানা মিসরবাসীকে নতুনভাবে ভাবিয়ে তুললো। তাই তার জবাব দেবার জন্য বিভিন্ন সাময়িকীতে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করা হল। শুধু তাই নয়, একে একে পাঁচখানা তথ্যবহুল পুস্তক লিখে তার দাঁতভাংগা জবাব দেয়া হল। তার ভেতরে একখানা বই লিখেছেন বৈরুতের জনৈক বিখ্যাত শিক্ষাবিদ। অবশিষ্ট চারখানা বই মিসরের পণ্ডিতদেরই গবেষণার ফল।

তন্মধ্যে 'আল মারআতুল মুসলিমা' মিসরের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ফরীদ বেজদী আফেন্দী কর্তৃক রচিত হয়েছে। সেই বইয়ের অনুবাদ করে আমি আমার দেশবাসীকে তাঁর অগাধ মনীষাদীপ্ত মূল্যবান রচনাটির সাথে পরিচিত রাখতে চাই। এর ফলে একদিকে যেমন নারী স্বাধীনতার বর্তমান মুখরোচক শ্লোগানের যথার্থ রূপ সম্পর্কে আমরা যথাযথ জ্ঞানলাভে সমর্থ হব, অপরদিকে তেমনি আমাদের দেশের নব্য সমাজ ও মিশরের নব্য দলের ভেতরকার আধুনিক শিক্ষাপ্রসূত রুচি ও পরিণামগত পার্থক্যটাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

✪ ✪

বিগত প্রায় বিশ বছর অবধি এ-দেশেও উক্ত সমস্যাটি নিয়ে বেশ কথা কাটাকাটি ও লেখনী বিনিময় চলছে। এমনকি এটাকে কেন্দ্র করে বিশেষ ধরনের সাহিত্যও গড়ে উঠেছে। কিন্তু সে সব সাহিত্য সৃষ্টির মূলে রয়েছে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। এদেশের নব্য সমাজ যখনই দেখা গেছে যে, তাঁরা এর বিরুদ্ধে যা কিছু উত্থাপন করেছেন, তা আগাগোড়া ইউরোপীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়েই করেছেন। তাতে তাঁদের স্বকীয়তার গন্ধমাত্রও নেই। এ ব্যাপারে যে তাঁদেরও কিছু ভাবার বা বলার রয়েছে, তার বিন্দুমাত্র পরিচয় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য প্রভাব নব্য সমাজকে এতখানি মূক, অন্ধ সাজিয়ে ফেলেছে যে, তার বিরুদ্ধে তাঁরা টুঁ শব্দটি করতে সাহসী হয়নি। এ যেন ইউরোপের সুরেই হ্যাটধারী কণ্ঠের স্থলে টুপীধারী কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে মাত্র।

অপরদিকে পর্দার সমর্থনে যাঁরা কলম ধরেছেন তাঁদের অধিকাংশই হলেন প্রাচীনপন্থী-সেকেলে শিক্ষার অনুসারী। ইউরোপের বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিপ্লব বিবর্তন সম্পর্কে তাঁদের কিছুই জানা নেই। তাই তাঁরা যা কিছু লিখেন, কেবলমাত্র ধর্মের দোহাই পেড়েই তার যৌক্তিকতা প্রমাণের প্রয়াস পেয়ে থাকেন। অথচ, আজ তো কেবল ধর্মের যাদুই নব্য সমাজের ভেতরে আদৌ প্রতিক্রিয়া করতে সমর্থ নয়।

ফরীদ বেজদী আফেন্দী ছিলেন ইউরোপের বিখ্যাত কয়েকটি ভাষাতেই সমান পারদর্শী। তা ছাড়া শিক্ষাবিদ ও মনীষী হিসেবে তিনি পাশ্চাত্য জগতেও বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। তাই তিনি ইউরোপের যথাযথ অবস্থা ও যত রকমের মতামত সামনে রেখেই নিজের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। ফলে, তাঁর 'আল মারআতুল মুস্লিমা' নব্য সমাজের ওপর যতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, তা এখানকার ধর্মের ভিত্তিতে লেখা যে কোন বই থেকে আশা করা যায় না।

নারী স্বাধীনতার আন্দোলন আজ আমাদের সামনে মূলত এক গুরুতর সমস্যারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইউরোপের কার্যধারা দেখে বাইরের থেকে এ আন্দোলনের পেছনে ইউরোপীয়দের যতখানি সমর্থন রয়েছে বলে মনে হয়, আসলে তা নেই। সেখানকার সুধী মহলের অধিকাংশই এ আন্দোলনের বিরোধী। সেখানকার বৃহত্তর সূক্ষ্মদর্শী সমাজ এই নারী স্বাধীনতার মহড়াকে ঘৃণার চোক্ষে দেখেন। এমন কি এ আন্দোলনের পরিণামে তাঁরা এমন একটি অশুভ দিনের আশংকা করছেন যেদিনে মানব সভ্যতা ও জীবন ধারা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হবে বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

আমাদের এতদ্দেশের তথাকথিত পর্দা বিরোধী দল ইউরোপের বাহ্যিক চালচলন দেখেই হৈ চৈ শুরু করে দেন।। তাদের ভেতরকার খবর নেবার প্রয়োজন মনে করেন না। এরূপ সংকীর্ণ দৃষ্টি ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দরুণ তাঁরা এ আন্দোলন সম্পর্কে সে-দেশের সুধী সমাজের বিপরীত মতামত জানবার অবকাশ পান না। অপরদিকে পর্দার অন্ধ সমর্থক দল ইউরোপের ভাষা ও কার্যধারা সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন বলেই সেখানকার সৃষ্ট এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করতে সমর্থ হচ্ছেন না। তাই প্রকৃত অবস্থা থেকে উভয় দলই চরম অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আছেন।

ফরীদ বেজদী আফেন্দী পাশ্চাত্যবিশারদ বলেই এ ক্ষেত্রে সাফল্যজনকভাবে পদক্ষেপ করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি সবার আগে তাদের মতামতই উদ্ধৃত করেছেন যাদের বাইরের বুলিতে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা মানব সভ্যতা ও জাতীয় কল্যাণের বেলায় নিরেট অন্ধ সেজে চলেছি। তিনি আমাদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, যাদের পদাংকানুসরণ করতে গিয়ে আমরা হিতাহিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে বল্গাহারা হয়ে পড়েছি, সেই আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার স্রষ্টাগণ মূলত নিজেদের অনুসৃত কার্যধারাকে কত ঘৃণার চক্ষে দেখেছেন! ইউরোপের বিখ্যাত মনীষীদের মতামত একের পর এক আমাদের সামনে তুলে ধরে পর্দা বিরোধীদের তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বাইরের শ্লোগান বা চাকচিক্য সব সময় আসল বস্তুর পরিচয় হয়ে উঠে না। তাই দেখা যাচ্ছে, যে আশার কুহকে মেতে এদেশের নারী স্বাধীনতার আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, ইউরোপেই সে আশার গুড়ে বালি পড়েছে।

✪ ✪

উপরে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে মোটামুটি আলোকপাত করার পরে এক্ষণে আমি 'আল মারআতুল মুস্‌লিমা'র মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে দুকথা বলব।

বলা বাহুল্য, নারী স্বাধীনতার সমর্থনে যতকিছু যুক্তি প্রমাণ যোগাড় করা হয়েছে, তার ভেতর উল্লেখযোগ্য যুক্তিমাত্র তিনটি। তাছাড়া আর যা কিছু বলা হয় সে সব হচ্ছে সেই তিন যুক্তিরই বিশ্লেষণজাত শাখা-প্রশাখা মাত্র। গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তিনটি এইঃ

১। (ক) মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বাধীন আর সেই প্রাকৃতিক স্বাধীনতায় মানুষে মানুষে কোন বৈষম্য বা তারতম্যের স্থান নেই আদৌ। তাই, কোন্ বিশেষত্বের বদৌলতে মানুষের একটা শ্রেণী স্বাধীনতার স্বাদ পুরোমাত্রায় ভোগ করবে আর অপর শ্রেণী তা থেকে চিরতরে বঞ্চিত থাকবে?

(খ) যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্মত জীবনযাপনের জন্য মানবীয় গুণাবলীর উৎকর্ষ অপরিহার্য, তখন কোন্ অপরাধে নারী সমাজকে সে ক্ষেত্র থেকে দূরে ঠেলে রেখে চিরতরে পংগু রাখা হবে?

আবহমান কাল থেকেই পুরুষ সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, শাসন-শৃঙ্খলা-এক কথায় সর্ববিধ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রই নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছে। পক্ষান্তরে, নারী সমাজকে সর্বদাই সে সব ক্ষেত্র থেকে দূরে ঠেলে রাখা হয়েছে। তাদের এমন কি অতি প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষাটুকু থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়। যদি কোন দরদী পুরুষ নারীদের এ নিপীড়িত দশা দেখে ব্যথিত হন, তিনিও তাদের জন্য সাধারণ শিক্ষাই যথেষ্ট মনে করে থাকেন। তা হলে জিজ্ঞাস্য, নারী কি মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়? তাদের কি মেধা বা মননশক্তি নেই? এর জবাব যদি 'হ্যাঁ' বাচক হয়, তা হলে শিক্ষা ও সাংস্কৃতির জগতে তাদের প্রবেশাধিকারকে এ ভাবে জোর করে খর্ব করা কি প্রকাশ্য যুলুম নয়?

২। নারীদের আজ পর্যন্ত শিক্ষার স্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে এবং গোটা সাংস্কৃতিক জগৎ পুরুষদেরই করতলগত রয়েছে। তাই একথা বলা আদৌ ঠিক হবে না যে, তাদের ভেতরে পুরুষের মত ধী-শক্তি একান্তই দুর্লভ। কারণ, তাদের তো তা প্রমাণ করার সুযোগই দেয়া হয়নি। অধুনা ইল্‌মে তাশরীহ্‌ ও দেহ বিজ্ঞানের (ফিজিওলোজী) (তত্ত্বানুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে যে, নর-নারীর মেধা ও মনন শক্তি সম্পূর্ণ সমান। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই ইউরোপে নর-নারীর সমানাধিকার মেনে নিয়ে নারী স্বাধীনতাকে সমর্থন করা হয়েছে। ইউরোপে আজ এমন কোন কার্যক্ষেত্র নেই যেখানে পুরুষের সাথে সমান তালে পা রেখে নারীরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে না। সেখানে নারী ডাক্তার, নারী অধ্যাপিকা, নারী উকিল, ব্যারিস্টার, জজ-এক কথায় তারা সব ক্ষেত্রেই পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের সমকক্ষতা প্রমাণ করে চলেছে। এতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, নারীদের পুরুষের আধিপত্য থেকে মুক্তি দিলে তারা যথাযোগ্য শিক্ষার মাধ্যমে যে কোন ক্ষেত্রেই পুরুষদের চাইতে কম দক্ষতার পরিচয় দেবে না।

৩। আইয়ামে জাহেলিয়াতে অর্থাৎ মূর্খ যুগে নারীদের সম্পর্কে প্রাচ্যে যে অন্যায় ও অবিচারমূলক মতামত ও সিদ্ধান্ত কায়েম করা হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর এ সভ্য যুগেও তা অব্যাহত গতিতে কার্যকরী হয়ে চলেছে। মুসলমানেরা সেদিন থেকেই নারীদের স্বল্পজ্ঞানা ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ভেবে আসছে। এমনকি তাদের তারা দুনিয়ার যত ফেতনা ফাসাদের মূল বলেও নির্দেশ করে থাকে। পক্ষান্তরে, ইউরোপে আজ নারীদের যথেষ্ট মানমর্যাদা দেয়া হচ্ছে এবং তাদের পুরুষ জাতি থেকে কোন অংশেই হেয় মনে করা হয় না।

এ তিনটি মোদ্দা কথার ভিত্তিতেই মিসরের মত এদেশের পর্দা বিরোধীদলও নারী স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতি করে থাকেন। পরন্তু, এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁরা যতসব অলীক ও অদ্ভুত কাহিনী ও রহস্যজাল সৃষ্টি করে চলেন।

তাই ফরীদ বেজদী আফেন্দী এ তিনটি প্রশ্নকে সামনে রেখেই আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। তিনি প্রশ্ন তিনটির বিভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন খন্ডে বিভক্ত করে মোট তেরটি অধ্যায়ে সেগুলো পৃথকভাবে পর্যালোচনা করেছেন। তার ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর নাম দেয়া গেলঃ

১। নারীর প্রকৃত স্বরূপ কি?

২। নারীর স্বাভাবিক কর্তব্য কি?

৩। দৈহিক ও মনন শক্তিতে নারী ও পুরুষ কি সমান?

৪। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সাথে সমকক্ষতা করতে পারে কি?

৫। পর্দা নারীসুলভ গুণাবলীর পরিপোষক নয় কি?

৬। পর্দা নারীর স্বাধীনতা ও উন্নতির অন্তরায় কি?

৭। জড় সভ্যতার বদৌলতে নারী কি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে সার্থক জীবন লাভ করেছে?

৮। নারীদের পুরুষ থেকে দূরে থাকা উচিৎ নয় কি?

৯। পর্দার স্বাভাবিক প্রভাব নর-নারীর ভেতর থেকে দূর হওয়া কি সম্ভব?

১০। মুস্লিম নারী সমাজের শিক্ষাপদ্ধতি কি হবে?

বলা বাহুল্য, ফরীদ বেজদী আফেন্দী বেশ যোগ্যতার সাথেই এসব প্রশ্নের জবাবের ভেতর দিয়ে 'নারী স্বাধীনতা' সমস্যার যথার্থ সমাধান নির্দেশ করেছেন।

- ০ -

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

নারীর স্বাভাবিক দায়িত্ব

নিখিল সৃষ্টির অবিনশ্বর নিয়ন্তা তাঁর সৃষ্ট জীবকে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোত্রে ভাগ করে পৃথক পৃথক দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন। কারণ, তাঁর লীলাপূর্ণ বৈচিত্র্যময় জগতের বিভিন্নমুখী প্রয়োজনীয়তা মেটাবার জন্য একই ধরনের দৈহিক ও মনন শক্তি যথেষ্ট নয়। তাই যে শ্রেণীকে যে প্রয়োজনের তাগীদে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে তদুপযোগী দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা দান করা হয়েছে। এ দৈহিক ও মানসিক তারতম্যের ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই তাঁদের জীবন-ধারা ও জীবিকা-পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীকে ভেতরে ও বাইরে সেভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে যা তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য। এবারে উদাহরণ নিন।

প্রাণীজগতের অন্যতম সৃষ্টি হচ্ছে উট আর তার খাদ্য হচ্ছে কন্টকাকীর্ণ বিটপীর পত্র পল্লব। উটের জিভ ও দাঁতগুলোকে তাই তদনুপাতে কঠিন ও কাঁটাভরা ডালগুলো সহজেই ভেংগে নিয়ে চিবিয়ে খেতে সমর্থ হয়। পরন্ত তার পাকস্থলীর পরিপাক শক্তিকে এতই বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, সেই কঠিন পদার্থগুলো সে নিমেষেই হজম করে ফেলতে সমর্থ হয়।

বাঘের খোরাক অপরাপর জীব। তাই তার দন্ত-নখরগুলো এত কঠোর ও তীক্ষ্ণ করে দেয়া হয়েছে যে, ভেড়া বকরী নিপাতনের জন্যে তার একটিমাত্র থাবাই যথেষ্ট।

সৃষ্টি জগতের এ সব বিভিন্ন ধারার প্রয়োজন ও দায়িত্ব সম্পাদনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও রীতি-প্রকৃতিকেই বলা হয় কৃষ্টি বা সৃষ্টির তথা প্রকৃতির বিধান। যখন কোন বিশেষ শ্রেণী স্বীয় স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত দায়িত্ব (ভুলে গিয়ে অপরের ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা শুরু করে) কিংবা স্বীয় দায়িত্বে অবহেলাভরে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটায়, তখনই প্রাকৃতিক বিধানের বুনিয়াদ হয় টলটলায়মান।

এ গভীর রহস্যের দিকে ইংগিত করেই বিশ্বনিয়ন্তা আমাদের সবক দিলেন ঃ

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

(বল, আমাদের প্রভুই তো প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করে যার যার পথ নির্দেশ করেছেন।)

তিনি আরও বললেন ঃ

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ

(নিশ্চয়ই আমি প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করেছি।)

তাই প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা যখন বলেন, "প্রকৃতির কোন কিছুই স্বীয় পরিমাপ ও পরিসীমায় বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম স্বীকার করে না", তখন তারা নিখিল স্রষ্টার এ অমোঘ বাণীরই প্রতিধ্বনি তুলে থাকেন মাত্র।

মানুষ যে প্রকৃতিগতই স্বাধীন, আজ তা সন্দেহাতীত সত্যে পরিণত হয়েছে। সাধারণতঃ প্রতিটি কাজ যে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনুগত, এটাই তার স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। স্বাধীনতার মানেই স্ব-দায়িত্বের অধিকার। তাই মানুষের প্রকৃতিদত্ত স্বাধীনতা স্বীকার করার সাথে সাথে তার প্রকৃতিগত দায়িত্বের কথা ভুলে গেলে চলবে না। এ দায়িত্বের যথাযথ সম্পাদনই সাংস্কৃতিক বিধানের সারকথা।

মানুষ বলতেই এমন কতকগুলো বিপরীতধর্মী শক্তির সমন্বয় বুঝায়, যা তাকে ভাল ও মন্দ দুদিকেই উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করে থাকে। একদিকে তার ভেতরকার কল্যাণকর শক্তিগুলো যখন সুন্দর গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা করে, অপরদিকে তখন তার ইতর বিশেষণগুলোর বহিঃপ্রকাশের জন্য ভেতরের ক্ষতিকর শক্তিগুলো চাপ দেয়। এদ্বন্দ্বকেই আমরা কুপ্রবৃত্তির ও সুপ্রবৃত্তির টানাপোড়েন বলে আখ্যায়িত করে থাকি।

মানুষের ভেতরে দিনে দিনে একের পর এক এমন সব অজস্র ক্ষতিকর বাসনা-কামনা দানা বেঁধে উঠে, যার প্রচণ্ড শক্তি ও প্রভাবের চাপে সে মোহাবিষ্ট হয়ে বিবেক ও জ্ঞানহারা হতে বাধ্য হয়। কুশিক্ষা ও কুসংস্কার তার সেই অশুভ শক্তিগুলোকে অধিকতর সতেজ ও সক্রিয় করে তোলে। বস্তুত, কুশিক্ষা ও কুসংস্কার সে শক্তিগুলোকে এতই দুর্বার করে তোলে যে, মানুষ তখন জড় পদার্থের মত সেই কুপ্রবৃত্তিগুলোর হাতের ক্রীড়নক সাজতে বাধ্য হয়। সেগুলোর ইংগিত ছাড়া তখন যেন তার আর কিছুই করার ক্ষমতা থাকে না। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতই মানুষ স্ব-দায়িত্ব বিস্মৃত হয়।এমন কি অপরের দায়িত্বের প্রতিও সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হয় না।

বলা বাহুল্য, কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে যার দশা এতখানি মর্মান্তিক ও শোচনীয় হয়ে উঠে, শিক্ষা-দীক্ষা কিংবা বিজ্ঞান দর্শন কোন কিছুই তার বিন্দুমাত্র কল্যাণে আসে না।

কৃষ্টি ও ধর্ম তাই মানুষের প্রকৃতিগত স্বাধীনতাকে বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত করেছে। প্রত্যেক শ্রেণীর দায়িত্ব ভাগ করে প্রত্যেককে স্ব স্ব দায়িত্বের আওতায় সীমাবদ্ধ রেখেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে যে যতটুকু স্বাধীনতা লাভের অধিকারী, তাকে ততটুকু স্বাধীনতাই দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যে স্বাধীনতা তাদের দায়িত্বে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তাকে অপরাধ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

এখানে এই মূলনীতির ভিত্তিতে বিচার-বিবেচনা করে বের করতে হবে যে, নারীর স্বাভাবিক দায়িত্ব কি? আর সে দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ ধরনের কতটুকু স্বাধীনতা লাভের তারা উপযোগী? সাথে সাথে এও দেখতে হবে যে, কোন্ ধরনের স্বাধীনতা তাদের সে পবিত্র দায়িত্ব প্রতিপালনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

একথা তো দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট ও সর্বকালের সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, নিখিল স্রষ্টা নারী জাতিকে মাতৃত্বের তথা মানব জাতির সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের পরম গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রকৃতির বিধান অনুসারেই তারা আবহমান কাল থেকে সে দায়িত্ব ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কম-বেশী পালন করে আসছে। মূলত এটাই তাদের কর্তব্য। পরম কুশলী সৃষ্টিকর্তা সেই গুরুদায়িত্ব যথযথভাবে প্রতিপালনের জন্যই তাদের প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা দান করেছেন।

পক্ষান্তরে, পুরুষ জাতিকে তিনি সেসব থেকে স্বভাবতই বঞ্চিত রেখেছেন। ফলে, পুরুষের পক্ষে নারীর সে বিশেষ দায়িত্বটি যথাযথভাবে সম্পাদন করা নেহাতই শক্তি বহির্ভূত কাজ। তেমনি, পুরুষকে তাদের বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য যথোপযোগী দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। নারীদের আবার তা থেকে প্রায় বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাই নারীর পক্ষেও পুরুষের কঠোর ব্রতগুলো সম্পাদন করা আদতেই দুরূহ ব্যাপার।

এবার আমি নারী জাতির বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হব। আমরা দেখেছি, মানব জাতির সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের জন্য সৃষ্টিকর্তা পর পর চারটি স্তর নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। গর্ভ, প্রসব, স্তন্যদান ও লালন পালন। বলা বাহুল্য, এর প্রতিটি অধ্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেসব অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কালগুলোও নারীর জীবনের বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ ও সংকটময় সময় বৈ নয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, মানব শিশুর সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা.ও বিশেষ বিধি ব্যবস্থা অপরিহার্য। তাতে বিন্দুমাত্র শিথিলতা দেখা দিলে কঠিন বিপদ ও মারাত্মক ব্যধি দেখা দেবার আশংকা রয়েছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাই একথা ভালভাবেই জ্ঞাত রয়েছে যে, মানুষের জীবনের সে চারটি স্তরের বিশেষ করে প্রথম তিনটি স্তর অতিক্রমের সময়ে মাতৃজাতিকে জীবনের এক সংকটময় অধ্যায় উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়। এমন কি এর কোন কোন স্তরে তারা জীবনের আশা জলাঞ্জলি দিতে পর্যন্ত বাধ্য হয়। অবশ্য অভিজ্ঞতা একমাত্র তাদের রয়েছে যারা পারিবারিক জীবন যাপন করেছে ও সন্তান-সন্ততির মুখ দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে। তারা ভালভাবেই বুঝতে পারে যে, মাতৃজাতিকে কত দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে সেই সংকটময় অধ্যায়গুলো পার হয়ে আসতে হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটা প্রধান অংশ মানব জীবনের সেই চারটি স্তর ও তৎসংশ্লিষ্ট জীবনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য-বিধান সম্পর্কে ব্যয়িত হয়েছে। প্রাচীন আধুনিক যুগের অসংখ্য শিক্ষাবিদ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ তাঁদের গোটা জীবন সেসব সমস্যার সমাধানকল্পে অশেষ গবেষণা ও অজস্র গ্রন্থাবলী রচনায় নিয়োজিত রেখে চলেছেন। তাদের সে মূল্যবান গ্রন্থগুলো অধ্যায়ন করলেই আমরা মানব জীবনের সেই চারটি স্তরের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করতে সমর্থ হব। মানুষের মূর্খতা ও অজ্ঞতার বুনিয়াদ সে সময়কার অসাবধানতার ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষের জীবনের বিভিন্নমুখী সৌন্দর্যের উৎস সেই সময়ের সতর্কতামূলক ব্যবস্থাপনাকেই বলা হয়েছে।

গর্ভ

গর্ভের কাল স্থির করা হয়েছে সাধারণত নয় মাস। এ সময়টি নারীর জন্যে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন মুহূর্ত যে, তারা এমন কি তখন ঘরকন্নার সাধারণ দায়িত্বগুলোও সম্পাদন করতে অপারগ হয়ে থাকে। মাতৃজাতির তখনকার ক্ষুদ্রতম ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়াও কেবলমাত্র তার দেহেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তার গর্ভস্থ সেই সুকোমল ও দুর্বলতম মানুষটিও তার থেকে প্রভাবান্বিত হয়, যার সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের দায়িত্ব সর্বতোভাবে তার ওপরেই ন্যস্ত থাকে। এই নয় মাসে গর্ভজাত সন্তানের ওপর বিভিন্ন মৌসুম আবর্তিত হয় এবং প্রত্যেক মৌসুমেই বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়া ও নিদর্শন দেখা দেয়। প্রত্যেকটি নিদর্শনকালে বিশেষ ধরনের সতর্কতা ও রক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

গর্ভাবস্থায় মাতার প্রত্যেকটি অবস্থা দ্বারা সন্তান বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। শিশুর দুর্বলতা বা সবলতা, এমনকি বাঁচা-মরার প্রশ্নও মাতার তখনকার সতর্কতা ও রক্ষা ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসাবিদ্‌দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, গর্ভাবস্থায় নারীকে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে নিজে চিন্তা ও কার্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, মাতার অসতর্কতার দরুণ ভবিষ্যতে দৈহিক ও মানসিক বৈকল্য পরিলক্ষিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ইউরোপে অজস্র অভিজ্ঞতা থেকে ওপরের অভিমতের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন শিশুর ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাস, চাল-চলন ও দৈহিক গঠন-গাঠন কিংবা শক্তির তারতম্য সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে, তার মূলে রয়েছে গর্ভধারিণী মায়ের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়া।

ফ্রান্সের এক শ্বেতকায় দম্পতির হাবশীবৎ কৃষ্ণকায় সন্তান জন্ম নেয়ায় সেখানকার ডাক্তাররা এরূপ বৈসাদৃশ্যের ব্যাপারে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তারপর বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেল যে, গর্ভাবস্থায় সে ভদ্রমহিলা যে টেবিলটা সামনে রেখে সচরাচর বসতেন, তাতে এক হাবশী ভৃত্যের প্রতিমূর্তি রয়েছে-যার বর্ণের প্রভাব তার মগজে নিয়মিত প্রতিফলিত হওয়ায় স্বভাবতই ছাপ ফেলেছিল। তাই তার চিন্তাস্রোত অস্বাভাবিকভাবে সেই প্রতিমূর্তিটির প্রতি আকৃষ্ট হল। পরিণামে গর্ভজাত শিশুর ওপরে পিতামাতার শ্বেতবর্ণের চাইতে সেই প্রতিমূর্তিটির কৃষ্ণবর্ণের প্রভাবই অধিক প্রতিফলিত হল। আর তার ফলেই শিশুটি এই গোত্রছাড়া রঙ ধারণ করতে বাধ্য হল।

প্রসব

গর্ভকাল থেকেও প্রসবকালটি মাতৃজাতির জন্যে অধিকতর মারাত্মক ও কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। সে অবস্থায় জীবন তাদের মরণের খুবই কাছাকাছি থাকে। অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তেই তারা মরণ বরণের জন্যে প্রস্তুত থাকে। প্রসবের পয়লা সংকটটা কোন মতে যদি তারা পার হয়েও আসে, তার পরক্ষণেই কঠিন পীড়া ও চরম দুর্বলতার সম্মুখীন হয়। এই দ্বিতীয় সংকটের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে তাদের বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। যদি এ সংকটটাও তারা উত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে আসে, তা হলে তাদের জীবন নতুনভাবে শুরু করতে হয়। এ যেন নতুন জনম নিয়ে ফিরল তারা।

মাতৃজাতির এ সংকট মুহূর্তের স্বাস্থ্য বিধি ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে চিকিৎসাবিদ্‌রা অনেক বড় বড় বই পুস্তক লিখে গেছেন। তাতে এ সময়কার বিভিন্ন প্রকারের জ্বরের প্রতিষেধক নির্দেশ করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, এ অবস্থা থেকে উদ্ভূত নানা ধরনের জ্বরই নারীজাতির অকালমৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে।

তাই এ কালটা যে নারীদের পক্ষে কত মারাত্মকও কঠিন তা একমাত্র পারিবারিক জীবন থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ না করে কেউই বুঝতে পারবে না। প্রতি বৎসর অসংখ্য মা-বোন এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে চিকিৎসা বিধানের নির্দেশিত অপরিহার্য স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনে অবহেলা দেখিয়ে বড়ই শোচনীয়ভাবে মরণের কোলে আশ্রয় নিচ্ছে।

স্তন্যদান

তৃতীয় স্তর হল স্তন্যদানের সময়। আগেকার দুটি স্তর শিশুর চাইতে মাতার পক্ষেই ছিল অধিকতর মারাত্মক। পরবর্তী স্তর দুটি হচ্ছে মাতা অপেক্ষা শিশুর পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক। তৃতীয় স্তরে এসে তাই মাতাকে শিশুর জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। স্তন্যদানের স্তরে শিশুকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে বিশেষ ধরনের বিধি ব্যবস্থা রয়েছে। সেগুলো প্রতিপালনের ব্যাপারে কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করলে শিশুর জীবনই বিপন্ন হবে। এ সময়ে মাতার সামান্য অসতর্কতার ফলেও শিশুর অপূরণীয় দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি সাধিত হতে পারে।

এ স্তরে এসে নারীদের আহার বিহারেও যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন। চিকিৎসা বিধানের যেসব ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে মাতাদের জন্য রাখা হয়েছে তা তাদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। বিশেষ করে মাতার খাদ্যদ্রব্যের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্তন্যপায়ী শিশুর উপরে দেখা দিতে বাধ্য। মাতা যদি মাত্রাতিরিক্ত গরম খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে কিংবা কুপথ্য নেয়, তার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ায় সন্তানের ভেতরে নানারূপ ব্যাধি দেখা দিয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শিশুর বেশীর ভাগ পীড়াই মাতার ক্ষতিকর খাদ্রদ্রব্য গ্রহণ থেকে উৎপত্তি লাভ করে। যদি কোন মাতা কোন রোগ উৎপাদক আহার্য নেয়, তা হলে তার দূষিত প্রতিক্রিয়া স্তন্যের মাধ্যমে শিশুর ভেতরে প্রবেশ করে নানারূপ রোগের জন্ম দেয়।

সন্তানের দৈহিক সৌষ্ঠব ও মানসিক উৎকর্ষ জন্মদিন থেকে স্তন্যদানের শেষ দিনটি পর্যন্ত মাতার আহার বিহার পোশাক পরিচ্ছেদ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ত্রুটিমুক্ত থাকার ওপরে সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। তাই এ সময়ে একটি মুহূর্তের জন্যেও শিশুর প্রতি অমনোযোগী হওয়া কোন মাতার পক্ষে উচিৎ হবে না। আমাদের দেশের বহু অজ্ঞতা ও হতভাগ্য সন্তান তাদের জননীকুলের এ সময়কার ব্যবস্থা সম্পর্কে অসতর্কতার দরুন অকালে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে।

প্রতিপালন

মানব জীবনের চতুর্থ অধ্যায় প্রতিপালনকাল। মূলত এর গুরুত্ব আগের তিন অধ্যায় থেকে অনেক বেশী। মানব জীবনের সর্বাংগীন সৌন্দর্যের ভবিষ্য এ সময়টার ওপরে নির্ভরশীল। তাই এ বিপজ্জনক অধ্যায়টির প্রতি অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

মানব শিশু যখন অদৃশ্য জগৎ থেকে সহসা এ দুনিয়ায় পদার্পণ করে, তখন সর্বপ্রকার ছাপ ও প্রতিচ্ছবি গ্রহণের জন্যে সদা প্রস্তুত একখানা স্বচ্ছ দর্পণের মতই প্রতিভাত হয়। তখনও থাকে সব রকমের দাগ ও কালিমা মুক্ত। এমন কোন চিত্র বা রেখা তাতে থাকে না যার প্রভাব ভাবী জীবনের গভীর রেখাপাত করবে।

ঠিক এমনি মহূর্তে যার যে ধরনের প্রতিচ্ছবি তাতে বিম্বিত হবে, তা আজীবন সেখানে অংকিত থাকবে। তাই তখন যদি সর্বাঙ্গীন সুন্দর নক্শা ও কারুকার্য দিয়ে সে স্বচ্ছ দর্পণটি সাজিয়ে তোলা হয়, তা হলে তা চিরতরে সৌন্দর্য বিমন্ডিত হতে পারে। পক্ষান্তরে দুর্ভাগ্যবশত যদি কোন অসাধু বা মূর্খ কারিগর সেটা হিজিবিজি ও আঁকাবাঁকা রেখা দ্বারা কুশ্রী করে তোলে, তা হলে স্থায়ী ভাবেই সেটা বিশ্রী হয়ে থাকবে। কারণ, সে স্বচ্ছ ও উজ্জল দর্পণ তো তখনও সুশ্রী-কুশ্রী বা সোজা-বাঁকার সাথে আদৌ পরিচিত নয়। তাই তার শূন্য বুক প্রথম যারা আসবে পূর্ণ করতে, তাদেরই সে জানাবে স্বাগতম। ধরণীর বুকের সেই নতুন অতিথিটিকে প্রথম এগিয়ে এসে যা-ই জানাবে তা-ই তার জীবনে স্থায়ী দাগ কাটবে সন্দেহ নেই। তাই যে তুলিকারের হাতে সেই স্বচ্ছ দর্পণটা চিত্রিত করতে দেয়া হবে, যে সারথীকে সেই কৌতূহলী অভ্যাগতের সাহচর্যের ভার দেয়া হবে, তার ইচ্ছা ও ব্যবস্থার ভিত্তিতেই তার ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে।

দুনিয়ার বুকে সে আগন্তুকটির কাছে তখন সব কিছুই নতুন-অজানা। তাই সে এসেই চায় সব অজানাকে জানতে আর যত নতুনের সাথে পরিচিত হতে। তাঁর কান দুটো তখনও কোন মানুষের দোষগুণ শোনার সুযোগ পায়নি বা শুনতেও চায়নি। অত্যাচার কি বস্তু আর দয়াই বা কাকে বলে তাও তার ধারণার বাইরে। সেতো এ খবরও রাখে না যে, বিদ্যাই মানুষের যতসব সৌন্দর্য ও সুকুমার বৃত্তির উৎস আর মূর্খতা সব দোষের আকর। আর সরল মন কালিমামুক্ত আয়নার মতই স্বচ্ছ ও ঝকঝকে। তাই তা যে কোন ধরনের প্রতিবিম্ব বুকে নিতে প্রস্তুত।

বলা বাহুল্য, এরূপ মহার্ঘ্য মুহূর্তে স্বভাবতই স্নেহময়ী জননীর হাতে তার স্বচ্ছ প্লেটে চিত্রাংকনের দায়িত্ব বর্তায়। তাই মাতৃজাতি যদি যে মহা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় কিংবা তার অপব্যবহার করে, তাহলে তার থেকে ভাবী মানবগোষ্ঠী কি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? কাজেই মাতার কাজ হয়ে দাঁড়ায় মুহূর্তে শিশুর স্বচ্ছ দর্পণের চারিত্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সহায়ক বিশেষণাবলী পাথরের মত অংকিত করে দেয়। অন্যথায় তার ভেতরকার ইতর বিশেষণগুলোর প্রতিফলন থেকে শুধু শিশুই নয়, বরং গোটা মানবজাতির ভবিষ্যৎই দুর্বিষহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হতে বাধ্য। কারণ এ সময়কার অংকিত প্রভাব মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়। উচ্চশিক্ষা তো দূরের কথা, আজীবন সাধনা করেও তা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় জাতীয় উন্নতির মূল রহস্য হচ্ছে তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের এ সময়কার শিক্ষা দীক্ষা। অথচ তা সর্বতোভাবেই মাতৃজাতির হাতে ন্যস্ত রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, যাদের প্রকৃতিগত বা স্বাভাবিক কর্তব্য পালনের জন্য এতখানি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো পার হতে হয়, তারা কি করে বহির্জগতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক টানা হেঁচড়ায় অংশ নিবে? সেসব ঝঞ্ঝাটে জড়াতে গেলে তারা কি নিজ দায়িত্বের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য হবে না?

ধরুন, কোন নারী শিক্ষাদীক্ষা ও ও জ্ঞানগরিমায় চরম উন্নতি লাভ করে কোন দেশের আইন সভার সদস্যা কিংবা কোন বিখ্যাত রাজনৈতিক দলের হোতা সাজল। কিন্তু, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশত সামাজিক দাম্পত্য বন্ধন তাকে গর্ভদশায় নিক্ষেপ করল। তখন সে বেচারী 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি'র দশায় পড়লো না কি? একদিকে স্বদলের সফলতা চেয়ে সর্বমুহূর্তে দলীয় সহায়তার প্রশ্ন, অপরদিকে তার তখনকার স্বাস্থ্যবিধি ও অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি অনুসরণের অপরিহার্যতা–কোন্ দিক ছেড়ে কোন্ দিক রাখবে? অথচ সে স্তরের বিন্দুমাত্র অসতর্কতাও একাধারে তার নিজের ও গর্ভজাত শিশুর অনিবার্য ধ্বংস ডেকে আনবে।

বলা বাহুল্য, এরূপ ক্ষেত্রে নারীর স্বাভাবিক দায়িত্বই মাতৃত্ব রক্ষা–নেতৃত্ব রক্ষা নয়। কারণ, তার নিজের ও সেই ভাবী মানুষটির দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের দিকে চেয়েই তাকে আজকের এই নেতৃত্বের মোহ ছাড়তে হবে। অন্যথায় রাজনৈতিক তিক্ত পরিবেশের প্রভাব তার স্বাস্থ্য ও দায়িত্ব দুটাই বরবাদ করবে। তাই নয় কি?

আরেকটা উদাহরণ নিন। ধরুন, জনৈকা নারী শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চ পর্যায় পার হয়ে এমন কি দক্ষ এক ব্যারিস্টার সেজে সমাজে আত্মপ্রকাশ করলেন। অথচ আমরা আরও দেখছি যে, তার কোলে একটা সদ্যজাত কচি শিশু আবির্ভূত হয়ে মায়ের কাছে তার আইনত প্রাপ্য স্নেহ ও সতর্ক দৃষ্টির জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে তার যদি আগামীকল্যের মামলা ও তার মোয়াক্কেলের সাফল্য ভাবনায় দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা বড় বড় আইনের বই, নথিপত্র ও সলা পরামর্শে ডুবে থাকতে হয়, তার পক্ষে কি সেই স্নেহাতুর সন্তানের ব্যাকুল মূক আবেদনে সাড়া দিয়ে মাতৃত্বের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভবপর? যদি মাতৃত্ব বাঁচাতে হয়, তাহলে কি তার পক্ষে মোয়াক্কেলের মামলা জয়ের কিংবা মুক্তিলাভের নিমিত্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইনের ধারা নিয়ে গবেষণা চালানো সম্ভব হবে? এখানেও তো তার সেই দুকূল সামলাবার প্রাণান্ত দশা মাথা তুলবে। এদিকে মোয়াক্কেলের মুক্তির ভাবনা ভাবতে গেলে সন্তান উচ্ছন্নে যায়, ওদিকে আবার সন্তানের বেলায় স্নেহময়ী জননীর ভূমিকা নিতে গেলে মোয়াক্কেলের মরণ দশা হাযির হয়। এরূপ ত্রিশঙ্কু অবস্থায় কেউ তার কাছ থেকে কোন দায়িত্বই কি সুষ্ঠুভাবে পেতে আশা করতে পারে? স্থূল কথা, আইনের গুরুদায়িত্ব কাঁধে চেপে দিনরাত বিরাট বিরাট আইনের বই চষে বেড়াতে হলে তার থেকে ভাবী মানব গোষ্ঠীর সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের আশা চুলোয় না দিয়ে আর গত্যন্তর থাকে না।

মাতৃজাতির স্বাভাবিক দায়িত্বই হচ্ছে প্রাণাধিক সন্তানদের জন্মদিন থেকে শুরু করে লালন পালনের দায়িত্ব মুক্তির শেষদিন পর্যন্ত তাদের আহার-নিদ্রা, চলাফেরা, মতিগতি, এক কথায় সব কিছুর দিকেই সজাগ ও সযত্ন দৃষ্টি রাখা। সন্তানের স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার এ মহার্ঘ্য মুহূর্তগুলোকে তারা যথাযথভাবে কাজে লাগাবে– এটাই তাদের কাছে কাম্য। তাদের একমাত্র সাধনা থাকবে নিজ সন্তানের ভেতরে যথাসাধ্য সদ্‌গুণাবলীর সমাবেশ ঘটানো ও ইতর বিশেষণগুলো থেকে তাদের ভেতর ও বাহির মুক্ত ও পবিত্র রাখা।

তার চাইতে হতভাগ্য শিশু আর কে আছে যার মা ব্যারিস্টার সেজে মোয়াক্কেলের পক্ষে জজের এজলাসে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের মুণ্ডুপাত করছে আর তার অবোধ শিশু দুধের

পিয়াসে ধূলায় গড়িয়ে টা টা করে মূর্চ্ছা যাচ্ছে। সেই হতভাগ্য শিশুর স্বাস্থ্য ও জীবনের কি গতি হবে, যার মা আইন পরিষদের সদস্যা সেজে নিজ পার্টির সাফল্য কামনায় দিনরাত ভাবনা ও সাধনায় লিপ্ত ও অধীর থাকবে আর তার অসহায় শিশুটি উপাদেয় খাদ্য ও উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে দিন দিন গোল্লায় যেতে বসবে? তা ছাড়া রাজনৈতিক দাবা খেলায় হেরে গিয়ে যখন দুর্ভাবনায় ও পরিশ্রমে তার স্তন শুকিয়ে কিংবা বিষাক্ত হয়ে শিশুর স্বাস্থ্যকে সংকটাপন্ন করে তুলবে, তখনই বা তার প্রতিকার কিসে হবে?

নারীর স্বাভাবিক দায়িত্ব ও পুরুষ থেকে তাদের কর্মক্ষেত্রের পার্থক্য বুঝবার জন্য ওপরের উদাহরণ ক'টাই জ্ঞানীদের জন্য যথেষ্ট নয় কি? বস্তুত, নারীর প্রকৃতিগত কর্তব্যই এরূপ যে, তারা যদি পুরুষের কর্মক্ষেত্রে মূহূর্তের জন্যও অনধিকার চর্চা করতে এগিয়ে আসে, তাহলে সে মুহূর্তে স্বদায়িত্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না।

প্রাকৃতিক নিয়মেই মানব জাতির দু'শ্রেণীর কাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। বনী আদমের সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের বুনিয়াদী দায়িত্ব নারীর ওপরেই ন্যস্ত করা হয়েছে। নারীকে সেই বিশেষ দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য যথোপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দৈহিক-মানসিক যোগ্যতা দান করা হয়েছে। অপরদিকে পুরুষের কাজও বিশেষিত করে তদুপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দৈহিক-মানসিক শক্তি দান করা হয়েছে।

এ দু'দলের পৃথক পৃথক কাজের মিলিত ফলই দুনিয়ার বুকে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত ও অব্যাহত রাখে। এ তো তখনই সম্ভব হয়, যখন তারা একে অপরের ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা করতে না গিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় সুশৃঙ্খলভাবে যার যার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যায়।

আর যখনই তার ব্যতিক্রম ঘটে এবং একদল স্বদায়িত্ব ভুলে অপর দলের কর্তব্যে অনাচার শুরু করে দেয়, তখন উভয় দলের কাজই ব্যাহত হয়। ফলে, মানব সভ্যতা ও জীবন ব্যবস্থায় নেমে আসে চরম বিপর্যয়। সাথে সাথে গোটা বিশ্বে সমস্যার পর সমস্যা মাথা তুলে এরূপ জটলা শুরু করে যে, নিখিল মানব তখন ত্রাহি ডাক ছাড়তে থাকে।

ওপরের আলোচনায় এ কথাটা অবশ্যই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নারীকে পৃথক ক্ষেত্রে পুরুষরা আটকে রাখেনি ; বরং প্রকৃতিগত দায়িত্বই তাকে বাধ্য করছে বিশেষ

ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য। প্রকৃতি তাকে যে প্রয়োজনে গড়ে তুলেছে তা আদৌ পুরুষের ক্ষেত্রে কাজ করা নয়। যেখানেই এরূপ ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হয়েছে, যেখানেই নারীরা পুরুষের ক্ষেত্রে তাদের কদমে কদম মিলিয়ে চলতে গেছে, সেখানেই দেখা দিয়েছে চরম বিপর্যয় এবং তখনই মানব সমাজে সহস্র প্রকারের ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভাংগন দেখা দিয়েছে। কারণ, প্রকৃতির বিধানকে ওলট পালট করে সর্ববিধ মানবীয় প্রয়াস যে ব্যর্থ হতে বাধ্য, এটাই বৈজ্ঞানিক সত্য।

তাই, আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে নারী যেন সীমারেখা লংঘন করতে না যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। তারা যাতে সব রকমের ব্যর্থ প্রয়াসের ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতি নির্ধারিত স্ব-স্ব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একনিষ্ঠভাবে যত্নবান থাকে, সেটাই হবে আমাদের একমাত্র প্রচেষ্টা। যদি তাদের কাউকে স্বদায়িত্বের প্রতি উষ্মা কিংবা অবহেলা প্রদর্শন করে অপরের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করতে দেখি, তাহলে সেটাকে সমাজ দেহের সাংস্কৃতিক ব্যাধি মনে করে যথাবিহিত প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করাই হবে আমাদের পরম ও পবিত্র কর্তব্য। কেননা, নারীরা যতই বিজ্ঞান দর্শনের স্তর ডিংগিয়ে আসুক না কেন, যখনই স্বদায়িত্বের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে প্রকৃতির বিধানকে লংঘন করতে যাবে, তখনই তাদের সব জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে গোড়াতেই এ প্রশ্ন তোলা হয় ঃ

"প্রাকৃতিক বিধান অনুসারেই সমগ্র মানব জাতি স্বাধীন মর্যাদার অধিকারী। সেক্ষেত্রে কোন্ যুক্তিবলে নারীকে সে স্বাধীনতা থেকে সর্বদা বঞ্চিত রাখা হচ্ছে?"

বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, নারী সর্বদাই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত রয়ে আসছে। এরপর প্রশ্ন জাগে যে, তাদের স্বাধীনতা নেই কোন্ ক্ষেত্রে। এর জবাবে দুটো যুক্তি খাড়া করা হয় ঃ

১। নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দেয়া হয় না। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে তাদের সম্পূর্ণ দূরে রাখা হয়।

২। নারীকে পর্দার নামে চার দেয়ালের ভিতর বন্দী রাখা হয়। পুরুষের মত স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়।

কাসেম আমীন বেগও এ দুটো যুক্তির উপরে জোর দিয়েছেন। তিনি এর সমর্থনে নানারূপ উদাহরণ তুলে ধরে প্রমাণ করেছেন যে, নারীদের চার দেয়ালের ভেতরে বন্দী

রাখা ও পুরুষের মত নাগরিক দায়িত্ব তথা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশ নিতে না দেয়াই তাদের প্রকৃতিদত্ত স্বাধীনতা অপহরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[1]

আমি তার জবাব দিতে গিয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এড়িয়ে নারীর প্রকৃতিগত দায়িত্ব সম্পর্কেই আলোচনা করেছি। আপনারা অবশ্যই তা পড়ে এসেছেন। এখন নিজেরাই তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিবেচনা করে দেখুন যে, কাসেম আমীন বেগের মতামত কতটুকু যুক্তিসঙ্গত।

নারী স্বাধীনতার সমর্থনে উত্থাপিত ওপরের যুক্তি দুটির এক্ষণে জবাব নিন। পয়লা প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত পরিষ্কার। যাদের দায়িত্ব হচ্ছে মানব জাতির বুনিয়াদ গড়ে তোলা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে, কি করে তারা এত বড় দায়িত্ব ভুলে পুরুষের ব্যাপক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবার ফুরসৎ পাবে?

আসলে নারীদের পুরুষরা জোর জবরদস্তি করে কোন কিছু থেকেই বঞ্চিত করেনি কোনদিন এবং কোন ক্ষেত্র থেকেই তাদের অন্যায়ভাবে বহু দূরে হাঁকিয়ে রাখেনি। তাদের পুরুষের কর্মক্ষেত্র থেকে যদি কেউ পৃথক করে দিয়ে থাকে, সে স্বয়ং প্রকৃতিই–পুরুষ নয়। তাই অভিযোগ বা প্রশ্ন যা কিছু সবই প্রকৃতির বিরুদ্ধে তোলা উচিত, পুরুষের বিরুদ্ধে নয়।

পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দানের জন্য আমি পৃথক একটা অধ্যায়ই রেখেছি। বলা বাহুল্য, নারীর প্রকৃতিগত কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা নেয়ার পরে কেউ এ কথা মেনে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না যে, পুরুষের ক্ষেত্রের চাইতে নারীর ক্ষেত্র কিছুটা সীমাবদ্ধ বলেই পুরুষের মত দিগন্ত চষে বেড়াবার সুযোগ বা স্বাধীনতা স্বভাবতই তাদের কিছুটা কম এবং স্বদায়িত্ব সম্পাদনের তাগিদেই তাদের কতকটা বন্দী জীবন যাপন করা উচিত। প্রকৃতি নর ও নারীর কাজ ও ক্ষেত্র ভাগ করে দিয়ে উভয়ের সুবিধা সুযোগ লক্ষ্য রেখে একটা সীমারেখাও নির্দেশ করে দিয়েছে। ধর্ম ও সভ্যতার বিধান শুধু সেটাকেই অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করছে। যদি নারীদের তাদের নির্ধারিত এলাকায় কর্মনিরত না রাখা হয়, তাহলে প্রাকৃতিক দুনিয়ায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অচলাবস্থা দেখা দিতে বাধ্য।

শ্রেণী হিসেবে নারী ও পুরুষ যে স্বতন্ত্র তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই। পর্দা (স্বতন্ত্র দুটি বিভাগের অফিস দুটিকে যেরূপ প্রাচীর দিয়ে পৃথক করে রাখা হয় তেমনি) নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রের মাঝখানে প্রাচীর স্বরূপ বিরাজমান। উদ্দেশ্য–যে যার ক্ষেত্রে নির্বিঘ্নে কাজ করে যাক। কেউ যেন কারুর কাজে এসে বাধা

সৃষ্টি না করে। তাই এ বিভেদ প্রাচীর যখনই তুলে দেবার প্রয়াস চালানো হয়, তখনই মানব জীবন ও সংস্কৃতির মূলভিত্তি ভীষণ বেগে কেঁপে উঠে পৃথিবীকে সতর্ক করে দেয় যে, মানব সভ্যতার সৌধ ধসে পড়বার আর মোটেও বিলম্ব নেই। আমার এ অভিমত প্রমাণের জন্য নতুন কোন দলীল দাঁড় করতে হবে বলে মনে করি না। কারণ, তথাকথিত নারী স্বাধীনতার তীর্থভূমি ইউরোপই বর্তমানে সে প্রমাণের বাস্তব রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

১। আর মারআতুল জাদিদা।

কাসেম আমীন বেগও এই বলে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ঃ স্বাধীনতা বলতে আমরা এইটেই বুঝতে চাই যে, ধর্ম ও সংস্কৃতি যার জন্য যে সীমারেখা নির্ধারিত করে দিয়েছে, তা জেনে নিয়ে মানুষ স্ব স্ব কাজে ও চিন্তায় পূর্ণ অধিকার লাভ করবে।

কাসেম আমীন বেগও যখন ধর্ম ও সংস্কৃতির নির্দেশিত সীমারেখা মেনে নিচ্ছেন, তখন পাঠক-পাঠিকারাই বিচার করুন যে, নারীরা তাদের নির্দিষ্ট স্বাভাবিক দায়িত্ব সম্পাদন করতে গেলে কি করে আবার পুরুষের সংগ্রাম বহুল ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে সমর্থ হবে? ধর্ম ও সংস্কৃতি কি এই দায়িত্বগত পার্থক্যের দরুন নারীকে স্বতন্ত্র এলাকার নির্দেশ দেয়নি?

এ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে যখন আপনারা ইউরোপের বিখ্যাত মনীষীদের মতামত পাঠ করবেন, তখন অবশ্যই অনুধাবন করতে সমর্থ হবেন যে, এ অভিমত শুধু আমারই নয়, বরং ইউরোপের সব উল্লেখযোগ্য লেখকই এ ব্যাপারে আমার সাথে সম্পূর্ণ একমত। তাঁদের সম্মিলিত ধ্বনি দিকদিগন্ত কাঁপিয়ে ঘোষণা করছে ঃ

নারীর স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতির সংরক্ষণ ও লালন-পালন। কর্তব্যের সেই নির্দিষ্ট গণ্ডি ছেড়ে যখনই সে বাইরে পা রাখবে, তখন সে আর যাই হোক, নারী থাকবে না কখনও! পরন্তু নরও নয়, নারীও নয়, এক আজব চিড়িয়া হয়ে উঠবে সে।

তাঁরা শুধু এতটুকু বলেই থামেননি। তাঁদের মতে তো ইউরোপে নারীরা সেই চিড়িয়া বিশেষ। তাদের নারী বলে স্বীকার করতে সে দেশের মনীষীরাই রাযী নন। তাঁরা বলেন– নারী স্বাধীনতা, এমনকি তার কল্পনাও নির্ভেজাল মাতলামী ও নগ্ন জংলীপনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নর-নারীর দৈহিক ও মেধাশক্তির তারতম্য

ইউরোপে যখন দেখি, নারীরা পুরুষের কবল থেকে ষোল আনা বেরিয়ে আসার সংগ্রামে আদাজল খেয়ে লেগেছে আর দৈহিক ও মনন শক্তিতে তারা কোন অংশে পুরুষের চাইতে খাটো নয় তা প্রমাণের জন্য কোমর বেঁধে নেমেছে, তখন আক্ষেপ আর করুণারই উদ্রেক হয় বটে। তারপর যখন দেখতে পাই যে, ধ্বংসাত্মক ও অপরিণত শিক্ষার ভেতর দিয়ে সে আন্দোলন পাশ্চাত্য ভূমি থেকে প্রাচ্যের দিকে পা বাড়াচ্ছে এবং একদল মূর্খ ও সরল জীব তার বাইরের কৃত্রিম, মনভুলানো রূপ দেখে অভিনন্দন জানাবার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছে, তখন সে আক্ষেপের আগুন দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

তাই আমি এ অধ্যায়ে জ্ঞানগর্ভ যুক্তির অবতারণা করে প্রমাণ করতে চাই যে, নারী স্বাধীনতার খেয়াল ও নর-নারীর ভেতরে সাম্য প্রতিষ্ঠার মোহ ও উন্মাদনা অবাস্তব গাঁজাখুরী স্বপ্ন বৈ নয়। এরূপ আজগুবী চিন্তায় তো তারাই মেতে উঠতে পারে যারা বিবেক বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসেছে অথবা কোন নেশাগ্রস্ত মাতাল দৈত্যের প্রভাবে পড়ে তাদের মগজ ঘুলিয়ে জল হয়ে গেছে। আমি ইউরোপের বিখ্যাত মনীষী ও নেতৃস্থানীয় শিক্ষাবিদদের বিজ্ঞানসম্মত অভিমত উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে দিতে চাই, যে ব্যক্তি এরূপ অলীক ও বাতুল মতের বাস্তবায়ন চায়, তার তুলনা কেবলমাত্র সেই মাতালের সাথেই হতে পারে, যে সৃষ্টির বিধানের নিয়ত ভাংগা গড়ার লীলাখেলা বুঝতে পেরেও স্বীয় সর্ববিধ সাধনা ও ত্যাগ যত অসম্ভব ও অর্থহীন কল্পনার পেছনে ব্যয় করে।

কাসেম আমীন বেগ তাঁর "আল্ মারআতুল জাদীদা" নামক পুস্তকে এ কথাটার ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন যে, জাহেলী যুগ থেকে নারীদের যথার্থ রূপটা এতদিন যবনিকার অন্তরালে চাপা দিয়ে রাখা হচ্ছিল এবং ইউরোপের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সে প্রাচীন যবনিকা ছিন্ন করে ফেলল। 'ইল্‌মে তাশরীহ্' (শরীরতত্ত্ব) এর গবেষণা ও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিল যে, নর-নারীর দৈহিক ও মেধা শক্তিতে কোনই পার্থক্য নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার কাজে পুরুষের মগজ যেটুকু ফলপ্রসূ হবে, নারীর মগজ তা থেকে আদৌ কম হবে না।

শুধু কাসেম আমীন বেগই নন, বরং নারী স্বাধীনতার পক্ষে যারাই মুখ খোলেন, তাদের জিহ্বা থেকেই বেশ জোরের সাথে এ যুক্তিটি উচ্চারিত হয়ে থাকে। তাই

নারী স্বাধীনতার ওপরে বিতর্ক শুরু করার গোড়াতেই কাসেম আমীন বেগের উত্থাপিত এ দলীলটির সততা ও যথার্থ সম্পর্কে একটা মীমাংসায় পৌঁছা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য।

কাসেম আমীন বেগ তাঁর এ দলীলটা দু'জনের মতের ওপরে ভিত্তি করে দাঁড় করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

আমাদের এ দাবীর সমর্থন পাই অধ্যাপক ফ্রেশলো ও অধ্যাপক মে তুন জাযোর মত স্বনামধন্য মনীষীদের অভিমতে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন ফিজিওলজীর অধ্যাপক ও ইতালী একাডেমীর সদস্য। অধ্যাপক ফ্রেশলো লিখেছেন ঃ

"দীর্ঘদিন ধরে আমি আধ্যাত্মিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপনা করেছি। আমার শিষ্যদের ভেতরে মেয়েদের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু, তাদের ভেতরে আমি মেধাশক্তির দৌর্বল্য লক্ষ্য করিনি আদৌ। আমি এ দীর্ঘকালের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা নিয়ে অবশেষে এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে, নর ও নারীর মনন শক্তির ভেতরে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নেই।"

মে তুন জাযো তাঁর "নারীর দেহবিজ্ঞান" নামক পুস্তকে লিখেছেন ঃ

"দেহবিজ্ঞানের গবেষণায় চূড়ান্তভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, নর-নারীর ভেতরে দৈহিক ও মননের দিক থেকে কোনই পার্থক্য নেই।"

এই মত দু'টিকেই ভিত্তি করে দাবী করা হচ্ছে ঃ

"দেহবিজ্ঞানের যেসব বিখ্যাত বিশারদ নারীর শরীর ও মগজ নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা চালিয়েছেন, তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানানুশীলনের ক্ষমতা নারী ও পুরুষের সমান।"

এসব মতামত ও দাবী-দাওয়া পড়ে যে কেউ সোজাসুজি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারে যে, ধী-শক্তিতে নর-নারীর ভেতরে যে মোটেও পার্থক্য নেই, ইউরোপের সুধী সমাজের সর্ববাদীসম্মত মত এটাই। তাই মেনে নেয়া যায় যে, পুরুষের চাইতে নারী কোন অংশেই হেয় নয়।

আসলে এ হচ্ছে একটা ধোঁকামাত্র। এ ইন্দ্রজালে আটকা পড়ে গেছে এ দেশের নবীনেরা দলশুদ্ধ। এর মূলে রয়েছে তাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। যদি এ দুটো মতের বিপরীত দিকে ইউরোপের বিজ্ঞতম মনীষীদের ভুরি ভুরি অভিমত তুলে ধরা যায়, তা হলে অবশ্যই দেখা যাবে যে, সেখানকার উঁচুদরের শিক্ষাবিদ মহল সেই গাঁজাখুরী মত আদৌ সমর্থন করে না।

এখন আমি ওপরের মত দুটোর বিপক্ষে গোটা ইউরোপের সর্ববাদীসম্মত সেরা সাহিত্যিক, দার্শনিক ও পণ্ডিতবর্গ, বিশেষ করে আধুনিক ইউরোপের সর্বজনস্বীকৃত স্রষ্টা ও সংস্কারকদের অমূল্য অভিমতগুলো তুলে ধরছি।

সবার আগে নারীর দৈহিক দৌর্বল্য ও অযোগ্যতা সম্পর্কেই তাদের মতামত তুলে দিয়ে সেদিকে সুধী পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাতেই দেখতে পাবেন যে, কাসেম আমীন বেগ ও তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের সমতার ধূয়া কত বড় ধাপ্পা।

১। নারীর দৈহিক দৌর্বল্য ঃ

(ক) শক্তির তারতম্য ঃ

ইল্‌মে তাশ্‌রীহ্‌র (দেহবিজ্ঞান) অনুসন্ধান কার্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষের দৈহিক শক্তি নারীর চাইতে অনেক বেশী। নর-নারীর দৈহিক শক্তির এ তারতম্যটা নিছক অনুমান ও কল্পনা ভিত্তিক নয়। এ সিদ্ধান্ত আজ এতখানি প্রীতি ও দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌছেছে যে, এটা অস্বীকার করা আর প্রকাশ্য সত্য ও উজ্জ্বল ধারণাকে মিথ্যা বলা একই কথা।

এই দেহগত পার্থক্যের ভিত্তিতেই ইউরোপের দেহবিজ্ঞানীদের একটা শক্তিশালী দল এ যুগের উন্নত পুরুষ জাতির সাথে নারীকে মানুষ হিসাবেও এক পর্যায়ে দেখতে রাযী নন। তাদের ধারণা যে, বনী আদম সৃষ্টির প্রাক্‌স্তরের প্রাণীর স্মৃতিচিহ্ন হয়েই আজকের নারীরা মানব জাতির ভেতরে বিরাজ করছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে এই ঃ

প্রাক-মানবগোষ্ঠী দৈহিক ও মনন শক্তিতে মানব জাতির চাইতে স্বভাবতই হেয় ও দুর্বল ছিল। আজকের নারীদের মতই প্রাক্ মানবগোষ্ঠী ছিল অপূর্ণ ও অসহায়। তাই মানব জাতি এসে সহজেই তাদের ধ্বংস করে ফেলল এবং তাদের নারীদের দখল করে নিজেদের ভেতরে বন্টন করে নিল। আজকের নারীরা তাদেরই শোণিতের ধারা থেকে সৃষ্ট। (এনসাইয়ক্লোপেডিয়া ঃ নারী শব্দের বিশ্লেষণ)

(খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচার ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার সংকলয়িতা "নারী" শব্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"যদিও নর ও নারীর ভেতরে লিংগগত পার্থক্যটাই বড় হয়ে দেখা দেয়, তবু সেটাই তাদের ভেতরকার বৈষম্যের একমাত্র মানদণ্ড নয়। পরন্তু, নারীর আপাদমস্তক প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র। এমনকি বাইরের থেকেও তাদের যা কিছু পুরুষের অনুরূপ বলে মনে হয়, মূলত তাও সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের।"

এ মন্তব্য করেই তিনি দেহবিজ্ঞানের গবেষণা ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে নারীদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনায় লিপ্ত হয়েছেন। তার সারমর্ম এই ঃ

"মূলত নারীর শারীরিক গঠন-গাঠন প্রায়ই শিশুদের মত। তাই, তোমরা দেখেছ যে, নারীদের অনুভূতিও শিশুদের মতই উচ্ছ্বাসপ্রবণ। যে কোন প্রভাব অতি সহজেই তাদের ভেতরে দাগ কাটে। শিশুরা যেমনি কোন দুঃখের ব্যাপার ঘটলে সাথে সাথে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, আবার কোন খুশীর খবর পেলে হঠাৎ উছলে উঠে, নারীদেরও তো সেই দশা! তারা পুরুষের তুলনায় বেশী ভাবপ্রবণ ও দুর্বলমনা। বাইরের যে কোন প্রভাব তাদেরকে এতখানি প্রভাবান্বিত করে যে, তাদের জ্ঞানও সে ক্ষেত্রে হার মেনে যায়। এ কারণেই তাদের ভেতরে স্থিরতার একান্ত অভাব। যার ফলে, যে কোন কঠিন ও ভয়াবহ ক্ষেত্রে তারা দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারে না।"

(গ) দৈহিক পরিমাপ ঃ

গবেষণা ও জ্ঞানগর্ভ অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বাভাবিক পুরুষের দৈর্ঘ্য যে কোন স্বাভাবিক নারীর দৈর্ঘ্য থেকে বার সেন্টিমিটার অধিক। এ পার্থক্য কোন বিশেষ এলাকা বা জাতির ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অসভ্য জাতি থেকে শুরু করে উঁচু দরের সভ্যজাতির ভেতরেও এই একই ধরনের পার্থক্য দেখা যায়। যুবকদের ভেতরে এ পার্থক্য যেরূপ দেখা যায়, ঠিক তেমনি দেখা যায় শিশুদের ভেতরেও।

(ঘ) দৈহিক ওজন ঃ

দৈহিক পরিমাপের বেলায় যে পার্থক্য আমরা নর-নারীর ভেতরে দেখতে পাই, ওজনের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম দেখতে পাই না। দৈহিক ওজনের বেলায়ও আমরা দেখতে পাই যে, কোন এক স্বাভাবিক নারীর দেহের ওজন যে কোন স্বাভাবিক পুরুষের চেয়ে পাঁচ কিলোগ্রাম কম।

(ঙ) শিরা-উপশিরা ঃ

শিরা-উপশিরার গতি ও শক্তির দিক থেকেও নারী জাতি পুরুষের চাইতে অনেক দুর্বল। ডক্টর দাওফারীনী তাঁর রচিত 'এন্‌সাইক্লোপেডিয়ায়' লিখেছেন ঃ

পুরুষের শিরা-উপশিরা থেকে একেবারেই ভিন্ন-নেহাৎ আলাদা ধরনের। তার প্রক্রিয়া ও শক্তির দিক থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে, নারীদেহের শিরাগুলো এতই দুর্বল যে, তার স্বাভাবিক শক্তি ও গতিকে যদি তিন ভাগ করা যায়, তাহলে

তার দু'ভাগই পুরুষদের ভাগে পড়ে এবং বাকী এক ভাগ হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে নারীদেহে। শিরা-উপশিরার স্পন্দনের দ্রুততা ও ধীরতার বেলায়ও অনুরূপ পার্থক্যই বিদ্যমান। পুরুষের দেহের শিরাগুলো নারীদেহের শিরা থেকে যেরূপ দৃঢ়তর, তেমনি দ্রুততর।

(চ) অন্তঃকরণ ঃ

মানব দেহের কেন্দ্রস্থলই হচ্ছে অন্তঃকরণ। তাতেও নর-নারীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। জ্ঞান বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা এ কথা ভালভাবেই প্রমাণিত করেছে যে, নারীর অন্তঃকরণ নরের অন্তঃকরণ থেকে ষাট ড্রাম ছোট ও হাল্কা।

(ছ) শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ

শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততা ও শক্তির দিক থেকেও নর-নারীর ভেতরে বড় রকমের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞান ও গবেষণাগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিঃশ্বাসের ভেতর দিয়ে যে কার্বলিক এসিডের রেণুগুলো বেরিয়ে আসে, তা দেহের ভেতরকার তাপের প্রভাবে গরম হয়ে নিঃশ্বাসের সাথে মিশে বেরোয়।

এ অভিজ্ঞতা লাভের পরে অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেছে যে, পুরুষ প্রতি ঘন্টায় প্রায় এগার ড্রাম কার্বন জ্বালিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে নারীরা ঘন্টায় কিঞ্চিদধিক ছয় ড্রাম জ্বালায় মাত্র। এতে প্রমাণিত হয় যে, নারীদেহের শক্তিজাত তাপ পুরুষের অর্ধেকের চাইতে সামান্য বেশী মাত্র।

২। মেধাগত দৌর্বল্য ঃ

ওপরের আলোচনায় আমরা যেসব গবেষণা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হলাম, তা নারীর দৈহিক দৌর্বল্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয় কি? কাসেম আমীন বেগের সাম্যের ধুয়া এসব অকাট্য দলীল ও যুক্তির ঘায় হাওয়ায় উড়ে যায়নি কি? এ প্রশ্নের জবাব সুধী পাঠক-পাঠিকাদের ওপরে ছেড়ে দিয়ে আমি এখন নারী ও পুরুষের আর একটা দিকের পার্থক্য সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করতে চাই। আমি এখন বিশেষভাবে প্রমাণ করব যে, মেধা শক্তিতেও নারী পুরুষের চাইতে যথেষ্ট দুর্বল।

(ক) রুচিভেদ ও স্বভাব ঃ

বিখ্যাত নিহিলিস্ট দার্শনিক মনীষী প্রুডেন "ইব্‌তেকারুন্ নিযাম" গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"মেয়েদের জ্ঞানশক্তি পুরুষের জ্ঞানশক্তি থেকে যতখানি দুর্বল, ঠিক ততখানি

পার্থক্য দেখা দেয় তাদের রুচিবোধের ভেতরে। তাদের চারিত্রিক শক্তিও পুরুষের সমান নয়। তাদের স্বভাবই সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। তাই দেখা যায় যে, তাদের ভাল-মন্দ বিচার পুরুষের ভাল-মন্দ বিচারের সাথে সাধারণত এক হয় না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, নারী ও পুরুষের অনৈক্যটা শুধু বাইরেরই নয়, পরন্তু সেসব প্রকৃতিগত পার্থক্যেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

(খ) ইন্দ্রিয় শক্তি ঃ

মানুষের জ্ঞান ও মেধাশক্তি যে পাঁচটা ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে প্রতিপালিত হয়, তাতেও উভয় শ্রেণীর ভেতরে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মনীষী নিকোলাস ও মনীষী বেইলী প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, মেয়েদের ইন্দ্রিয়শক্তি পুরুষের ইন্দ্রিয়শক্তি থেকে অনেক দুর্বল।

(১) ঘ্রাণশক্তি ঃ

নারীদের ঘ্রাণশক্তি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, যতটুকু দূরত্ব তাদের বিশেষ ঘ্রাণ থেকে বঞ্চিত রাখে, পুরুষ তা সহজেই লাভ করে থাকে। মানে ঘ্রাণের মাত্রা যতটুকু হলে পুরুষ অনুভব করতে পারে, নারীর প্রয়োজন তার দ্বিগুণ।

এ ভাবের অভিজ্ঞতা থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীরা হাল্কা ব্রাসিক এসিডের ঘ্রাণ বিশ হাজারের একভাগ হলেও পুরুষ একলক্ষ ভাগের এক ভাগ হলেই অনুভব করতে পারে।

(২) স্বাদ ও শ্রবণ শক্তি ঃ

স্বাদ ও শ্রবণ শক্তির অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, নারী থেকে পুরুষ সে ক্ষেত্রেও অনেক সবল। এর প্রমাণ দৈনন্দিন জীবনে আমরা এত পাচ্ছি যে, তা আর নতুন কোন উদাহরণের অপেক্ষা রাখে না। 'এন্‌সাইক্লোপেডিয়া' এ ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে ঃ

"এর ফলেই খাদ্যের গুণাগুণ বিচার, সুরের ভাল-মন্দ পরীক্ষা, পিয়ানোর রাগ-রাগিণী পরীক্ষা ক্ষেত্রে সর্বদা পুরুষই স্থান পায়। কোন নারী আজ পর্যন্ত নিজকে এসব ব্যাপারে সক্ষম প্রমাণিত করতে পারেনি।"

(৩) অনুভূতি শক্তি ঃ

এ সম্পর্কে মনীষী লোমব্রুযার ও সিয়ারজী প্রমুখ পণ্ডিতদের সর্বসম্মত অভিমত এই–নারীদের পুরুষ থেকে এ ক্ষেত্রে দৌর্বল্য অনেক বেশী। তাঁদের গবেষণাপ্রসূত

যুক্তি হল এই, দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি নরের চাইতে নারীর অনেক কম বলেই ধৈর্য তাদের নরের চাইতে বেশী মনে হয়। (সে যাই হোক, নরের চাইতে নারীর অনুভূতি অনেক কম না হলে আগুনের মত দাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে তারা এত ঘনিষ্ঠভাবে জীবনভর থাকতে পারত না।) লোমব্রুযারের মূল বক্তব্য হল এই ঃ

"গর্ভ ও প্রসবের কঠিন কষ্ট সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং ভেবে দেখুন যে, নারীরা দুনিয়ার বুকে কত কঠিন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছে। যদি নারীদের অনুভূতি শক্তি পুরুষের মতই তীক্ষ্ণ হতো, তাহলে কিছুতেই তারা এতবড় দুঃখ নীরবে সহ্য করতে পারত না। মানব জাতির সৌভাগ্য যে, খোদা নারীদের প্রখর অনুভূতি থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। তা না হলে বনী আদমের উৎপত্তির গুরুভার বয়ে চলা কারুর পক্ষেই সম্ভব হত না।"

(গ) মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ ঃ

১। মস্তিষ্কের ওজন ঃ মানুষের বোধশক্তির কেন্দ্র হচ্ছে মগজ। এর কম-বেশী ও সবলতা-দুর্বলতার সাবল্যের ওপরেই বোধশক্তির প্রখরতা ও মন্থরতা নির্ভরশীল।

মনোবিজ্ঞানের এ অভিজ্ঞতা সামনে রেখে যখনই আমরা ব্যাপারটি বিচার বিশ্লেষণ করতে বসি, তখনই সেখানে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় নারীর দৌর্বল্য। অধুনাতন মনোবিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে যে, নর ও নারীর মগজের আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে! পুরুষের মগজের ওজন নারীর মগজের চাইতে সাধারণত এক ড্রাম বেশী।[1]

যদি কেউ বলে যে, এ পার্থক্য নর-নারীর দৈহিক শক্তির পার্থক্য থেকে উদ্ভূত, তাও ভুল। কারণ, এটা স্থিরীকৃত সত্য যে, পুরুষের মগজ তার দৈহিক অবস্থার সাথে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ সম্পর্ক রাখে মাত্র। অথচ নারীর মগজ তার দৈহিক শক্তির

---

[1]লেখক মেধাশক্তির বিভিন্নতা নিয়ে নর-নারীর মগজের ওজন ও তার 'মীখাখ' এর ওপরে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আদৌ দৃষ্টিপাত করেননি। মূলত নারীদের সব দৌর্বল্যের উৎসই হল মগজের এই বিভিন্নতা। মগজের ওজনের পার্থক্য আমি এর পরেই আলোচনা করব। কিন্তু, মগজের আলোচনা প্রসঙ্গে তার 'মীখাখ' এর ভেতরকার তারতম্যও আলোচনা করা প্রয়োজন। শরীরতত্ত্বের পরিভাষায় মগজের শেষাংশকে 'মীখাখ' বলে। পুরুষের মগজের সাথে 'মীখাখ' এর সম্পর্ক হচ্ছে ১$\frac{৪}{৭}$ অংশ। কিন্তু, নারীর 'মীখাখ' এর সাথে মগজের সম্পর্ক হচ্ছে মাত্র ১$\frac{১}{৪}$ অংশ।

জেনে রাখা দরকার যে 'মীখাখ' মগজের সেই অংশটির নাম যার স্বল্পতা ও আধিক্যের ওপরে জ্ঞান ও চিন্তা শক্তির তীক্ষ্ণতা ও ভালমন্দ সর্বতোভাবেই নির্ভরশীল।

(আত্ তাওযীহ্ ফী অসূলেত্ তাশ্রীহ্–৪২২ পৃঃ)

সাথে চুয়াল্লিশ ভাগের এক ভাগ সম্পর্ক রাখে। এর থেকে বুঝা যায়, দৈহিক সবলতা বা দৌর্বল্য মগজের পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি নয়। তাহলে নারী ও পুরুষের ভেতরকার মগজ ও দেহের অবস্থার যোগাযোগের ক্ষেত্রে উক্ত পার্থক্য দেখা দিত না।

২। **মস্তিষ্কের আকৃতি ও গঠন ঃ** মেয়েদের মগজে গিরা ও প্যাঁচ খুবই কম। তার আবরণ ব্যবস্থাও অসম্পূর্ণ। মনোবিজ্ঞানীরা এ পার্থক্যটাকে উভয় শ্রেণীর ভেতরকার বৈষম্যের এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে নির্ণয় করেছেন।

৩। **মস্তিষ্কের উপাদান ঃ** অনুরূপ নর-নারীর মগজের উপাদান পরীক্ষা করেও তাতে যথেষ্ট পার্থক্য পাওয়া গেছে। বোধশক্তির প্রধান কেন্দ্রই হচ্ছে মগজের মৌলিক উপাদান বা জাওহারে সঞ্জাবী। সুতরাং তার ভেতরে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা নর-নারীর মেধাগত পার্থক্য সৃষ্টিতে যে বড় রকমের ভূমিকা রাখে, তা না বললেও চলে।

৪। **প্রতিবাদ ও জবাব ঃ** হয়ত এসব বিস্তারিত দলীল প্রমাণ পেয়েও কেউ প্রতিবাদ তুলবে, আজকে নারীদের ভেতরে যে মেধাশক্তির অভাব প্রমাণিত হচ্ছে, তা হল পুরুষদেরই আবহমান কালের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার অনিবার্য ফল মাত্র। যুগ যুগ ধরে নারীরা পুরুষের দাসত্ব করে চলেছে। এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্ববিধ চর্চা থেকে তাদের সর্বদা বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাই তাদের মেধাশক্তি একটানা নিষ্ক্রিয়তায় আজ অচল হয়ে পড়েছে। এখন যদি তাদের আবার বেশ কিছুদিন মস্তিষ্ক চর্চার সুযোগ দেয়া হয় এবং যথাযোগ্য শিক্ষালাভের পথ খুলে দেয়া হয় পুরুষদেরই মত, তাহলে আশ্চর্য নয় যে, তাদের জং ধরা মস্তিষ্ক আবার সক্রিয় ও সতেজ হয়ে এমনকি পুরুষের সমপর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে। ফলে, নর-নারীর ভেতরকার মেধাগত পার্থক্যটা চিরতরে লোপ পাবে। কাসেম আমীন বেগও এ প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"সন্দেহ নেই যে আজকের নারীরা সব দিক থেকেই নরের চাইতে দুর্বল ও হেয়। এখন আমাদের বিবেচ্য হচ্ছে, তারা কি জন্মগতই এরূপ দুর্বল– না শিক্ষার দৈন্য ও দীর্ঘদিনের দাসত্ব তাদের এ নিম্নস্তরে টেনে এনেছে?"

এরপরে তিনি তাঁর মতের সমর্থনে ইউরোপের দু'জন লেখকের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। ইউরোপের অন্যতম দেহ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক লার্বাট বলেছেন ঃ

"নারীদেহের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে আজ পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে, শুধু তার ওপরে ভিত্তি করে আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না। যদি পুরুষের মত নারীরাও প্রকৃতিদত্ত স্বাধীনতা ভোগ করার সমান অধিকার লাভ করে এবং পুরুষরা

যতদিন জ্ঞানচর্চার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের সুযোগ লাভ করেছে, তাদেরও ততদিন জ্ঞানানুশীলনের ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের সুযোগ দেয়া হয়, তখন হয়ত উভয় শ্রেণীর সঠিক ব্যবধান নির্ধারিত হতে পারে।

অধ্যাপক মে তুন জাযো লিখেছেন ঃ "নারী ও পুরুষের ভেতরে মেধাশক্তির যে ব্যবধানটা আজ সবচাইতে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে যুগ যুগ ধরে পুরুষের দাসত্বের নিগড়ে তাদের বন্দী রাখা।"

এসব মতামত পড়ে সাধারণ লোক অবশ্যই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু আমাদের উপরে এ যাদু কোনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না।

কারণ, দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। তা ভালভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছে নর ও নারীর চিরন্তন পার্থক্যটা। তাই এসব খোঁড়া যুক্তি সে সবল সিদ্ধান্তের সামনে মুহূর্তকাল টিকতে পারে না।

প্রথমত, যেসব অসভ্য জাতি ইতঃবিক্ষিপ্ত অবস্থায় আবহমান কাল থেকে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে, এ প্রতিবাদের দাঁতভাংগা জবাবের জন্যে তারাই যথেষ্ট। তাদের ভেতরে শিক্ষাদীক্ষার অভাব তো আর শুধু বিশেষ শ্রেণীর বেলায় নয়, বরং উভয় শ্রেণী সমানভাবেই অশিক্ষিত। অসভ্যতা তাদের উভয় শ্রেণীর ভেতরেই সমানভাবে পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে কি কারণে দৈহিক ও মননের দিক থেকে সভ্য জাতির নর-নারীর মত তাদের ভেতরে এইরূপ পার্থক্য দেখা দেবে? আফ্রিকার অসভ্য জাতিরাও কি নারীদের শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত রেখেছে? তারা কি তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ময়দান থেকে দূরে ঠেলে রেখেছে? তাদের নারীরাও কি যুগ যুগ ধরে নরের দাসত্ব করে চলছে? তা যদি না হয় তাহলে কেন তাদের দু'শ্রেণীর ভেতরে দৈহিক ও মেধা শক্তির পার্থক্য দেখা যাচ্ছে?

দ্বিতীয়ত, পুরুষের আধিপত্য ও দৌরাত্ম্যই যদি নারীর দৌর্বল্যের মূল হয়ে থাকে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুক্ত ময়দানে পুরুষের সাথে বিচরণের সুযোগ না দেয়ায় যদি তাদের এ ন্যূনতা দেখা দিয়ে থাকে, তা হলে অসভ্য জাতির নর-নারীর সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকা সত্ত্বেও কেন পার্থক্য দেখা যাবে? এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মরুবাসী যাযাবরদের নারীরা নরের মতই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। এমনকি বাইরের প্রায় কাজ যেমন, চাষাবাদ, সেচ কার্যাদি সেখানে নারীরাই করে থাকে। তবুও সভ্য জাতিগুলোর মত তাদের নর-নারীর ভেতরেও কেন একইরূপ পার্থক্য বিদ্যমান।

'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া'ও এ ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত। তার বিজ্ঞ সম্পাদক অধ্যাপক দৌফারনী লিখেছেন ঃ

নর ও নারীর দৈহিক ও মানসিক ব্যবধান তোমরা যে ভাবে সভ্যতার কেন্দ্রভূমি পারস্যের বাসিন্দাদের ভেতরে দেখতে পাবে, ঠিক তেমনই দেখতে পাবে আমেরিকার চরম অসভ্য জাতিগুলোর ভেতরে।

আশ্চর্য যে, একদিকে প্রতিবাদ তোলা হচ্ছে, আবহমানকাল সভ্য জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকার দরুনই নারীর দৈহিক ও মানসিক দৌর্বল্য পুরুষের তুলনায় প্রকট হয়ে উঠেছে। অপর দিকে ইউরোপের বিজ্ঞ লেখক ও মনীষীবৃন্দের ধারণা হল, সভ্যতার উন্নয়নই নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যের মাত্রা দৈনন্দিন বাড়িয়ে তুলছে। অধ্যাপক দৌফারণী তাঁর সম্পাদিত 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায়' লিখেছেন ঃ

"সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষরূপে প্রকটিত হয়ে চলছে। যেমন, শ্বেতকায় সভ্য নর-নারীর ভেতরকার পার্থক্য অনেক কম দেখা যায়।

আসল কথা হচ্ছে, স্ত্রী ও পুরুষ জাতির ভেতরকার পার্থক্য যে সর্বতোভাবেই প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক, তাতে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই। ধরে নিন, দেহবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের যেসব প্রমাণ উদ্ধৃত করা হয়েছে তা সবই ভুল। এও মেনে নিন যে, নারী ও পুরুষের ভেতরকার পার্থক্য প্রকৃতিগত নয়, বরং বাইরের প্রভাবজাত। কিন্তু পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতার শ্রেণীগত শক্তির তারতম্যের জবাব দিবেন কি? এ পার্থক্য তো সে সবের ভেতরেও বিদ্যমান।

শুধু তাই নয়, রসায়ন বিদ্যার ক্ষেত্রে যেসব গবেষণা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা হয়েছে তাতে জানা যায় যে, জড়বস্তুও এ প্রভেদ থেকে মুক্তি পায়নি। জ্বালানী কাঠ ও কলাগাছের ভেতরে যেগুলোর লিংগ নির্ণয় করা গেছে, সেগুলো থেকে এও জানা গেছে যে, পুরুষ গাছগুলো স্ত্রী গাছগুলোর চাইতে অনেক শক্তিশালী এবং তাদের এ পার্থক্য নিঃসন্দেহে প্রকৃতিগত।

পশুর ভেতরেও মাদীগুলোর ওপরে নরপশুর যে প্রাধান্য ও সাবল্য দেখা যায়, তাও কি যুক্তি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? দৈনন্দিন আমাদের চারপাশে তার যে ভুরি ভুরি প্রমাণ দেখছি তাই কি যথেষ্ট নয়? সেগুলোর ভেতরেও দেখা যায় যে নরপশু মাদীগুলোর খবরাখবর নেয় ও রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে চলে। গর্ভকালে

মাদীগুলোকে নর পশুরা আরামে থাকতে দেয়। তখন নিজেদের সুখ-সুবিধার চাইতে সেগুলোর সুখ সুবিধাটাই আগে দেখে। পরিশ্রমও অপেক্ষাকৃত বেশি করে। তার চাইতেও বড় কথা যে, সাধারণত মাদীগুলোর চাইতে নরগুলোর দৈহিক আকৃতি বড়। দেহবিজ্ঞান প্রমাণ করছে যে, নরগুলোর দৈহিক শক্তি ও ভেতর বাইরের অঙ্গ প্রতঙ্গের দৃঢ়তা মাদীগুলোর চাইতে ঢের বেশী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণাজাত সিদ্ধান্ত এই যে মাদীগুলোর চাইতে নরপশুর মাংস অধিক বলকারক।

এসব তথ্য কি এতটুকু কথাও প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট নয় যে, সৃষ্টি জগতের স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণীর ভেতরকার এই পার্থক্যটা আদৌ কৃত্রিম নয় -স্বাভাবিক? পরন্তু, এটাই বলা ঠিক হবে যে, স্বয়ং স্রষ্টাই নর-নারীর দেহ ও মগজের উপাদান ভাগ করে দেবার বেলায় নারীকে ছোট ভাগ দিয়েছেন। যা হোক,এ পর্যন্ত যেসব দলীল প্রমাণ পেশ করা হল তা যদি উভয় শ্রেণীর বৈষম্য প্রতিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট না হয়ে থাকে, তা হলে আরো অজস্র নিদর্শন তুলে ধরা যেতে পারে।

মনোবিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ অভিমত এই,-মানুষের জ্ঞানের তারতম্যের মূল হচ্ছে মগজের পার্থক্য। নির্বোধ ও বোকাদের মগজ আর বিখ্যাত মনীষীদের মগজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অভিজ্ঞতাপ্রসূত সিদ্ধান্ত থেকে জানা যায়, যারা জীবদ্দশায় নির্বোধ ও বর্বর বলে খ্যাত ছিল, তাদের মগজ ত্রিশ 'উকিয়া' থেকে কোনমতেই বেশী হয় না। পক্ষান্তরে যাদের জ্ঞান, মেধা ও চিন্তা শক্তির প্রাচুর্য সর্বজন-স্বীকৃত ছিল, তাদের মগজ মেপে দেখা গেছে যে, ষাট 'উকিয়া' থেকেও তা কখনো বেশী হয়ে দাঁড়ায়। মনন শক্তির এটাই হচ্ছে কেন্দ্র আর তাতে নারীর পাল্লা সর্বদা নরের চাইতে হাল্কা প্রমাণিত হয়েছে।

পুরুষের মগজের ওজন সাধারণত ৪৯ ত(১,২) উকিয়া হয়ে থাকে আর নারীর মগজ সাধারণত ৪৪ উকিয়া হয়ে থাকে। দু'শ আটাত্তর জন পুরুষের মগজ মেপে দেখা গেছে যে, সবচাইতে বড় মগজের ওজন ৬৫ উকিয়া এবং সবচেয়ে ছোট ওজনের মগজ হল ৩৪ উকিয়া। পক্ষান্তরে দু'শ একানব্বই জন নারীর মগজ মেপে দেখা গেছে যে, সবচাইতে বড় মগজের ওজন ৫৪ উকিয়া এবং সবচেয়ে ছোট মগজের ওজন দাঁড়ায় ৩১ উকিয়া। এ দলীল কি নরের চাইতে নারীর জ্ঞানশক্তির দৌর্বল্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়? মনন ও ধী-শক্তির কেন্দ্রস্থল মগজের ক্ষেত্রেই যখন নারীর এই দশা, তখন আজকের নারীদের এই জেহাদী জোশ কোত্থেকে জন্ম নিল যে, তারা পুরুষের কাছে তাদের সাম্যের দাবী ও জিগির তুলে ফিরবে?

যারা ইউরোপের নেহাৎ বাজে ও সাধারণ কথাকেও ঐশী বাণী বলে বিশ্বাস করে, কেবল তারাই কাসেম আমীন বেগের বইয়ে দু'একজন ইউরোপবাসীর উদ্ধৃতি দেখামাত্র পরম আনুগত্যের সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে দিতে আদৌ ইতস্তত করবে না। তাই ওপরের মতামতগুলা পেশ করার পরে এখন আমি তার রহস্যোদঘাটন করছি।

আমি যাদের মতামত পেশ করেছি, তাঁরা আজ ইউরোপের সর্বত্র সর্ববাদীসম্মত বিখ্যাত দার্শনিকরূপে শ্রদ্ধালাভ করছেন। আমি মাঝে মাঝে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া থেকে উদ্ধৃতি নিয়েছি, আর তা হচ্ছে যুগ যুগান্তর ধরে সঞ্চিত জ্ঞানের সুরক্ষিত ভান্ডার এবং ঊনিশ শতকের মনীষীদের অভিমতের নির্ভরযোগ্য সংকলন। তার সামনে মে তুন জাযো প্রভৃতির মতামত তো সেরূপ মর্যাদা পেতে পারে, যা পেয়ে থাকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একজনের একগুয়েমী।

নারী পুরুষ থেকে দৈহিক ব্যাপারে দুর্বল হলেও লজ্জা ও উত্তেজনায় পুরুষকে চিরকাল হার মানায়। তাদের মস্তিস্কের অনুভূতি ও উত্তেজনার কেন্দ্রটি পুরুষের চাইতে বেশী সুবিন্যস্ত ও সজাগ। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে নারীদের পাল্লা পুরুষের চাইতে ভারী। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এ শক্তি দ্বারা নারীরা কোনই কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হয় না। কারণ, অনুভূতি ও উত্তেজনার প্রাবল্যের ফলে তারা জ্ঞানের সীমারেখা স্থির রাখতে ব্যর্থ হয়। যেমন, অধ্যাপক দৌফারনী তাঁর এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় লিখেছেন ঃ

"এ পার্থক্যটা উভয় শ্রেণীর বাইরের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈ নয়। পুরুষের ভেতরে যেমন মেধা, বোধ ও জ্ঞান শক্তির উপকরণ বেশী, নারীর ভেতরে তার দুর্বল দিকটা অর্থাৎ লজ্জা ও উত্তেজনার উপকরণ বেশী।"

ইউরোপের অন্যতম খ্যাতনামা লেখক মনীষী ক্রুশিয়ার মতে নারীর প্রকৃতিগত দৌর্বল্যের পরিচয়ই আমরা তদের উত্তেজনার প্রাবল্য থেকে। তাঁর মূল বক্তব্য হল এইঃ

"নারীর শ্রেণীগত দৌর্বল্যের পরিণতি স্বরূপই আমরা তাদের ভেতরে পুরুষের তুলনায় বেশী উত্তেজনার পরিচয় পাই। তাদের এ ত্রুটিই তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব গর্ভ, প্রসব ও স্তন্যদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিপদ আপদ ও দুঃখ কষ্ট ডেকে আনে।

راز درون پردہ زرندان مست پر سو
کیں حال نیست صوفئی معالم مقام را

"জিজ্ঞাসো এ মাতালেরে চাও যদি ভেদিবারে
রহস্য দুর্ভেদ্য,
এ রহস্য জানে না যে পাকা দরবেশ-
হোক যতই আবেদ।"

✦ ✦ ✦ ✦

'দেহবিজ্ঞানের উপরে ইউরোপের সাম্প্রতিক কালের গবেষণা ও অনুসন্ধানকার্য এবং অধুনাতন দেহবিজ্ঞান সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছে যে, সবদিকে থেকেই নর-নারী সমান।"

নারী স্বাধীনতার সমর্থকদর এ পর্যন্ত তাদের দাবীর পেছনে যতসব দলীল প্রমাণ জড়ো করেছে, সবগুলোকে খতিয়ে দেখলে শেষ পর্যন্ত এই একটা জোরালো দলীল তাদের অবশিষ্ট থাকে।

যদি আপনাদের কোন বন্ধু নারী স্বাধীনতার সমর্থক থেকে থাকে এবং আপনার যদি কখনও তার সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করার সুযোগ ঘটে থাকে, তাহলে অবশ্যই দেখেছেন যে, কথায় কথায় অজ্ঞাত এক মুহূর্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে, "ইউরোপের আধুনিক দেহবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, নর ও নারীর দৈহিক ও মানসিক শক্তি সমান। সে হয়তো কয়েক ডিগ্রী উত্তেজনা চড়িয়ে নিয়ে এও বলে উঠবে, এটা হচ্ছে তোমাদের প্রাচ্যের নিপীড়নমূলক বাসি ধারণা যে, নারীরা কোন দিক দিয়েই নরের সমকক্ষ নয়। কিন্তু আধুনিক ইউরোপ সেই সেকেলে ধারণার যবনিকা ছিন্ন করে দুনিয়াকে আজ নারীর প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছে।"

আপনাদের সে বন্ধুটি হয়তো এভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই উত্তেজনাপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছে এবং হাজার পাল্টা যুক্তিও তাকে স্বমত থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ টলাতে সমর্থ হয়নি। তার তখনকার যত সব বাণী ও যুক্তি হয়ত এমন এক সারগর্ভ ভাষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে বেচারা আরও কয়েক ঘন্টা পায়ের ঘাম মাথায় তুলেছে।

আমরা দেখেছি, কাসেম আমীন বেগ যখন এ ব্যাপারে কলম ধরেছেন তখন তিনিও সেই শ্লোগান থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হতে সমর্থ হননি। তাঁর 'আল মারআতুল জাদীদা' ও 'তাহ্‌রীরুল মারআত' বই দুটার যেখানেই নর-নারীর সাম্যের জিগীর তুলেছেন, সেখানেই তিনি ওপরের সেই দলীলটির দোহাই পেড়েছেন। এই

একটিমাত্র দলীলের সামনে পর্দা সমর্থকগণ আর রা করতে পারেন না। ধর্মের দোহাই পেড়েও এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার মুখ দেখা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর থাকে না। ভাষাগত পার্থক্য ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌দের ইউরোপের অবস্থা ও মতামত থেকে দূরে রেখেছে। তাই তাঁদের সে শক্তি বা সুযোগও নেই যে, বিরুদ্ধবাদীদের দাবীর সত্যতা যাচাই করবেন।

কিন্তু ধর্মের মো'জেযা যেরূপ বিপক্ষদলের ওপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেনি, তেমনি করেনি আমাদের ওপরে তাদের শ্লোগানের যাদু। ইউরোপের খ্যাতনামা পন্ডিতদের মতামত উজ্জল হয়ে আমাদের সামনে ধরা পড়ে গেল এবং তাতে যে রহস্য দেখলাম তাও খুলে ধরলাম।

ফেলে আসা অধ্যায়ের বেশির ভাগই আমি সে সব উদ্ধৃতিতে ভরে দিয়েছি। এতেও কি তাদের তেলেসমাতী দাবির যাদুকরী প্রভাব হাওয়া হয়ে উড়ে যাবে না?

বলা হয়, ইউরোপ প্রাচ্যের মান্ধাতার যুগের স্বপ্নের অবসাদ টুটে দিয়েছে। কিন্তু পেছনের আলোচনাগুলো সামনে রেখে নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করে বলুন যে,তার বদলে আমরাই কি তাদের বিগত তিরিশ বছরের বিভ্রান্তির মায়াজাল ছিন্ন করে ফেলিনি? ইউরোপের দেহবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সেরা পন্ডিতদের যেসব অভিমত তুলে ধরেছি, তা পড়েও কি কারো সাহস হবে আবার এ ব্যাপারে মুখ খোলার? এরপরেও কি তাদের দাবী বেঁচে থাকতে পারে? যদি এখনও সে দাবীর সাধ মিটে না থাকে তা হলে আসুন, তার শেষ মীমাংসা আজই হয়ে যাক।

আমাদের বন্ধুরা নারী স্বাধীনতার হৈ হল্লা শুরু করেছেন আজ পুরা তিনটা যুগ ধরে। কিন্তু, এ পর্যন্ত আমাদের কোন শিক্ষিত ভাই-ই তাদের দাবির সত্যতা যাচাইয়ের খাতিরে এতটুকুও খুঁজে দেখলেন না যে, ইউরোপের সুধী মহল সে হৈ চৈ কতটুকু সমর্থন করেছেন? এ দেশের শিক্ষিত মহলের সাধারণ জ্ঞানের মাত্রা থেকে কাসেম আমীন বেগের সাধারণ জ্ঞানের মাত্রা অনেক বেশি। কিন্তু উপরের অধ্যায় পড়ে আপনাদের কি বিস্ময় জাগছে না যে, এতবড় সবজান্তা ভদ্রলোক কি করে ইউরোপের অধিকাংশ মনীষীর সম্মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ কানে না তুলে পারলেন?

এর চাইতেও আশ্চর্য হবেন আপনারা যখন দেখতে পাবেন যে, ইউরোপের দেহবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের ছাড়া অন্যান্য যত বড় বড় মনীষী রয়েছেন, তাঁরাও নারীর স্বাভাবিক দায়িত্ব সম্পর্কে একই রূপ অভিমত পোষণ করেন। ভেবে অবাক হবেন, যখন শুনবেন যে, তাঁরা নারীদের স্বাভাবিক দায়িত্বের গণ্ডি ঘরের ভেতরে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করছেনঃ নারীদের নিজ দায়িত্ব ভুলে বাইরে

পা রাখার মানেই পৃথিবীর বুকে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা ডেকে আনা, সভ্যতার বিপর্যয় ঘটান এবং সামাজিক জীবন ধারায় বিরাট ভাঙ্গন সৃষ্টি করা।

কাসেম আমীন বেগ যে তিনটি দলীল বা অভিমতের ভিত্তিতে এ দাবি দাঁড় করিয়েছিলেন তা আপনারা ওপরের অধ্যায়ে দেখে এসেছেন। কিন্তু তিনি এক স্থানে তার চাইতেও ধাপ্পা দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। সেখানে তিনি এই মন্তব্য করেছেন যে, ইউরোপের সব শিক্ষিত গোষ্ঠীই হয় নারীর বর্তমান স্বাধীনতায়ই তৃপ্ত, নয় এর চাইতেও অধিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী। একটা লোকও সেখানে নেই যিনি নারী স্বাধীনতার বিরোধী। তাঁর বক্তব্য হুবহু উদ্ধৃত করছি ঃ

'এ কারণেই ইউরোপ ও আমেরিকার মানবতার কল্যাণ উন্নয়নকামী দল প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন যেন নারী স্বাধীনতার বর্তমান স্তর আরও এগিয়ে গিয়ে পূর্ণত্ব লাভ করে। পৃথিবীর সেই আদিম মূর্খতার বিরুদ্ধে তাঁদের এরূপ জেহাদ ঘোষণার কারণ হচ্ছে, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস বানচাল করে নর-নারীকে একাকার করে দেয়া।'

এ ক্ষেত্রে ইউরোপ ও আমেরিকায় আজ দু'টি দল সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে দু'ধরনের মত পোষণ করেন। প্রথম দলের মতে, নারী সমাজ ইউরোপ ও আমেরিকায় আজ যতখানি স্বাধীনতা লাভ করেছে, তাই যথেষ্ট। দ্বিতীয় দল এতেও সন্তুষ্ট নন। তাঁরা নারীদের আরও উন্নত অবস্থায় দেখতে চান। তাঁদের ইচ্ছা যে, নারীরা উন্নতির এরূপ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে যেখানে তারা সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমান হয়ে যাবে। কোন দিক থেকেই যেন নর-নারীর ভেতরে পার্থক্য পরিলক্ষিত না হয়।[১]

এরূপ অজ্ঞের মত আন্দাজে পাইকারী হারে ঢিল ছুঁড়লে চলবে কেন? নাম নিয়ে বলতে হবে যে, কারা বর্তমান নারী স্বাধীনতা যথেষ্ট মনে করেন এবং কারা তার চেয়েও কয়েক ডিগ্রী বেশি স্বাধীনতা কামনা করেন। কারণ ইউরোপে আজ যাঁদের মনীষা ও জ্ঞান সর্বজনস্বীকৃত, যাঁদের উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাবিদ বলে সবাই মেনে নিয়েছে, তাঁদের গ্রন্থাবলী আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। তাঁরা তো নারী-পুরুষের সাম্য বিধানের কল্পনা দূরে থাক, বর্তমান নারী স্বাধীনতার আন্দোলনকেই এক ভয়াবহ সাংস্কৃতিক ব্যাধি বলে অভিহিত করেছেন।

বলা বাহুল্য, যদি কেউ কোন দেশ সম্পর্কে দাবি করে যে, সে দেশের সবাই

১ আল্ মারআতুল জাদীদা-কাসেম আমীন বেগ।

অমুক ধারণা বা বিশ্বাসের অনুসারী, আর তার সে দাবি মেনে নিতে কেউ দ্বিধা করে, তাহলে তার মীমাংসা এ ছাড়া হতে পারে না যে, সে দেশের নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতবর্গের সে সম্পর্কিত মতামত উদ্ধৃত করে তার দাবির সত্যতা প্রমাণ করবে।

আমি এ নীতিকেই সামনে রেখেছি। তাই সেখানকার স্বীকৃত মনীষীদের রচনাবলী আগাগোড়া অধ্যয়ন করেছি। তাতে আমি এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে বাধ্য হয়েছি যে, ইউরোপ সম্পর্কে যে দাবি করা হচ্ছে তা আদৌ ঠিক নয়। আমি এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। তা হচ্ছে শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার ও ইউরোপের মনীষীদের মতামতের সারকথা। আমি শুধু তা দেখিয়েই থেমে যাইনি; বরং অগাস্ট কোঁতে, প্রুধোঁ, সোল সায়মন প্রমুখ সেরা দার্শনিক ও নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতদের মতামত তুলেছি। তাদেরকে ইউরোপের জ্ঞানমার্গের প্রদীপ্ত ভাস্কর মনে করা হয়।

কাসেম আমীন বেগ লিখেছেন যে, ইউরোপে এরূপ লোকও রয়েছে যারা নারীর বর্তমান স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট নয়; পরন্তু তাদের পূর্ণ স্বাধীনতাই তাদের কাম্য। আমার তো কথা এই যে, ইউরোপ হচ্ছে হাজার মতের চিড়িয়াখানা। ইউরোপে এমন দলও আছে যারা আবহমান কালের ধর্ম বিরোধী। এরূপ দলও পাওয়া যায় যারা মানুষের যে কোন কাজকেই বৈধ মনে করে। তাদের দৃষ্টিতে অবৈধ বলতে কোন কাজই নেই-সে সব হচ্ছে স্বার্থপর মানুষের স্বকপোলকল্পিত বিধান। এমন লোকও সেখানে রয়েছে যারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সব চাহিদাকেই বাজে বলে উড়িয়ে দেয়। তারা এমন কি শাসন শৃঙ্খলা বলেও কিছু মানতে রাজি নয়। আত্মা বা তার শুদ্ধাশুদ্ধির ধারণা তাদের কাছে নির্ভেজাল গুলতানি ও মূর্খের অন্ধ বিশ্বাস বৈ নয়। সে ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করছি যে, প্রাচ্যবাসীর ওপর পাশ্চাত্যের প্রতিটি ধ্বনি ইউরোপ থেকে উঠেছে বলেই কি তার সামনে আনুগত্যের শির ঝুঁকিয়ে দেয়া ফরয?

আগেই বলেছি যে, ইউরোপে হরেক খেয়ালের মানুষ মিলে। তাই সেখানকার সবার অভিমতই কি মেনে নিতে হবে মাথা পেতে, না দেখতে হবে যে, কারা সেখানে জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষা-দীক্ষায় শীর্ষস্থানীয় এবং নির্ভরযোগ্য? যে কোন বিজ্ঞলোক তো সেখানকার তাঁদের কথায় কান দেবেন, যাদের কথা জ্ঞান ও শিক্ষার মাপকাঠিতে খাঁটি বলে মানা যায়।

আমি কেবল তাঁদের অভিমতই নিয়েছি যাদের আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টা ও বিজ্ঞান দর্শনের সেরা পারদর্শী এবং যুগোপযোগী শিক্ষার যোগ্য শিক্ষক বলে সর্বত্র একবাক্যে মেনে নেয়া হয়েছে। একমাত্র যে সব মত জ্ঞান ও শিক্ষার সাথে খাপ খায়, আমি শুধু তাই-ই গ্রহণ করেছি। তার সামনে যদি কতিপয় অখ্যাত ও নির্ভরের অযোগ্য লোকের মত এনে খাড়া করা হয়, তার প্রভাব আমাদের ওপরে কতটুকু পড়বে?

ইউরোপীয় মনীষীদের অভিমত

স্রষ্টার প্রকৃতি মানব সভ্যতার বিধান অব্যাহত ও সমুন্নত রাখার দায়িত্বটাকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে। তা হচ্ছে ঘরের দায়িত্ব আর বাইরের দায়িত্ব। ঘরের দায়িত্ব নারীর ওপরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তাকে গৃহকর্ত্রী করা হয়েছে। দ্বিতীয় দায়িত্বটি ন্যস্ত করা হয়েছে পুরুষদের ওপরে এবং তাদেরকে সভ্যতার রাজ্যের নিয়ামক করা হয়েছে। এভাবে একই দায়িত্বের পরিপূরক হওয়ায় প্রকৃত নর ও নারীকে ভিন্ন দুই জাতিতে পরিণত না করে একই জাতির পরস্পর সম্পূরক দুই শ্রেণী করে পূর্ণ মানবতার কাজে নিয়োজিত রেখেছে। পুরুষের প্রকৃতিগতই কতকগুলো ত্রুটি রাখা হয়েছে যা নারীর সংযোগ ছাড়া পূর্ণ হবার নয়। অনুরূপ নারীর ভেতরে এমন সব ত্রুটি রাখা হয়েছে যার সম্পূরক কেবলমাত্র পুরুষই হতে পারে। পুরুষ কিংবা নারী যদি পারস্পরিক সহযোগিতা ছেড়ে দেয় কিংবা একদল স্ব-দায়িত্ব ভুলে যায়, তাহলেই মানবতার দেখা দেয় চরম বিপর্যয়। এভাবে নর-নারী একই পূর্ণ মানবতার দু'টি ধারা বা শাখা, তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই মানব সভ্যতার বিধান রক্ষা পেতে পারে।

যারা নারীর সত্তাকে পুরুষদের থেকে পৃথক ও স্বাধীন করে দেখতে চায় তাদের তুলনা হতে পারে সেই মূর্খদের সাথে যারা পানি পান করতে গিয়ে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিলিত শক্তি লোপ করে একটাকে ভিন্ন করে পেতে চায়। অথচ সে মূর্খের জানা উচিত যে, পানির অস্তিত্বই নির্ভর করছে সেই দুটো উপকরণের সংযোগের ওপরে এবং তা থেকে একের বিয়োগে আর পানির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদি পানির বেলায় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের একটাকে অপরটা থেকে ভিন্ন ও স্বাধীন করে দিয়েও পানিকে পানি রাখা সম্ভবপর হত, তাহলে অবশ্য নর ও নারীর এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণী থেকে পৃথক করে দিয়ে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কল্পনা করা যেত। পরন্তু অক্সিজেন যদি পানি সৃষ্টির ধারায় হাইড্রোজেনের কাজ দিত এবং হাইড্রোজেন দিত অক্সিজেনের কাজ, তাহলে নারীও

নরের কাজে দখল দিতে পারত নিশ্চিন্তে এবং তাতে মানব সভ্যতার জগতে কোনরূপ ভাঙ্গনই দেখা দিত না।

কিন্তু আমরা জানি এরূপ হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। যেভাবে হাইড্রোজেনের তুলনায় অক্সিজেন ওজনে বেশি, তেমনি নারীর তুলনায় নর দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে সবল। যেভাবে হাইড্রোজেনের ভারী হওয়া পানি সৃষ্টির পথে অন্তরায় স্বরূপ, তেমনি নারীর স্বাতন্ত্র্য ও পুরুষের গুরুভাবে তাদের হস্তক্ষেপ সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার বেলায় প্রাণ সংহারক বিষ বৈ নয়।

জড়বিজ্ঞানের সেরা পারদর্শী ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক সোল সায়মন 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক ক্রেশিয়ার পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

'নারীর নারীই থাকা উচিত। হ্যাঁ-অবশ্যই নারীকে নারী থাকতে হবে। তাতেই তাদের কল্যাণ এবং এই একমাত্র বৈশিষ্ট্যই তাদের কল্যাণকর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। প্রকৃতির এটাই বিধান এবং এভাবেই প্রকৃতি তাদের পথের নির্দেশ দিয়েছে। তাই তারা যতখানি প্রকৃতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলবে, ততখানি তাদের সাফল্য ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে বেড়ে চলবে। আর যতই তারা প্রকৃতির ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে থাকবে, ততই তাদের বিপদ বেড়ে যাবে। কোন কোন দার্শনিক মানব জীবনে পবিত্রতার বালাই রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। আমি বলছিঃ মানব জীবনে মনোমুগ্ধকর পবিত্রতার ব্যাপক অস্তিত্ব বিরাজমান। হ্যাঁ, তা শুধু তখনই দেখা দিতে পারে যখন নর ও নারী প্রকৃতিদত্ত স্ব-দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকবে এবং তা একনিষ্ঠভাবে সম্পাদন করে চলবে।'

আপনাদের বিস্ময় জাগবে প্রাণে যে, এতবড় দার্শনিকরা কেন নারীদের নারী থাকার উপদেশ দেন? নারী তাদের নারীত্বের বাইরে আবার যেতে পারে কি করে? নারী তো নারীই থাকবে চিরকাল এবং পুরুষ থাকবে পুরুষ। তাই আপনারা শুনে অবশ্যই অবাক হয়ে যাবেন যে, ইউরোপের সুধী মহল সেখানকার আধুনিকা নারীদের নারী বলেই স্বীকার করতে রাজি নন। কারণ, তারা তাদের স্বরূপ ও স্ব-দায়িত্ব ভুলে পুরুষ হবার সাধনা চালাচ্ছে। ফলে তারা নারীত্বের গণ্ডির বাইরে পা রাখবার উপক্রম করেছে। উক্ত মনীষী আরেক স্থানে লিখেছেনঃ

'যে নারী স্বীয় ঘর ছেড়ে বাইরের কাজে মত্ত হতে চায়, সন্দেহ নেই যে, সে পূর্ণাঙ্গ কর্মী হিসেবেই দায়িত্ব সম্পাদন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে আর নারী থাকে না।'

খ্যাতনামা লেখক অধ্যাপক জিওম ফ্রেয়ারো (মানবীয় জীবন পদ্ধতির বিখ্যাত সমালোচক) ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে 'রিভিউজ'-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় আধুনিকা নারীর শোচনীয় অবস্থার চিত্র এঁকেছেন। বিশেষ করে ইউরোপের যে সব নারী বর্তমান নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবে পড়ে পুরুষের দায়িত্বে ভাগ বসাতে এসেছে, তাদের মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেনঃ

যে সব নারী সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি দাম্পত্য জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা রাখছে, স্রষ্টা যে জন্য তাদের সৃষ্টি করেছেন আর যে প্রয়োজনে তাদের এ ধরনের দৈহিক ও মানসিক রূপদান করেছেন, তারা তাকেই বেমালুম ভুলে চলছে। তাদের মেজাজ প্রকৃতিতে সেই বৈশিষ্ট্য আর অবশিষ্ট নেই, যা সেই বয়সের নারীদের ভেতরে স্বভাবত পাওয়া যায়। তারা আজ এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে, যাদের 'নপুংসক' ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

বস্তুত, তাদের পুরুষ বলবার যে রূপ যো নেই, তেমনি নারী বলবারও সাধ্যি থাকে না। পরন্তু তারা উভয় প্রকৃতির সংমিশ্রণে তৃতীয় এক আজব জীব হয়ে পড়েছে। পুরুষ হওয়া তো তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না এ জন্যে যে, প্রকৃতি তাদের দেহ ও মন এরূপ গড়ে ফেলেছে যার সংশোধন তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। আর নারীও এ জন্য থাকছে না যে, তাদের কাজকর্ম, হাবভাব ও চালচলন সবই পুরুষের। নারীর গন্ধও নেই তাতে।

গোটা ইউরোপকে আজ মানব সংস্কৃতির এ বিরাট বিপর্যয় ভাবিয়ে তুলেছে। প্রকৃতির শাশ্বত বিধানের বিরুদ্ধে এ এক ধ্বংসাত্মক বিপ্লব, নিদারুণ ব্যতিক্রম। যদি নারীদের এ বেদনাদায়ক উচ্ছৃঙ্খলতা আরও কিছুদিন অব্যাহত থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে, শীঘ্রই মানব সমাজে বিরাট ভাঙ্গন দেখা দেবে। যার ফলে মানব সভ্যতার ভিত্তিমূল কেঁপে উঠবে।

আশ্চর্য যে, নারী স্বাধীনতার দাবিদাররা নারীর দাসত্বের অভিযোগ তুলে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলছে। অথচ তারা এ কথা ভাবছে না যে, স্রষ্টা পুরুষদের কিভাবে নারীর অধীন ও দাস করে রেখেছেন! স্রষ্টা পুরুষদের ওপরে অপরিহার্য করে

দিয়েছেন নারীর খোরপোষ ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থার জন্য জীবন সংগ্রামে দুর্গম ক্ষেত্রে ঝাঁপ দেয়া। সে জন্য তারা প্রাণ বিপন্ন করেও সমুদ্রের গভীর তলদেশে অভিযান চালিয়ে মণিমুক্তার ভাণ্ডার এনে নারীর পদতলে লুটিয়ে দেয়।

আরও অবাক লাগে যখন দেখি যে, তথাকথিত নারী দরদীরা নারী কল্যাণের দোহাই পেড়ে তাদের স্বাভাবিক প্রয়োজনে সর্ববিধ দায়িত্ব তাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়ে পুরুষের কঠিন জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদের টেনে এনে বিপর্যস্ত করতে চায়। তখন প্রশ্ন জাগে, এটা কি দ্বিগুণ অত্যাচার নয় যে, নারীরা সন্তান ধারণ থেকে শুরু করে মানব জাতির সব রকমের বুনিয়াদী দায়িত্বের গুরুভার কাঁধে বয়েও আবার পুরুষদের বাইরের দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে? তারা একদিকে ঘর সামলাবে, আরেক দিকে বাইরে গিয়েও উপার্জন করবে, এতটা বোঝা তাদের দুর্বল কাঁধে চেপে দেয়ার নামই কি নারী দরদ? এটা কি তাদের দ্বিগুণ দাসত্ব নয় যে, পুরুষেরা যবে বাইরের সব কাজ থেকে হাত ধুয়ে ফিটফাট বাবু সেজে ছড়ি ঘুরিয়ে চলবে, আর নারীরা ঘরের গোটা দায়িত্ব মাথায় নিয়ে বাইরের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গুরুদায়িত্ব নিয়ে চলবে?

গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এটাই হচ্ছে সত্যিকারের সুবিচার যে, নারীরা তাদের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন থেকে নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যাবে এবং তাদের প্রকৃতি ও স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ থেকে তাদের সর্বদা মুক্ত রাখা হবে।

একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই, যদি নারীদের লাগাম ছাড়া হয়ে সব ক্ষেত্রে বিচরণ করার তথা পুরুষদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টির চরম সুযোগ দানই সংস্কৃতি, সভ্যতা ও পূর্ণাঙ্গ মানবতার নমুনা হয়ে থাকে, তা হলে অসভ্য জাতিগুলোকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সভ্য জাতি বলে ঘোষণা করা হয় না কেন? তাদের তো পুরুষগুলো সাধারণত নিষ্কর্মা হয়ে ঘুরে বেড়ায় আর নারীরাই ঘরে-বাইরের সব কাজে আধিপত্য বিস্তার করে থাকে।

আসলে নারীদের ওপরে যত কিছু অবিচার চলছে তার জন্য দায়ী স্বয়ং প্রকৃতি। খোদা তাদের সৃষ্টির গোড়াতেই এমন ত্রুটি রেখে দিয়েছেন যার জন্য নারীরা জীবন সংগ্রামের কঠোর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে স্বভাবতই অপারগ। নারীর ভেতরের প্রকৃতি ও বাইরের আপাদমস্তক আকৃতি পরিষ্কার বলে দেয় যে, সে সব কঠোর কার্য সম্পাদনের জন্য তাদের সৃষ্টি হয়নি যা তাদের জন্য চাঁইরা দাবি করে বেড়ায়।

ইউরোপের মনোবিজ্ঞানের উদগাতা, উচ্চ পর্যায়ের লেখক ও আধুনিক দর্শনের স্বীকৃত সাধক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ ঘরের বাইরের জীবনের সাথে নারীর নাড়ী নক্ষত্রের বিন্দুমাত্র যোগ নেই, থাকতে পারে না। তাদের কাজ মানব জাতির তদারক ও ঘরকন্নায় লিপ্ত থেকে সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তা শোনার মত কান কোথায়?

বিখ্যাত সমাজবাদী দার্শনিক মনীষী প্রুধোঁ স্বীয় খ্যাতনামা গ্রন্থ 'ইব্‌তেকারুন্নেজাম'-এ লিখেছেনঃ

'প্রকৃতির বিধানই নারীকে মানবের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্মুক্ত ময়দানে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। সে শিক্ষার দুর্গম পথ অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু শিক্ষা তাকে সহায়তা করতে নারাজ। তাই তাদের বর্তমান পদক্ষেপের ভয়াবহ পরিণতির আশংকায় আমরা দিন গুণছি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে নারীদের কোনই অবদান নেই। নারীদের আদৌ সহযোগিতা না নিয়েই মানব জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলছে। নিত্য নতুন বিস্ময়কর আবিষ্কার দ্বারা বিশ্বকে উত্তরোত্তর বিমণ্ডিত করে চলছে। পরিষ্কার ভাষায় বলা চলে, একমাত্র পুরুষ জাতিই গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। সেগুলোকে তারা যুগে যুগে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে চলছে। সে সবের যথাযোগ্য প্রয়োগ তাদেরই হাতে হচ্ছে। তার থেকে শুভাশুভ ফল যা কিছু তারাই উৎপাদন করছে। তার থেকেই তারা নারীদের ভরণ-পোষণ ও সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করে চলছে।

'জড় দর্শনের জনক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মূলনীতি নির্ধারক অগাস্ট কোঁতে তাঁর বিখ্যাত 'জড়দর্শনের ভিত্তিতে পৌরনীতি' নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ

'যেভাবে আমাদের যুগে নারীর সামাজিক অবস্থা নিয়ে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়ে চলছে, এ ধরনের বিপ্লব ও বিবর্তন জীবন পদ্ধতি ও সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক যুগেই দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির বিধান নারী শ্রেণীকে সর্বদাই ঘরকন্নার কাজে নিয়োজিত রেখে চলছে। এ বিধানে কোনদিনই বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয়নি। স্রষ্টার এ বিধান এতই সঠিক ও সুচিন্তিত যে, তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে যত শত ভ্রান্ত চিন্তাধারা গড়ে উঠুক না কেন, তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি বা ব্যতিক্রম দেখা দেয়নি। সেই শ্বাশ্বত বিধান তো সর্বদাই হাজার বাধার পাহাড় ডিংগিয়ে অব্যাহত গতিতে সব আন্দোলনের ওপরে মাথা তুলে এগিয়ে চলেছে।'

শ্রেণীগত এ পার্থক্য শুধু মানুষেই সীমাবদ্ধ নয়। দুনিয়ার সব কিছুর ভেতরেই এ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কর্ম ও প্রেরণা এ দুয়ে মিলে দুনিয়ার সাংস্কৃতিক ধারা অব্যাহত রেখে চলছে। তাই নারীর স্বাতন্ত্র্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের কর্মবহুল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মানেই হচ্ছে কর্মহীন নিছক প্রেরণা থেকে কাজ নেয়া এবং স্রষ্টার নির্ধারিত বিধি-নিয়ম লংঘন করা। যার ফল দাঁড়ায় ঃ

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه .

অর্থাৎ যারা স্রষ্টার নির্ধারিত ক্ষেত্র লংঘন করল তারা আত্মপীড়ক সাজল।

দার্শনিক শ্রেষ্ঠ কোঁতে অন্যত্র লিখেছেনঃ

'পুরুষের ক্ষেত্রে নারীদের চর্চার ফলে ভয়াবহ পরিণাম ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে চলেছে। এর প্রতিকার হচ্ছে, পুরুষের ব্যাপারে স্ত্রী জাতির স্বাভাবিক যে বৈষয়িক দায়িত্ব রয়েছে তা বিশেষভাবে সীমিত ও নির্দিষ্ট করে দেয়া।'

পুরুষের ওপরে অপরিহার্য বিধান হচ্ছে, নারীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। এ হচ্ছে স্রষ্টার সেই ফরমান ও প্রকৃতির সেই বিধান যা স্ত্রী জাতির জীবনধারাকে ঘরের ভেতরে সীমিত করে দিয়েছে। এ হচ্ছে সেই বিধান যা সম্মিলিত জীবন ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত ভয়াবহ জটিল সমস্যাবলীর সহজ ও সুন্দর সমাধান দেয়। এ বিধানই নারীকে তার প্রকৃতিগত প্রেরণা থেকে মানব জাতির সেবামূলক মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রেখে চলছে। তাই বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ ক্ষেত্রে আজকের নারীদের একদল যা আমাদের থেকে দাবি করছে, তা একেবারেই অবাস্তব ও অসম্ভব। কারণ, খোদায়ী বিধান ও প্রকৃতির নিয়মের সাথে তা আদৌ সামঞ্জস্য রাখছে না। যেহেতু তাদের এ দাবি খোদায়ী বিধানের বিরোধী এবং তাঁর দেয়া নির্দেশ লংঘন করছে, তাই প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলা ব্যাহতকারী এ অপরাধ যখন জগতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ডেকে আনবে, তার হাত থেকে কোন এলাকাই রেহাই পাবে না।

আপনারা কি জানেন, এ কার মত? পৌরবিজ্ঞানের যিনি শ্রেষ্ঠতম গুরু, জড়দর্শনের যিনি আদি পিতা, দুনিয়ার বুকে যাঁর সীমাহীন খ্যাতি ছড়িয়ে রয়েছে, সেই মনীষীর এই অভিমত। যে জড়দর্শনের তিনি স্রষ্টা, তা মানব জাতির মনন ক্ষমতার চরম স্তর বলে এ জন্য বিবেচিত যে, বস্তু জগতের সব কিছু তত্ত্বের বোধগম্য নির্দেশ আমরা এ দর্শন থেকেই পেতে পারি।

স্যামুয়েল স্মাইলাস হচ্ছেন উনিশ শতকের সেই খ্যাতনামা মনীষী যিনি ইংল্যাণ্ডের আধুনিক বিপ্লবের স্বীকৃত স্রষ্টা। তাঁর নৈতিক শিক্ষামূলক গ্রন্থাবলী আজ ইউরোপের নারী ব্যবস্থায় এক অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হচ্ছে। ইউরোপের সব সুধী লেখক ও পণ্ডিতবৃন্দ তাঁকে চারিত্রিক শিক্ষার রাজা ও সর্বমান্য লেখক আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর রচনাকে সর্বত্র বাইবেলের মত ধর্মীয় মর্যাদা দিয়ে ব্যাপকভাবে পড়া হয়। তাঁর বই স্থান না পেলে এমনকি আলমারীকে অশুভ মনে করা হয়। সেই উঁচুস্তরের চিন্তাশীল নৈয়ায়িক দার্শনিক তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'The Character'-এ ইংল্যাণ্ডের নারী স্বাধীনতার আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

'প্রাচীন রোমকদের দৃষ্টিতে শালীন মেয়েদের সবচাইতে প্রশংসনীয় উঁচুস্তরের কাজ হচ্ছে ঘরকন্না চালানো এবং বাইরের টানা-হেঁচড়া থেকে মুক্ত থাকা। আমাদের এ যুগেও বলা হয়, নারীদের ভূগোল শিক্ষা এ জন্য অপরিহার্য যে, তারা নিজ নিজ ঘরের দরজা জানালাগুলো যথাযথ স্থানে বসাবার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হবে। রসায়ন শাস্ত্র তাদের এ জন্য শেখা দরকার যে, ডেক্‌চির রান্নার সামগ্রী উথলে উঠলে যেন যথাসময়ে সামলে নিতে পারে। লর্ড বায়রন নারীর প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত হয়েও অভিমত পেশ করছেনঃ মেয়েদের লাইব্রেরীতে ধর্মগ্রন্থ ও পাকপ্রণালী ছাড়া আর কোন বই থাকা অনুচিত।

অথচ এসব মতকে আজ নারীর চরিত্র ও সংস্কৃতির দিক থেকে অসমর্থনীয় এবং তাদের উন্নতির পথে অন্তরায় মনে করা হয়।"

প্রাচীন রোমকদের ধারণা ও লর্ড বায়রনের অভিমত উদ্ধৃতির মাধ্যমে মনীষী কোঁতে তাঁর নিজের মতই তুলে ধরেছেন। এরপরে তিনি নারীদের আযাদী ও শিক্ষা সম্পর্কে ইউরোপের বর্তমান সাধারণ মত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি অনুরূপ ধারণাকে মাতলামি আখ্যা দিয়ে সভ্যতার পথে ধ্বংসাত্মক বলে নির্দেশ করেছেনঃ

"এ সব মতের বিরুদ্ধে আজ আরেকটা মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আর তা গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে। রোমকদের ও বায়রনের মতকে যদি চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পরিপন্থী মনে করা হয়, তা হলে এ দ্বিতীয় মতটিকে মাতলামিপ্রসূত প্রলাপ মনে করাই সঙ্গত। কেননা এ মতটা প্রকৃতির বিধানের সাথে আদৌ যোগ রাখে না। এ মতের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীদের সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এতখানি এগিয়ে দেওয়া যেন শ্রেণীগত বাহ্যিক পার্থক্যটুকু ছাড়া পুরুষের সাথে তারা একাকার হয়ে যেতে পারে এবং রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত অধিকারের দিক থেকে নারীকে পুরুষের সমান বলে মেনে নেয়া হয়।"

স্রষ্টাই নারীর ওপরে নরের প্রাধান্য দিয়ে রেখেছেন। যদি নারীর অদৃষ্টে দাসত্ব থেকে থাকে তা হলে ভাল করেই বুঝে নিন যে, দাসত্ব ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। স্রষ্টা গোটা পৃথিবীর শান্তি ও শৃংখলা চান। আমাদের কোন্ পক্ষ কি বলেছেন বা ভাবছেন তা নিয়ে তাঁর আদৌ মাথা ব্যথা নেই। তিনি এ যুগের কতিপয় বিভ্রান্ত তরুণের নারী স্বাধীনতার শ্লোগানে ভড়কে গিয়ে স্বীয় চিরন্তন ব্যবস্থা পাল্টাবেন কি? যখন নারী স্বাধীনতা প্রকৃতির শাশ্বত বিধানের পরিপন্থী বিধায় অসম্ভব এবং তা মানব সভ্যতার পক্ষে হুমকি স্বরূপ, তখন অনর্থক এ ভাবে হৈ চৈ না করে ব্যাপারটি তলিয়ে দেখার প্রচেষ্টা চালানোই সঙ্গত নয় কি?

ভেবে দেখুন, সভ্যতার বিধানে নারীর মর্যাদা কত বেশী দেয়া হয়েছে। গোটা দুনিয়াকে তাদের কতখানি মুখাপেক্ষী রাখা হয়েছে। মানব জাতি তাদের কাছে কতখানি ঋণী এবং কোন্ দিক থেকে ঋণী তাও একবার ভেবে দেখুন। আর পুরুষদেরই বা দায়িত্ব কি? পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত নারীদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোথায় কতটুকু অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়েছে, আর এখনই বা তার কতটুকু অংশ দিচ্ছে? তাই জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে নারীদের সম্পর্কে যতটুকু বুঝতে পেরেছেন, চিত্তের অবাঞ্ছিত তাড়নার দায়ে তার বেশী কিছু করতে যাবেন না। কারণ, প্রকৃতির বিধান লংঘন করা আদৌ সম্ভব হবে না।

বিখ্যাত নিহিলিস্ট (জড়বাদী) দার্শনিক মনীষী প্রুডেন 'ইবৃতে কারুননিযাম' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"সমাজ সৃষ্টির মূলে রয়েছে তিনটি উপাদান। জ্ঞান, কাজ ও ন্যায়-নীতি। এখন ভেবে দেখুন নর ও নারীর কোন্ শ্রেণীর ভেতরে এ তিন উপাদানের কতটুকু অংশ রয়েছে এবং সে দিক থেকে পারস্পরিক পার্থক্য কতটুকু? মানব সভ্যতার ইতিহাস আমাদের বলে দেয়, জ্ঞান, কর্ম ও ন্যায়নীতির বাস্তবায়নে নর ও নারীর অংশগ্রহণের পার্থক্য হচ্ছে ৩x৩x৩ এর সাথে ২x২x২ এর যা প্রভেদ তাই। মানে, সাতাশ ভাগ ও আট ভাগে যে ব্যবধান। তাই নারীদের জন্যে যারা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার, তারা মূলত নারীদের অনাচারের কয়েদখানায় আবদ্ধ করতে চায়। সে কয়েদখানা তাদের কল্পিত দাসত্বের কয়েদখানা থেকে মোটেও কম নয়; বরং অধিকতর ভয়াবহ।"

এই জড়বাদী দার্শনিকই অন্যত্র বলেনঃ

"যেহেতু নারীদের বহু আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য দান করা হয়েছে, সে দিক থেকে তারা নিঃসন্দেহে অমূল্য রত্ন বিশেষ এবং এক্ষেত্রে পুরুষের উপরে স্থান লাভ করেছে। নারীর যে সব সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ পুরুষের আওতাধীনে থেকেই হতে পারে। কারণ, নারীর স্বাভাবিক দায়িত্ব এই যে, সে তার সেই সব অমূল্য গুণাবলী অক্ষুণ্ন রাখবে যা তার স্বাতন্ত্র্যে অনিবার্যভাবেই লোপ পাবে। তাই সে সবের বিকাশের জন্যেই স্বামীর ঘর করা তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও সাম্য দাবী তাকে সৌন্দর্যহারা বিশ্রীরূপ দান করবে। এর ফলে তাদের স্ত্রীত্বের মৌলিক মর্যাদা লোপ পাবে; প্রেম প্রীতির তারা আর প্রতিমূর্তি থাকবে না। ফলে, মানবজাতির ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করবে তারা।"

মজার ব্যাপার হল এই, কাসেম আমীন বেগ আর তাঁর সমর্থক মান্যবরেরা শিশু পালনের বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অথচ তার সাথেই আবার নারী স্বাধীনতার আব্দার তুলেন। কাসেম আমীন বেগ লিখেছেন ঃ

"অধিকাংশের ধারণা যে, শিশু পালন একটা সামান্য ব্যাপার। একটা মূর্খ মেয়েলোক দিয়েও তা চলতে পারে। কিন্তু যাঁরা মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সৌন্দর্যে বিমণ্ডিত রয়েছেন, তারা অবশ্যই বুঝতে পারেন যে, মানব জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভেতরে এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন ব্যাপার আর নেই। দুনিয়ার যাবতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা সম্পর্কিত কার্যাবলীর ভেতরে কোন কাজই শিশুদের যথার্থরূপে লালন পালনের মত কঠিন দায়িত্বপূর্ণ নয়। মানব জাতির যত সব শিক্ষাগত ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের বুনিয়াদ এই লালন পালনের ওপরই নির্ভরশীল-যা শৈশবে তারা মায়ের হাতে পেয়ে থাকে। মানুষের জ্ঞান ও চরিত্রগত পূর্ণত্বের মূল উৎস সেই শৈশবকাল, যখন সে স্রষ্টার নিয়োজিত স্নেহময়ী শিক্ষকের হাতে মর্যাদা ও পূর্ণত্বের ভূমিকা অধ্যয়ন করে থাকে। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখতে পাবে যে, যথাযথ লালন পালন, মানুষের দৈহিক ও আত্মিক সংগঠন ও উন্নয়নের বিধান অবগতির ওপরে সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। পরিশ্রম ও সতর্কতার দিক থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যাবে যে, লালন পালন এমনি এক ব্যাপার যাতে চরম ধৈর্য ধারণ ও কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে। জন্মের দিন থেকে সাবালেগ হওয়া পর্যন্ত সন্তানের দেখা-শোনা, অসীম ধৈর্য ও তিতিক্ষা নিয়ে অশেষ দুঃখের পরিণামফল দেখার জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় দিন কাটানো, এমনকি এভাবে

১ আল্ মারআতুল জাদীদা-কাসেম আমীন বেগ।

সুদীর্ঘ চৌদ্দ পনের বছর অবধি অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সন্তানকে সাফল্যজনকভাবে বিশেষ স্তরে পৌঁছিয়ে দেবার কৃচ্ছ সাধনা, আদৌ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।"[১]

এখানেই প্রশ্ন দেখা দেয়, যে নারীর কাঁধে এতবড় কঠিন দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, স্রষ্টার বিধান যাকে এতবড় দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করেছে, সে কি করে বাইরের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কোন্দল ও টানা-হেঁচড়ায় অংশগ্রহণ করবে? এতে বিন্দু বিসর্গ সন্দেহেরও অবকাশ নেই যে, সন্তান লালন পালনের কাজ সীমাহীন কষ্টকর ও অশেষ সতর্কতানির্ভর ব্যাপার। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কঠিন কর্তব্য কি সেই হতভাগীদের ওপরে শাসন শৃংখলা ও রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের জটিল ভারও বয়ে চলা অপরিহার্য করে দেয়?

তোমরা বলছ, নারীর স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে পুরুষরা। নারীদের তারা দাসত্বে ও নিপীড়নে অভ্যস্ত করে তুলেছে। কিন্তু তোমরা সত্যি করে বল দেখি, নারীদের বাইরের হাঙ্গামা থেকে মুক্ত রেখে স্বদায়িত্বে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগের সুযোগ দান কি সুবিচারের কাজ, না মানব সভ্যতার বুনিয়াদী গুরুদায়িত্বভার তাদের কাঁধে চাপা থাকা সত্ত্বেও আবার গোদের উপরে বিষফোঁড়ার মত দুনিয়ার রাজনীতি ও সংস্কৃতির বোঝাও তাদের ওপরে চেপে দেয়াই সত্যিকারের ইন্‌সাফের কাজ? তোমরা বলছ, আমরা সুবিচার করছি না; আর আমরা বলছি, তোমরা সুবিচার থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে রয়েছ। পুরুষের কাঁধের বোঝাটা নিয়েও নারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়াটা দাসী বানানো নয়, অথচ তাদের সে সব অশোভনীয় ও অস্বাভাবিক কাজ থেকে মুক্তি দেয়াই হল যুলুম আর বেইন্‌সাফী?

তোমরাই বলছ, সন্তান প্রতিপালনের মত গুরুতর ও কঠিন কর্তব্য দুনিয়ায় আর নেই। অথচ, তবু কেন নারীদের সে দায়িত্ব সম্পাদনের সুযোগ দিচ্ছ না, যা তারা প্রকৃতিগত যোগ্যতার বলেই সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে সমর্থ?

সত্য কথা হচ্ছে এই, তোমরা যদিও নারীর পক্ষে ওকালতী চালাচ্ছ বলে বড় গলায় দাবী করছ, কিন্তু সে ওকালতী দুর্ভাগা নারীদের ধ্বংস ও বিলুপ্তির পথই খুলে দিচ্ছে। আমরাই আসলে নারীদের সত্যিকারের কল্যাণকামী, যারা তাদের বুঝাতে চেষ্টা করছি যে, প্রকৃতির বিধান অনুসারে তারা যে দায়িত্বের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে, কোন শরীফ ও অবলা নারী যেন তার বাইরে পা দিয়ে মারাত্মক অপরাধী না সাজে।

কাসেম আমীন বেগ আমেরিকার এক চীফ জাস্টিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তা থেকে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাইরের ব্যস্ততায় জড়িত থেকেও নারীরা ঘরের কাজ নির্বিঘ্নে চালাতে পারে। তাঁর মূল বক্তব্য হল এইঃ

"বাইরের বিশাল ও ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নারীকে ঘরের কাজ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। তারা সর্বসাধারণের সাথে সামাজিক কাজ কর্মে যোগ দিয়েও ঘরের কাজ যথারীতি সম্পাদন করতে পারে। আমি আজ পর্যন্ত কোন এলাকার কারুর কাছ থেকেই এরূপ খবর পাইনি যে, সে তার স্ত্রীর বাইরের কাজ কর্মে যোগদানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে।"[১]

আমি কাসেম আমীন বেগ ও তাঁর মতানুসারীদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আমেরিকার জজ সাব যা বললেন তা কি ঠিক? আর এ কথাও কি সত্যি যে, তোমরা সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কষ্টসাপেক্ষ মনে কর? এ দুটাই যদি সত্যি হয় তা হলে জিজ্ঞাস্য, এটা কি কখনও সম্ভব হতে পারে যে, প্রথম মতের সমর্থন করেও দ্বিতীয় মত অক্ষুণ্ন রাখা যায়? দুই আর দুই পাঁচ এবং দুই আর দুই চার-এ দুটা মতই কি সত্য হতে পারে? এ সব প্রশ্নের জবাব তোমাদের থেকে আশা করা বাতুলতা মাত্র। তাই আমি নিজেই তার জবাব দিচ্ছি।

হাঁ-আগুন ও পানির মত পরস্পর বিরোধী মতেরও সমন্বয় সম্ভবপর। আর তা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন প্রকৃতির বিধান পাল্টিয়ে দেয়া সম্ভবপর হয়। যদি খোদার নির্ধারিত বিশ্ব প্রকৃতির বিধান ওলট পালট হয়ে যায়, যদি পূর্ব কোনদিন পশ্চিম, আর দক্ষিণ পাল্টিয়ে উত্তর হয়ে যায়, তা হলেই সব হতে পারে। অথচ খোদার ঘোষণা হচ্ছেঃ

فِطْرَةَ اللهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ .

(খোদার সৃষ্ট প্রকৃতি-ভিত্তিতে যার মানুষকে গড়ে তোলা হয়েছে, পরিবর্তন নেই সে সৃষ্টির।)

কাসেম আমীন বেগ লিখেছেনঃ

"সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত নারীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের ওপরে চারটি অধ্যায় পার হয়েছে। আদি যুগে মানুষের

---

১ আল্ মারআতুল জাদীদা-পঞ্চম অধ্যায়।

আদিতম স্তরে নারী ছিল পূর্ণ আযাদ, সব ক্ষেত্রেই মুক্ত ও স্বাধীন। এরপর এল গৃহস্থালীর যুগ। কাজ সৃষ্টি হল মানবের নিত্য নতুন প্রয়োজনে নতুন নতুন ধরনের। এ দ্বিতীয় যুগে এসে নারীরা নরের দাসত্ব মেনে নিল এবং তাদের স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত আযাদী পুরুষরা কেড়ে নিল। এরপরে তৃতীয় যুগ শুরু হল। এ যুগে মানুষের জ্ঞানগরিমা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগিয়ে চলল ও দিকে দিকে তার ফলাফল ছড়িয়ে যেতে লাগল। তাই নারীর দাসত্বের অধ্যায়ে মোড় নিল এবং সে তার স্বাভাবিক অধিকার অর্জনের দিকে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। কিন্তু পুরুষের স্বার্থপরতার জন্য তাদের সে প্রচেষ্টা সফল হল না। তারা নারীর যে স্বাভাবিক অধিকার মেনে নিতে বাধ্য ছিল, তাও তাদের ভোগ করতে দিতে নারাজ হল। অবশেষে চতুর্থ যুগ এল। মানুষ জ্ঞান গরীমা ও শিক্ষা সভ্যতায় এ যুগে পূর্ণত্ব লাভ করল। সভ্য মানুষ নারীদের প্রকৃতিগত স্বাধীনতার দিকে তাদের উদার দৃষ্টি নিবদ্ধ করল এবং তারা তা সর্বতোভাবে মেনেও নিল। এ ভাবে নর-নারী আবার সমান মর্যাদা লাভ করল। এ হচ্ছে নারীর মোটামুটি ইতিহাস এবং বিশ্ব সভ্যতার চারটি অধ্যায়।"[1]

বিজ্ঞ লেখক নারীর গোটা ইতিহাস খুলে ধরলেন। অথচ এ কথাটা বলতে ভুলে গেলেন যে, আদিতম স্তরের নারীরা কোন্ ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করছিল? দ্বিতীয় যুগই বা এসে তারা কিরূপ দাসীবৃত্তি ও স্বামীর অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হল? ঘর সংসার পত্তনের সাথে সাথেই কি করে তাদের পয়লা যুগের আযাদী লোপ পেয়ে গেল? তখন তারা কেনই বা পুরুষের থেকে আজকের মত নিজেদের আযাদ করে নিল না?

এ সব প্রশ্ন নিয়ে যদি কাসেম আমীন বেগ চিন্তার ক্ষেত্রে কিছুমাত্র বেগ স্বীকার করতেন, তা হলে তিনি নির্ঘাত বুঝতে পারতেন যে, সে সব যুগেও নারী স্বাধীনতার পথে এমন সব প্রাকৃতিক বাধা ও বাধ্যবাধকতা ছিল, যার থেকে নারীদের রেহাই পাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আমি সে আলোচনা ছেড়ে শুধু প্রথম প্রশ্নটার পুনরুল্লেখ করে জানতে চাই যে, প্রাথমিক স্তরে নারীর প্রকৃত অবস্থাটা কী ছিল? তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার স্বরূপ কি ছিল? কারণ, দাবী করা হচ্ছে যে, প্রথম যুগে নারীরা ছিল পূর্ণ স্বাধীন। দ্বিতীয় যুগে এসে তা হারিয়ে ফেলে তারা পুরুষের দাসত্বের নিগড়ে বাঁধা পড়েছে। তৃতীয় যুগে সেদিকে আবার তাদের দৃষ্টি পড়েছে যা

১ আল্ মারআতুল জাদীদা-তৃতীয় অধ্যায়।

সাফল্যমণ্ডিত হল এই সভ্যতম চতুর্থ যুগে এসে। তাদের এ দাবীর যথার্থ বিচারের জন্যেই আমাদের এখন খতিয়ে দেখতে হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে আদিম স্তরে নারীর অবস্থাটা কি ছিল। তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে, আজ আবার নারীর হৃত আযাদীই তোমরা ফিরিয়ে দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছ। উনবিংশ শতাব্দীর এনসাইক্লোপেডিয়ার প্রণেতা লিখেছেনঃ

"এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, নারীদের আদিম স্তর সেটাই যখন মানুষ ঘর-সংসার বাঁধবার স্তরে পৌঁছেনি এবং নারীরা তাই সব রকমের সাংসারিক প্রয়োজনের বাঁধন থেকে পূর্ণ মাত্রায় স্বাধীন ছিল। এ স্বাধীনতার প্রকাশ্য ফল এটাই ছিল যে, সে যুগে তারা ছিল চরম অবমানিতা ও নির্যাতিতা। তাদের পথে ঘাটে সীমাহীন লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হত। কিন্তু, যখন ঘর সংসারের পত্তন হল, সেই থেকে নারীর অবস্থা আগাগোড়া বদলে গেল। গৃহস্থালিতে পা রাখতেই হাজার রকমের বাঁধন এসে তাদের বেষ্টন করে ফেলল। তাই তথাকথিত বন্য স্বাধীনতা হারিয়ে তারা সভ্যতার সুশৃঙ্খল বাঁধনে বন্দিনী সেজে চলল। এর বিনিময়ে তারা এমন এক মৌলিক মর্যাদা লাভ করল যা এর আগে তাদের আদৌ ছিল না।"

এর থেকে জানা গেল, যদিও নারী জাতি প্রাথমিক স্তরে স্বাধীন ছিল, কিন্তু তাদের অসহায় ও অবমাননাকর অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যার চাইতে অধিক দুর্গতি কল্পনাও করা যেতে পারে না। তারপরে সংসারের বাঁধন এসে তাদের স্বাতন্ত্র্য লোপ করে দিল। তবুও সেখানে তারা এমন এক আধ্যাত্মিক মর্যাদার ময়ূর সিংহাসনে আসন গেড়ে বসল, যা তাদের এর আগে আদৌ জুটেনি।

নারীর তথাকথিত দরদী দালাল গোষ্ঠী চাচ্ছে তাদের আবার সেই আদিম অবমাননাকর স্তরে ফিরিয়ে নিতে। এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায় এই, নারীকে বর্তমান মর্যাদার সিংহাসন থেকে বিচ্যুত করে সেই আদিম যুগের বল্লাহারা পরিবেশে তাদের আদিম প্রবৃত্তির মুক্ত শিকারে পরিণত করে নেয়া। হ্যাঁ, যদি এই তাদের ভেতরকার মতলব হয়ে থাকে, আর তথাকথিত প্রগতিবাদী নারীরা যদি সেটাই কামনা করে, তা হলে তাদের সে পথে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। আদিম পাশবিকতা ও বন্য জীবনের প্রতি যদি এতই মোহ জেগে থাকে, তা হলে ছেড়ে দাও সভ্য জীবন। আরেক কথায়, মানবতার প্রতি যদি এতই ঘৃণা জন্মে থাকে, টেনে নাও নারীদের বর্তমান মৌলিক মর্যাদার স্বর্ণের পালংক থেকে সেই পাশবিকতার মুক্ত ময়দানে।

ইসলাম ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সভ্যতা নারীদের যে মর্যাদার আসন দিয়েছে, তা একজন ইতিহাসজ্ঞ লেখকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। আজ ইউরোপে যে বল্গাহারা নারী স্বাধীনতার তুফান জেগে দেশের পর দেশে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা বহায়ে চলছে, তা দেখে সেখানকার সুধী মনীষীবৃন্দ সেই পথই বেছে নেবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন যা চৌদ্দ শ' বছর আগে ইসলাম দুনিয়াকে শেখাল। যদি আজ মুসলমানরা ইসলামের শিক্ষালোকে ও নির্দেশিত পথে নারীর স্বাধীনতা বনাম দাসত্বের এ ঝগড়ার সমাধান খুঁজে দেখে, তারা যদি তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে যে, ইসলাম নারী সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত পেশ করেছে, তাতে কতখানি তাদের আযাদী দিয়েছে আর কতটুকু অধিকার তাদের স্বীকার করেছে, একদিকে গোলামী ও অপরদিকে লাগাম ছাড়া আযাদীর মাঝে ইসলাম কি প্রতিকার পন্থা নির্দেশ করেছে, তা হলে নির্ঘাত তারা ইউরোপের থেকে সবক হাসীলের জন্য আদৌ পাগলপারা হতে যাবে না।

দুঃখের বিষয়, এক ব্যাপারে বিতর্কের অবতারণা শুরু করে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত করা চলে না। তা না হলে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে ইসলামের অতুলনীয় ব্যবস্থা তুলে ধরে দেখিয়ে দিতাম যে, দুনিয়ার সর্ববিধ মনগড়া বিধান এবং মানুষের সব ধরনের আবিষ্কৃত পন্থা সেই ঐশী ও আধ্যাত্মিক বিধানের সামনে কিছুই নয়। এখানে শুধু আমি এতটুকু বলার লোভ সামলাতে পারলাম না, যা একটা বিধবা নারীর জন্যে ইসলাম ব্যবস্থা রেখেছে। এরূপ একটা অসহায় ও অরক্ষিতা নারীর ঘর থেকে বেরিয়ে জীবিকা উপার্জনের প্রয়াস পাওয়া উচিত, না তার জন্যে আরও কোন ব্যবস্থা থাকতে পারে?

মূলত এ একটা জটিল প্রশ্ন। কাসেম আমীন বেগও এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, এরূপ অবস্থায় নারী ঘর থেকে বেরিয়ে নিজ রুজী রোজগারের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়। অগত্যা তাকে ঘরের চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ থাকার বিধান ভেঙ্গে স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি দিতে হয়।

ইসলাম এ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছে আজ আমরা তা ইউরোপের মনীষীদের কণ্ঠেই শুনতে পাচ্ছি। ইসলাম বলছে, এরূপ অসহায় ও অরক্ষিতা নারীর ভরণ পোষণের ব্যবস্থা "বায়তুল মাল" থেকে করা হবে। বায়তুল মাল হচ্ছে মুসলমানদের তথা জনসাধারণের অর্থ ভাণ্ডার। তা সরকারের দায়িত্বে দুঃস্থ ও অসহায়দের স্বার্থে মুক্ত হস্তে ব্যয়িত হবার জন্য প্রস্তুত থাকে। তাই ইসলামে অসংখ্য দুঃস্থ বিধবার সহায়তা সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপরে অপরিহার্য করে দিয়েছে, যেন পেটের দায়ে তাকে ঘর ছেড়ে বাইরের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করতে গিয়ে সীমাহীন দুর্যোগ পোহাতে না হয়।

ইউরোপের মনীষীরা বেশ কিছুদিন থেকে ইসলামের এ বিধানকেই বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে লেগে গেছেন এবং আন্দোলন তুলেছেন যে, সেরূপ অসহায় ও অরক্ষিতা বিধবা নারীদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা সরকারী তহবিল থেকেই করা হোক। অগাষ্ট কোঁতে তাঁর "আন্‌নিযামুস্ সিয়াসি" গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"স্বামী কিংবা কোন নিকট আত্মীয়ের অবর্তমানে নারীর প্রতি সমাজের অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে কোষাগার থেকে তার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা। তা হলে পেটের দায়ে তাদের ঘর ছেড়ে বাইরের কাজে লিপ্ত হতে হবে না। কারণ, যথাসম্ভব নারীর জীবন ঘরের চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। আমাদের প্রচেষ্টা এটাই হওয়া উচিত যে, নারীকে যেন বাইরের কঠোর জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে নেমে হাজার দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে না হয় এবং খোদা তাদের যে ছায়া ঘেরা গণ্ডীতে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য না হয়।"

আমি স্বীকার করি যে, নিছক দাসীবৃত্তি চালানোর জন্যে খোদা নারীদের সৃষ্টি করেননি। খোদাই তাদের বিশেষ ধরনের আযাদী দান করেছেন, যা আদায়ের জন্য তাদের পুরুষদের সাথে সংগ্রাম চালানো প্রয়োজন। কিন্তু তা সেই হাতিয়ার দিয়ে নয়, যা তাদের বন্ধুরূপী শত্রুরা দূর থেকে সরবরাহ করছে এবং যা সংস্কৃতি ও জীবিকার কঠোর সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদের অনস্বীকার্য পরাজয় এনে দেবে। পক্ষান্তরে তাদের সে সংগ্রাম চালাতে হবে সেই খোদাদত্ত হাতিয়ারের সাহায্যে যা পুরুষদের ভেতরে সম্পূর্ণ দুর্লভ। তাই কখনই তারা নারীদের জয় লাভে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

আপনারা কি জানেন, নারীদের সে মারাত্মক ও শক্তিশালী হাতিয়ার কি? হ্যাঁ-আপনারা সে সম্পর্কে অবশ্যই একটা ধারণা নিতে পেরেছেন। (কারণ, গত অধ্যায়ে আপনারা পরিষ্কার দেখে এসেছেন যে, নারীদের সেই বিশেষ রণাঙ্গনে পুরুষদের আদৌ জয় লাভের আশা নেই। পুরুষ সেখানে বড়ই অসহায়, নিতান্তই দুর্বল। একমাত্র নারী সেখানে রাণী, সর্বময় কর্ত্রী। সে ক্ষেত্র হচ্ছে তার প্রকৃতিগত একচ্ছত্র দায়িত্বের ক্ষেত্র।) নারী যদি সত্যিকারের তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সর্বতোভাবে সজাগ থাকে এবং সেই ক্ষেত্রের মারাত্মক হাতিয়ার যদি পুরুষের ওপরে প্রয়োগ করে, তা হলে বাদশাহ্‌র ওপর বাদশাই কায়েম করে বসতে পারে অনায়াসে এবং যুগ যুগান্তর ধরে মানব জাতির স্মৃতিপটে অমর সম্রাজ্ঞী হয়ে জেঁকে বসতে পারে। তখন গোটা দেশের ঘুঁটি যেদিকে ইচ্ছা চাল দেবার ক্ষমতা তার মুঠোয় এসে যায়। তার সামান্যতম ইঙ্গিতে একনায়কত্বের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন গণতান্ত্রিক শাসন

ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে। তার একটি বারের অঙ্গুলি হেলনে সমাজবাদী ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা স্বৈরাচারী একনায়কত্বের শাসনরূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

এ সব বিস্ময়কর সাফল্য সেই হাতিয়ার দিয়ে কিভাবে তারা অর্জন করবে? এভাবে অর্জিত হবে যে, নারী তার ইচ্ছামত ছেলেকে গড়ে তুলবে এবং শিশুর কোমল অন্তরে তার আদর্শ খোদাই করবে। এ শিশুই বড় হয়ে মায়ের শেখানো আদর্শ অনুসারে স্বীয় জীবনের মূলনীতি গড়ে তুলবে এবং বড় বড় দেশের শাসন ব্যবস্থায় বিরাট বিপ্লব আনবে। মানুষের পয়লা শিক্ষাগার হল স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়। সে শিক্ষালয়ে যা শিখে আসে, ভাবী জীবনে মানুষ তাকেই জীবনের মূলনীতিরূপে গ্রহণ করবে।

এই হচ্ছে নারীর সেই মারাত্মক হাতিয়ার যা দিয়ে সে গোটা পুরুষ জাতিকে অতি সহজেই ঘায়েল করতে পারে। সেই নারীর চরম দুর্ভাগ্য, যে স্বীয় স্বাভাবিক দায়িত্ব অবহেলার দ্বারা এরূপ অমোঘ অস্ত্র হাতছাড়া করে চরম বিড়ম্বনার জীবন বেছে নেয়।

নারীরা কি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জগতে পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সমকক্ষতা অর্জন করতে চায়? তারা কি তাদের জীবন পদ্ধতির স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করতে ভয় পাচ্ছে? যদি তাই সত্য হয় তা হলে বুঝতে হবে যে, সেদিন বড়ই সন্নিকটে, যখন তাদের সেই কেন্দ্রস্থল থেকে বিতাড়িত করা হবে, যেখানে তারা গোটা মানব জাতির ভাগ্যের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে সারা বিশ্বের কল্যাণ ও স্বাধীনতার উৎস হয়ে থাকত।

এ খোদাদত্ত হাতিয়ার তারা তখনই হাত করতে পারে, যখন তারা মা হবার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করতে সমর্থ হয়। যখন নারী স্বীয় দায়িত্বে গভীরভাবে মনোনিবেশ করতঃ সেই রহস্য আবিষ্কার করতে পারে, যা দিয়ে কাপুরুষকে বীরপুরুষ, কৃপণকে দাতা; স্বেচ্ছাচার শাসককে গণতন্ত্র ভক্ত এবং সমাজবাদী শাসনের ভক্তকে একনায়কত্বের ধ্বজাধারীরূপে প্রতিপন্ন করতে পারে।

প্রকৃতির বিধান, জ্ঞান ও বিবেকের যুক্তি প্রমাণ এবং ইউরোপের মনীষীদের সম্মিলিত অভিমত চ্যালেঞ্জ দিয়ে দাবী করছে যে, নারী যতই সাধনা চালাক, এমন কি সপ্ত আকাশের তারকা পেড়ে নিয়ে আসুক, কিন্তু দৈহিক ও জ্ঞান শক্তিতে কোনদিন তারা পুরুষের সমকক্ষতা করতে পারবে না।

ভ্রান্তি এবং চরম ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই হবে না যদি মনে করা হয় যে, চিরদিন তারা পরাধীন জীবন যাপনে বাধ্য থাকবে এবং পুরুষরা তাদের সে প্রকৃতিগত দুর্বলতার সুযোগ কুড়িয়ে বেড়াবে। আসল নারীদের সৃষ্টিই করা হয়েছে দুনিয়ার বুকে মানবজাতির সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের ব্রত সম্পাদনের জন্যে। এ দায়িত্ব সম্পাদনের প্রয়োজনে তাদের বাইরের সমস্যাবহুল জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে উঁচু করে রাখার দরকার হয় না। সে কাজের জন্যে বিশেষ করে পুরুষদেরই সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই তারা সাধ্যমতে সে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। নারীকে সে সব গুণ ও শক্তিই দান করা হয়েছে যা তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে। পুরুষকে আবার দৈহিক ও জ্ঞান শক্তি এ জন্যে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কঠোর ও জটিল কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তা অপরিহার্য। এ ভাবে দেখতে গেলে উভয় শ্রেণীর ভেতরে মূলত সমতাই বিধান করা হয়েছে। উভয় শ্রেণী সমানভাবে ভাগ করে সৃষ্টির বিধানকে সক্রিয় ও সাফল্যমণ্ডিত করে চলেছে। তবে, নারীর প্রকৃতিগত শক্তি ও গুণাবলীর বিকাশ যেহেতু পুরুষের আওতায় এসেই সম্ভব হতে পারে, তাই তাদেরই কল্যাণ চেয়ে পুরুষকে এই প্রাধান্যটুকু দেয়া হয়েছে। ইসলামের বিধানপঞ্জী কোরআনে এ কথাটাই এরূপে বলা হয়েছেঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ .

অর্থাৎ-পুরুষ স্বভাবতই নারীর চালক।

তাই নারী যদি পুরুষের এই স্বাভাবিক আনুগত্য আপাতত অস্বীকারও করে, তা'হলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হতে হয় তা স্বীকার করতে। বাইরের জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে সব জটিল ও কঠোর কাজ রয়েছে, কোমলমতি নারী তাতে কখনও পুরুষের সাথে এঁটে উঠবে না। এই বিপদ সংকুল সংগ্রাম ক্ষেত্রে জয়ী হতে হলে পয়লা শর্তই হচ্ছে দৈহিক শক্তি, দুঃসহ কষ্ট স্বীকার, অবিশ্রান্ত সাধনা ও মারাত্মক বিপদ আপদের সম্মুখীন হবার শক্তি ও সাহস। বলাবাহুল্য নারীর ভাণ্ডারে এসব শর্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দুনিয়ার আদিকালের ইতিহাস খুলে দেখুন। ঐতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটা কাল পাবেন না যেকালে নারীরা পুরুষের অধীন ও অনুগত রয়নি। জগতের বুকে চিরকাল পুরুষের আধিপত্য চলে আসছে। কোন যুগের নারীরা সে যুগের পুরুষের অধীন ও অনুগত করতে পারেনি। খোদা নারীদের অদৃষ্টে যে

আনুগত্যেরই বিধান লিখে রেখেছেন, এ হচ্ছে তারই স্বাভাবিক প্রমাণ। কারণ, খোদার কথা ও কাজে কখনও পার্থক্য দেখা যায় না। বিশ্ব প্রকৃতির একক ও অপরিবর্তনীয় বিধান তাঁরই কথার ভিত্তিতে চলছে। ঘটনা পরম্পরা প্রকৃতির ভাষা হয়ে খোদার সে কথা বা উদ্দেশ্য বলে দিচ্ছে। তাই প্রকৃতির সে বাক্যের বৈপরীত্য ঘটাবার সাধ্যি কার রয়েছে?

হ্যাঁ-কল্পনা প্রসূত দর্শন চায়, প্রকৃতির বিধান বদলে যাক। দুর্বল সবলের উপর আধিপত্য বিস্তার করুক। প্রজা রাজা হবার স্বপ্নে সফল হোক। কিন্তু, প্রকৃতির সে অটল বিধান মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বাইরে বাঙ্‌ময় হয়ে বলে দিচ্ছে, মনগড়া দর্শন হাজার চেষ্টা চালাক, ব্যর্থতার ছাপ তার অদৃষ্ট থেকে মুছাতে পারবে না কিছুতেই। তাদের সব প্রয়াস প্রকৃতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হয়েছে, চিরকালই হবে।

মনগড়া দর্শন কি দুর্বল জাতিকে শক্তিশালী জাতিগুলোর খপ্পর থেকে বাঁচাবার প্রচেষ্টা চালায়নি? তারা কি শক্তিশালী লোকদের উপদেশ দেয়নি যে, দুর্বল ভাইদের প্রতি কেন তারা সব দিক দিয়ে সমান ব্যবহার করছে না? তারা কি শক্তির উপাসকদের এ আহ্বান জানাতে কসুর করেছে যে, দুর্বলদের সাথে সমান পর্যায়ে নেমে এসে তারা তাদের বড়াই ও মর্যাদা চিরতরে বিদায় দিক?

কিন্তু, এসব প্রচেষ্টার ফল কি দাঁড়িয়েছে? ইতিহাস দর্শন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সৃষ্টিজগতের যে রহস্যজনক খোদায়ী বিধান মানবজাতির ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে, তা নিমেষের জন্যেও বদলে যায়নি। প্রকৃতির বিধান পূর্ণ শক্তি নিয়ে দুনিয়ার বুকে অধিষ্ঠিত রয়েছে। ভাববিলাসী দার্শনিক তাঁর কল্পনাপ্রসূত দর্শন নিয়ে চরম হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে গোরস্তানে আশ্রয় নিয়েছেন।

তোমরা কয়েকটা দুর্বল মানুষ বৈ নও। তবুও খোদার প্রকৃতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার দুঃসাহস করছ। সেক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতার তো একটা আন্দাজ থাকা চাই? প্রকৃতি কি তোমাদের ইচ্ছাধীন? বিশ্ব প্রকৃতি কি তোমাদের ইঙ্গিতে একচুল পরিমাণও নড়ে? পরিষ্কার জবাব দাও, তোমরা প্রকৃতির বিস্ময়কর রহস্যগুলোর কতটুকু বুঝতে পেরেছ? প্রকৃতির বিধান কি খোদা তোমাদের দু'চার জনের খেয়াল খুশীর ভিত্তিতে চালাবেন, না গোটা সৃষ্টির কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা নিয়ন্ত্রিত করবেন? সৃষ্টিজগত যে ধারায় চলে আসছে, চিরকালই সে ধারা বেয়ে চলবে। যদি তোমার তা ভাল না লেগে থাকে, তা হলে নিজের চিকিৎসা করাও, যেন প্রকৃতির বিধানের সাথে নিজ

প্রকৃতির খাপ খাওয়াতে পার। কারণ, প্রকৃতিতে অরুচি বিকৃত প্রকৃতিরই পরিচায়ক।

বিশ্ব প্রকৃতির রহস্যাভিজ্ঞ সর্বজনমান্য মনীষী অগাষ্ট কোঁতে "জড়দর্শনের ভিত্তিতে পৌরনীতি" নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"নারী স্বাধীনতার অবাস্তব স্বপ্নের ভ্রান্তি ভেঙ্গে দেবার জন্যে শ্রম স্বীকারের প্রাক্কালে প্রকৃতির নিয়মের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্যে আমাদের এ ব্যাপারটি বুঝা অপরিহার্য যে, যদি কোন যুগে গায়ে পড়া নারী দরদীদের আজগুবী সব দাবী দাওয়া সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত হয়, তা হলে নারীদের শুধু চারিত্রিক অধঃপতনই দেখা দিবে না। পরন্তু, সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খোদার প্রকৃতি নারীর ওপরে যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাও বরবাদ হবে। কারণ, তখন নারীরাও দৈনন্দিন কঠোর ব্রত ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবে বলে স্বদায়িত্বের ক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত ও অক্ষম প্রমাণিত হবে। ফলে, জীবন ব্যবস্থার একটা বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ দিকের কাজই অচল হয়ে দাঁড়াবে। সুখময় জীবন ধারায় বিপদ ও দুঃখ-দুর্দশার বন্যা নেমে আসবে। সুখের সংসারে চরম তিক্ততা নেমে আসবে। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক প্রেমপ্রীতির সম্পর্কের উৎস ঘোলাটে ও দূষিত হয়ে যাবে। ঘাত-প্রতিঘাতের এই সৃষ্টিজগতে আজ নর ও নারী মিলে যে মধুর জীবন ব্যবস্থার পত্তন করেছে, তা চিরতরে উধাও হয়ে যাবে।"

আমাদের আগেও পৃথিবীতে এক এক যুগে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক চিন্তা কোন কোন জাতির ভেতর দেখা দিয়েছিল। তারা প্রকৃতির বিধান থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে খোদার সৃষ্ট নিয়মের সীমালংঘন করতে চেয়েছিল পরিণামে তাদের ভেতরে এরূপ দুঃসময় ও ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, যা তাদের দিনে দিনে ধ্বংসের চরম সীমায় নিয়ে পৌছাল এবং আজ তাদের নাম নিশানা পর্যন্ত আমরা জানতে পাচ্ছি না। ইতিহাস দর্শন এ ধরনের এতসব জাতির বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে, যার প্রভাবে আজকের এই আকাশ কুসুম কল্পনার দর্শন আমাদের অন্তরে মোটেই দাগ কাটে না। মনীষী দাওফারীনী এন্‌সাইক্লোপেডিয়ায় লিখেছেন ঃ

"আমাদের যুগে নারীর ভাগ্য বিবর্তনের যে আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে আর কিছু না হোক এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবশেষে সবার বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্ম নেবে। পৃথিবীর সকল প্রান্তে দীর্ঘদিন ধরে মানব জাতি এমন এক জীবন ধারা চালিয়ে আসছিল, যা আজকের সামাজিক অবস্থা থেকে শোচনীয় ও

অবমাননাকর। তা স্মরণ করে আজও নারীদের দরদে অশ্রু ঝরানো হচ্ছে। কিন্তু, মধ্যযুগ থেকে ধীরে ধীরে উন্নত জাতিগুলো সে অবস্থা কাটিয়ে উঠল। ক্রমে ক্রমে তাদের সামাজিক জীবন অতীতের সেই অবমাননাকর অবস্থা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে চলল। কারণ, সামাজিক সেই চরম দুর্গতি দেখা দিয়েছিল তৎকালীন অজ্ঞতা ও মূর্খতা থেকে। সে কারণ ছিল নেহাৎ বাহ্যিক অব্যবস্থা। সে যুগের এ দুর্গতির মূল ছিল এই যে, চালক ও চালিত তখন দৈহিক পার্থক্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হত না। অর্থাৎ তখন চালিত নির্বাচনে নর ও নারীর ভেতরে কোনই পার্থক্য বিবেচনা করা হত না।"

এর পরে উক্ত মনীষী নর ও নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"কিন্তু পুরুষের সামনে নারীর আনুগত্য অন্যসব ব্যাপারের মত কোন সীমারেখায় বাঁধা পড়ে না। তা ধীরে ধীরে সর্বসাধারণের চারিত্রিক উন্নয়নের সাথে তাল রেখে চলে। কারণ, তার সম্পর্ক রয়েছে সোজাসুজি নারীর সেই প্রকৃতিগত দুর্বলতার সাথে যার প্রতিকার চলে না-যা সবার নাগালের বাইরে। নারীর সেই স্বাভাবিক দুর্বলতা বায়োলজীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত সিদ্ধান্ত ও দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে। তা আজ সর্ববাদী সম্মত সত্যে পরিণত হয়েছে। তাকে অস্বীকার করার মানে জ্ঞান ও সত্যকেই অস্বীকার করা। বায়োলজী, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও দেহ বিজ্ঞান অতি স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, পশুর ভেতরে ব্যাপকভাবে ও মানুষের ভেতরে বিশেষভাবে স্ত্রী জাতির দেহের গঠন বাচ্চাদের শারীরিক গঠনের সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং এই কারণেই নারীর দৈহিক যোগ্যতা পুরুষের চাইতে কম হতে বাধ্য।

আজ গুটিকতক দুর্বল মানুষ আর নভোমণ্ডলের স্রষ্টা ও নিয়ন্তার ভেতরে এ একটা লড়াই শুরু হয়েছে। দুর্বল মানুষ ক'টি বিশ্ব নিয়ন্তার বিধানের পরোয়া করতে চাচ্ছে না, তাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখছে এবং তার বিরোধিতা করতে উদ্যোগী হয়েছে। এত কিছু সত্ত্বেও খোদার অপরিবর্তনীয় ও অটল বিধান গোটা সৃষ্টিকে ঘিরে রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা তার বিধানে অবিচল থেকে তারই সৃষ্ট এই দুর্বল মানুষ কয়টির বিরোধিতার দুঃসাহস দেখে সেই প্রবীণের হাসি হাসছেন, যিনি দুধের বাচ্চাদের সূর্যালোকের বিরুদ্ধে আস্ফালন করতে দেখে হাসেন। এই দুর্বল সৃষ্টিরা নারীর প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে বাইরের প্রয়াস দ্বারা দূর করতে চায়। তারা এতই বোকা যে, প্রকৃতি যে চির অপরিবর্তনীয়-এ সত্যটুকুরও খবর রাখে না। তাই তারা প্রকৃতিগত আকাশ

পাতাল ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও নারীকে নরের সমকক্ষ করে তুলতে চাচ্ছে। পক্ষান্তরে খোদা তাঁর অটল বিধানে সুদৃঢ় রয়েছেন। তা হচ্ছেঃ

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ .

(পুরুষ স্বভাবতই নারীর অধিপতি।)

তিনি তাঁর বিধানের পরিপন্থী দুর্বল মানুষ কয়টিকে তাদের আশার শেষ হাতিয়ার পর্যন্ত ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে চলেছেন।

নিখিল সৃষ্টির বিরাট অস্তিত্ব থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অস্তিত্ব পর্যন্ত এমন কিছু রয়েছে কি, যা এ দাবী করতে সাহসী হবে যে দুর্বল সৃষ্টিরা কোন দিন স্রষ্টার বিরুদ্ধে লড়ে সাফল্য লাভ করবে? কেউ কি এরূপ রয়েছে যে, নিমেষের জন্যেও বিশ্বাস করবে, তারা সৃষ্টির অমোঘ বিধানের ভিত্তি নেড়ে দিতে সমর্থ হবে? দুনিয়ার বুকে এমন কে রয়েছে যে, এরূপ অমূলক চিন্তার প্রশ্রয় দিবে ও আজগুবী ধারণা পোষণ করে নিজকে মাতাল বলে পরিচয় দিবে? কারণ, সে স্রষ্টার পরিষ্কার ঘোষণা দেখতে পাচ্ছেঃ

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ .

(খোদায়ী প্রকৃতির ওপরে মানুষকে গড়া হয়েছে। খোদার সৃষ্টিতে রদবদল নেই।)

ম্যাডাম 'হীরকুর' এর সাধনা সম্পর্কে শিক্ষিত সম্প্রদায় ভালভাবেই ওয়াকিবহাল রয়েছেন। তিনি নারীদের অধিকার সংরক্ষণের মহা প্রাচীর দাঁড় করিয়ে পুরুষদের হুমকি দিয়েছিলেনঃ অচিরেই তার সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয়ে নারীদের জয়ের মাল্য নিয়ে আসবে। কিন্তু, যখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত সমাজবাদী দার্শনিক মনীষী প্রুধোঁর সাথে লেখালেখি করে নারী অধিকার প্রশ্নে তার মতামত জানতে চাইলেন, তখন তিনি এক বিস্তারিত জবাবে তাঁর নর-নারীর সাম্য দাবির সকল যুক্তির মূলোচ্ছেদ করলেন। মনীষী প্রুধোঁ কি জবাব দিলেন তা মন দিয়ে শুনুনঃ

'আমার মতে নারীদের এ স্বাধীনতা আন্দোলন নগ্ন উন্মত্ততা ছাড়া কিছুই নয়। দুঃখের বিষয়, তারা আজ এরূপ মত্ততায় মেতে চলছে। তাদের এ অপরাধ পরিষ্কার প্রমাণ করেছে যে, তারা নিজেদের মূল্য বুঝবার ও দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা হারিয়ে বসেছে।'

এরপরে তিনি সৃষ্টিজগতের চিরাচরিত বিধান সামনে রেখে জ্ঞানগর্ভে যুক্তির সাহায্যে স্বীয় অভিমতের সমর্থনে লিখেছেনঃ

'নর ও নারীর ভেতরে শ্রেণীগত যে ভেদরেখা পাওয়া যায়, তা মানবতাকে সমান ভাগে ভাগ করে রাখেনি; বরং পারস্পরিক সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও একে অপর থেকে এরূপভাবে ভিন্ন হয়ে আছে যে, শক্তি ও দৌর্বল্যের পার্থক্যটা তাতে পরিষ্কার চোখে ধরা পড়ে। পশু ও মানব উভয়ের ভেতরেই তা সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই এ প্রকৃতগত অমিলের কারণেই নারীর পুরুষের সাথে সমান পাল্লায় থাকা অসম্ভব ও অবাস্তব বৈ নয়। তাই দেখতে পাচ্ছ যে, নারীর অস্তিত্ব পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারাই স্থিরতা লাভ করে। তাদের সে ক্ষমতা নেই যে, স্বাধীনভাবে স্বীয় অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবে। নারীকে যদি আমরা কোন দেশের অধিবাসী বলে মনে করি তা এ হিসেবেই যে, সে সেই দেশের এক পুরুষের স্ত্রী। যেমন আমরা কোন গণতান্ত্রিক দেশে দেখি, যিনি প্রেসিডেন্ট হন, তাঁর পত্নীকে নামে কামে না জানলেও বেগম অমুক বলে জানি এবং সে যে গণতান্ত্রিক মতের অনুসারী তাও বুঝি। অবশ্য এ সব কথার অর্থ এ নয় যে, তারা দুনিয়ায় কোন কাজেই আসবে না এবং সৃষ্টিজগতে তাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। কারণ, খোদা তাদের দায়িত্বে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার কাজ ন্যস্ত করে রেখেছেন-যা পুরুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের টানাহেঁচড়ার কাজ থেকে অনেক দায়িত্বপূর্ণ। আমার তা বলার উদ্দেশ্য এই যে, নারী হয়ত তাদের স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ভুলে পুরুষের সাথে গিয়ে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কোন্দলে যোগ দিবে, তাই স্রষ্টা তাদের সেই দৈহিক ও জ্ঞানের যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত রেখে নিখিল সৃষ্টির কল্যাণের পথই মুক্ত রেখেছেন।'

এরপরে সমাজবাদী দার্শনিক তাঁর সব মতামতের সারকথা নিচের লাইন ক'টিতেই ব্যক্ত করে এ 'বহাস' শেষ করেছেন। বস্তুত, তার এ লাইন ক'টিতে যার চেতনার উদ্রেক না হয়, চরম উন্মাদনা ও মত্ততায় ডুবে থাকার দৃষ্টান্ত তার ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেনঃ

'মোদ্দা কথা, আমি আমার সর্বশক্তি নিয়ে এ কথা ঘোষণা করতে প্রস্তুত যে, অভিজ্ঞতা, সাক্ষ্য ও দলিল প্রমাণ সব কিছু দিয়ে আমি প্রমাণ করব, নারী যেরূপ শক্তির দিক থেকে পুরুষের চাইতে দুর্বল, তেমনি কর্মবহুল শিল্প-বাণিজ্যের জগতে, চারিত্রিক ক্ষেত্রে কিংবা দর্শনের জগতেও তারা পুরুষদের থেকে অনেক পেছনে পড়ে আছে। স্রষ্টারও উদ্দেশ্য তাই। তারা চিরকাল পুরুষের পেছনে থাকুক এটাই তিনি চান। তাই, আজ যদি তোমাদের দাবি অনুসারে নারীরা সব অধিকার হাসিল করে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে যায়, তাহলে বন্ধুরা আমার, খুব ভালভাবে জেনে

রেখ, তাদের বাড়াবাড়ি সীমা ছাড়িয়ে চলল। পরিণামে পূর্ণ দাসীবৃত্তিই তাদের ভাগ্যে ফিরে আসবে।'

আক্ষেপ, শত আক্ষেপ! এ ভাবের অকাট্য ও জ্ঞানগর্ভ ঘোষণা শুনেও কি তোমাদের নারী দরদের মোহ ভাঙ্গবে না? মনীষী প্রুধোঁর মত প্রকৃতি বিশারদের লেখা কি এ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয় যে, প্রকৃতি ও সঠিক জ্ঞান তোমাদের স্বকপোলকল্পিত নীতির পূর্ণ বিরোধী? 'ইবৃতেকারুন নিযাম'-এর বিজ্ঞ প্রণেতা কি পরিষ্কার ঘোষণা করছেন না যে, নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের প্রয়াস স্রষ্টার বিধান পাল্টে দেবার প্রয়াসেরই নামান্তর মাত্র? কে এ সত্য অস্বীকার করতে পারবে? কে এমন রয়েছে, পূর্বকে পশ্চিম ও উত্তরকে দক্ষিণ বলার মত মূর্খতা দেখাতে পারে? হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে নারী স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের দাবি স্রষ্টার বিধানের মর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ। তোমরা প্রকৃতির নিয়ম লংঘন করতে চাচ্ছ? দুঃখের বিষয়, তোমরা ভুলে যাচ্ছ, কেই বা তোমরা এবং তোমাদের অস্তিত্বই বা কতটুকু?

হ্যাঁ-আমার জানা রয়েছে, তোমরা কে এবং তোমাদের অস্তিত্ব কতটুকু! তোমরা সেই দুর্বল ও লাঞ্ছিত মানবদল যারা খোদাদ্রোহী ও অহংকারী। অপূর্ণ শিক্ষার ভ্রান্তি যাদের মাতাল করে তুলেছে, কল্পনাপ্রসূত দর্শনের নেশা যাদের অচেতন রেখেছে। তোমরা ভাবছ, স্রষ্টার এ বিশাল প্রকৃতির সহস্র রহস্যের সমুদ্দুর তোমরা পার হয়ে এসেছ; অথচ তোমরা এখন পর্যন্ত তার কিনারায়ও পৌঁছতে পারনি। তোমরা বুঝেছ, বস্তুজগতের সব তত্ত্ব তোমরা কণায় কণায় আবিষ্কার করে ফেলেছ; অথচ তোমরা তার একট ঝলকও দেখতে পাওনি।

'নিউটন' অসীম জ্ঞান সমুদ্রের তীরে নিজেকে একজন খেলারত শিশু মনে করেছেন; অথচ তোমাদের দাম্ভিক মন বুঝে ফেলেছে যে, দরিয়ার তোমরা অতল তলে পৌঁছে গেছ। 'বেকন' বস্তুজগতের সারতত্ত্ব খুঁজতে গিয়ে সেখানে নিজকে সামান্য একটা কংকররূপে ভেবেছেন; অথচ অহংকার ও অহমিকা তোমাদের ভেতরে প্রতীতি জন্মিয়েছে যে, তোমাদের চোখে সে সব তত্ত্বের প্রতিটি অণু ধরা পড়েছে। তোমরা নিজেদের অসহায় ও দুর্বল অস্তিত্বের বিষয় ভুলে আছ। অহংকার ও অহমিকার ধোঁকা তোমাদের এক বিপজ্জনক পথে ঠেলে নিচ্ছে।

হায়! তোমরা কি পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের স্রষ্টার শাশ্বত বিধানের সাথে টক্কর দিতে চাচ্ছ? অথচ, তোমাদের অস্তিত্ব দুর্বলতম। তোমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তোমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। বেকনের ভাষায় তোমরা তো নিখিল সৃষ্টির অজস্র বিচিত্র

রহস্যের তুলনায় প্রদীপ্ত ভাস্করের সামান্য আলোকে উদ্ভাসিত একটা নিকৃষ্ট বস্তুকণা বৈ নও; সেই কণাটি যেন স্বীয় আলো দেখে অহংকারে দিগ্বিদিক হারিয়ে সৃষ্টির সাথে পাল্লা দেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে।

জ্ঞান হচ্ছে অখণ্ড বিশাল আকাশ-যাতে অজস্র তারকা বিক্ষিপ্তভাবে দ্যুতিমান। তোমরা তো লাখো মাইল দূর থেকে তার একটা ক্ষুদ্র তারকার কক্ষচ্যুতির সামান্য একটু ঝলক দেখতে পেয়েছ মাত্র। তাতেই তোমরা এতখানি অহংকারী সেজেছ যেন গোটা জ্ঞানের আকাশ তন্ন তন্ন করে তার প্রতিটি কণা দেখে ফেলেছ, সবকিছুই জেনে ফেলেছ। এমনও অসংখ্য তারকা রয়েছে যা দেখার সাধ্য তোমাদের চোখের নেই এবং সে সবের বিরাট অস্তিত্ব ধারণা করবার ক্ষমতাও তোমাদের মগজের নেই। জ্ঞান! শ্লোগান তুলে অজ্ঞানের মত শুধু তোমরা জ্ঞান সাধনা ও সভ্যতার পক্ষে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে চলেছ। বলতো, তোমরা জ্ঞান বলতে কি বুঝ? সেটা কোন্ জ্ঞান যা তোমাদের খোদাদ্রোহী ও অহংকারী সাজাল? আর সেটাই বা কোন্ প্রজ্ঞা যার অশুভ প্রেরণা তোমাদের স্রষ্টার সাথে লড়বার সাহস জোগাল?

আমি জানি যে, তোমরা তাপমণ্ডলের কিছুটা তত্ত্ব জেনে ফেলেছ। আমি এও জানি যে, তোমরা হঠাৎ করে মাধ্যাকর্ষণের কিছুটা রহস্য উদঘাটিত করে বসেছ। জ্ঞানের এতটুকু পরিচয়ই কি তোমাদের ভেতরে স্রষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত অহংকার এনে দিয়েছে? এ কি সেই ধরনের গবেষণা, যার ওপরে নির্ভর করে তোমরা সৃষ্টিজগতের রহস্যের সাথে নিজেদের রক্তের সম্পর্ক পেতে ফেলেছ?

যদি তাই সত্য হয়, তাহলে তোমাদের বুঝা উচিত যে, তোমাদের জ্ঞান দেখে মূর্খতা বিদ্রুপ করছে, তোমাদের জানার দৌড় দেখে অজ্ঞতা অবজ্ঞার হাসি হাসছে। তোমরা একজন ঝানু অধ্যাপকের তুলনায় একটা পিপীলিকার জ্ঞানকে যা মনে কর, তোমাদের জ্ঞান সৃষ্টিজগতের অসীম রহস্যের তুলনায় তার চাইতেও নগণ্য। তোমাদের যে মেধাকে মানবীয় জ্ঞানের চূড়ান্ত স্তর ভেবে বসেছ, তাই তোমাদের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করবে। আর তোমাদের যে দেহটাকে গোটা মানব জাতির গৌরবের পরম রত্ন বলে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে চলছ তা মূলত আশ্‌রাফুল মখলুকাতের সীমাহীন লজ্জা ও অবমাননার প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে।

আহা! তোমরা যদি ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারতে যে, তোমরা কত দুর্বল ও নিকৃষ্ট! আহা! তোমরা যদি বুঝতে পারতে যে স্রষ্টার বিধানের চোখে কতবড় অপরাধী ও কঠোর আজাবের যোগ্য তোমরা! আহা! তোমরা যে খোদাদ্রোহী সাজলে! তোমরা কি

জান না বিদ্রোহীর শাস্তি সব চাইতে কঠিন ও মারাত্মক? হ্যাঁ! তোমরা যে খোদার সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানের সীমা লংঘন করতে চাচ্ছ, জান না কি একেই বলে বিদ্রোহ? তোমরা নিখিল সৃষ্টির অসীম রহস্য রত্নের ক্ষুদ্রতম এক রত্ন হাতে পেয়েই এতখানি অহংকারী সেজেছ যে, গোটা সৃষ্টি তোমাদের মুঠোয় এসে গেছে ভেবেছ! অথচ তোমাদের পাত্র তো তার একটা ঝলক সহ্য করার ক্ষমতাও রাখে না। তোমরা আদি শিক্ষাদাতা জাতিকে ভুলে গেছ, ভুলেছ মিসরের সেই প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস। তারা দুনিয়ার বুকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের একমাত্র ধ্বজাধারী জাতি ছিল। তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গোটা দুনিয়ার ভেতরে অগ্রগামী ছিল। বিরাট বিরাট গবেষণা ও অনুসন্ধান কেন্দ্র, বড় বড় দালান-কোঠা, বিস্ময়কর পিরামিড, দর্শন ও বিজ্ঞানের আদিতম নিকেতন, সবই তাদের ছিল। আজ তারা কোথায়? দুনিয়ার কোন গুহায় তারা চিরতরে গা ঢাকা দিল?

বিশ্ববিশ্রুত ইতিহাসকার হিরোডোটাসকে ডাক। সে এসে দুনিয়াটা একবার শীতমণ্ডল থেকে গ্রীষ্মমণ্ডল পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে পিরামিডের স্রষ্টাদের খুঁজে দেখুক। তারপর সে আমাদের বলে যাক, কেন সেই বিরাট শক্তিশালী মানুষগুলো দুনিয়ায় এসে এ যুগের সভ্য মানুষগুলোকে তাদের চেহারাটা দেখিয়ে যাচ্ছে না? 'আবুল হাওল' এর চোখ দুটো তাদের অপেক্ষায় স্থির থেকে পাথর হয়ে গেছে। হিরোডোটাসকে জিজ্ঞেস কর, 'আবুল মুত্তাকীন' ও 'আবুল হেকমত' আজ দুনিয়ার ওপরে বিরূপ হল কেন? আল্পস্ পাহাড়ের চূড়াগুলো দিন দিন গলা উঁচু করে কি তাদেরই খুঁজে ফিরছে? গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের শাহ্যাদী কি তাদেরই অপেক্ষায় দিন গুণে মঙ্গলগ্রহ ও 'মুশতারী'র সীমাহীন নিগ্রহ ভোগ করে চলছে?

অহো! হিরোডোটাসের পৃথিবী বিদায় নিয়েছে। তার খবর আজ নতুন পৃথিবী দিতে পারছে না। 'আবুল হাওল' অপেক্ষা করতে করতে লয় হয়ে যাবে ও গ্রীসের শাহ্যাদী আকাশের দেবতাদের সাথে মিলে একাকার হয়ে যাবে; তবুও সে সব জাতির আর পাত্তা মিলবে না। তারা এখন এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখান থেকে তাদের আর কোন সংবাদ পাওয়া যেতে পারে না এবং আমাদেরও কোন খবর তাদের কাছে পৌঁছতে পারে না।

কিন্তু হায়! তোমরা কি একবারও ভেবে দেখছ না যে, কেন সেই মহাজ্ঞানী মহাজনদল সৃষ্টিজগত থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন? তাঁরা অফুরন্ত জ্ঞান গবেষণার বিরাট ভাণ্ডার ছিলেন, মহান শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবর্তক ছিলেন। তবু তাঁরা এমন কি অপরাধ করলেন যার জন্য তাদের নাম নিশানা ধরণীর বুক থেকে চিরতরে লোপ করে দেয়া হল?

তোমরা তোমাদের ইতিহাসলব্ধ জ্ঞানের সাহায্য নাও। জ্যোতিষ্ক তত্ত্বের নিদর্শন ও ফলাফলগুলো গভীরভাবে তলিয়ে দেখ। 'কালদিয়ার' ইটগুলোর ওপরে খোদাই করা নকশাগুলো অধ্যয়ন করে দেখ। তোমরা জানতে পারবে, সে সব জাতি স্রষ্টার পবিত্র সংবিধান থেকে ঘাড় ফিরিয়েছিল। খোদার সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান লংঘন করেছিল। সেই পবিত্র বিধানকে দূরে নিক্ষেপ করে স্বীয় মনগড়া বিধান অনুসরণ করেছিল। বিদ্রোহী সেজেছিল তারা পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের স্রষ্টার বিরুদ্ধে। অবজ্ঞার চোখে দেখেছিল তাঁর প্রকৃতির শাশ্বত নীতি নিয়মকে। তার ফল এই দাঁড়াল, সে ব্যাধি গোটা মানবজাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বীজানুর মত ছড়িয়ে পড়ল এবং চরম অবনতি স্বাভাবিক পথ ধরে তাদের ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিল।

আকাশ তাদের মেঘাচ্ছন্ন হল। কালো মেঘের পাহাড় নীল আকাশের অসীম নীলিমা ঢেকে ফেলল। যে জাতি ধন সম্পদে ও শিক্ষা সভ্যতায় দুনিয়ার বুকে উন্নততম নির্দশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিস্ময়করভাবে তাদের পতন ও ধ্বংস নেমে এল। মুহূর্তের বিপর্যয়ে তাদের বিরাট সাম্রাজ্য ও বৃহত্তম প্রাসাদগুলো অপর জাতির পদানত হল।

'আহ্‌রাম'-এর গগনচুম্বী দেহ বিস্ফোরিত নয়নে তার স্রষ্টাদের খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে লাগল। আবুল হাওলের চক্ষুস্থির হল তাদের অপেক্ষায় চেয়ে চেয়ে। আল্পস্ পর্বতের চূড়াগুলো তাদের সন্ধানে গলা বাড়াতে গিয়ে হাজার মেঘের ঘর্ষণে নাজেহাল হয়ে চলল। অথচ সে হতভাগা দাম্ভিক সুসভ্য ও মহাজ্ঞানী মহাজনের জাত এরূপ চম্পট দিল যে, পৃথিবীর কোন অঞ্চল থেকেই আর তাদের জবাব পাওয়া গেল না। নিখিল সৃষ্টি তাদের হদীস দিতে অপারগ হয়ে ক্ষমা চাইল।

সে সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী জাতিগুলোর দশা দেখে তোমাদের চোখ খোলা উচিত। তাদের উন্নতির চরম পর্যায় পর্যবেক্ষণ করার পরে তাদের ধ্বংসের কারণগুলোও খতিয়ে দেখ। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তাদের মর্যাদার আসন সেদিন এর চাইতেও উন্নততর ছিল-যা আজ প্রাচ্যের অজ্ঞতার সুযোগে পাশ্চাত্যবাসী দখল করে রয়েছে। কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ন্তার অটল বিধানের সাথে টক্কর দিতে গিয়ে তারা চক্ষের পলকে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। তারা এমনিভাবেই লোপ পেল যে, দুনিয়ায় কোন দিন তারা এসেছিল কিনা তাও আজ বলা দুষ্কর।

অবশ্য তোমরা ফেরাউনের প্রাচীনতম রাজধানী ঘুরে দেখেছ। মিসরের পিরামিড বেশ গভীরভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছ। তোমরা শোন না কি যিসিসের রাজধানীর প্রতিটি অণু-পরমাণু আজ বাঙময় হয়ে কি বলে দিচ্ছে? তোমরা কি শুনতে পাও না যে, পিরামিডের চূড়াগুলো দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কেঁদে কেঁদে কি বলতে চাচ্ছে?

অহো! তারা যে তাদের স্রষ্টাদের করুণ কাহিনীই তোমাদের শোনাতে চাচ্ছে। আর সেই রাজধানী তার বাসিন্দাদের দূর অতীতের স্মৃতিগাঁথা তোমাদের মর্মগোচর করতে চাচ্ছে। সেগুলো তাদের দর্শকদের নীরবে এ উপদেশই দিচ্ছেঃ

'যে পবিত্র চরণের নিচে ঠাঁই নেবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে, তাদের ঐতিহ্যময় অতীতের নিদর্শন আজও আমার বুকে গভীরভাবে দাগ কেটে রেখেছে। আমার প্রতিটি অঙ্গ থেকে তোমরা তাদের সেই অমর কীর্তিকলাপের পরিচয় পাচ্ছ। কিন্তু, খোদাদ্রোহিতা, প্রকৃতির বিধানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তাদের সকল দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। তাদের ধ্বংস ও অবমাননার চরম স্তরে ঠেলে দিয়েছে। তাদের উন্নতি ও সৌভাগ্য অবনতি ও দুর্ভাগ্যের হাতে পর্যুদস্ত হয়েছে।

আজ মিসরের প্রাচীন পিরামিডে গিয়ে তাদের ভয়াবহ দৃশ্যগুলো চোখ ভরে দেখে যাও। তারা কত বিরাট বপু ও দৈত্যবৎ স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচেছিল। তাদের শক্তিশালী হাতগুলো কি বিরাট বিরাট প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল! কিন্তু, আজ সৃষ্টিজগতের এক কোণ থেকে অপর কোণ পর্যন্ত তাদের নাম নিশানা বাঁচিয়ে রাখবার মত কেউ আছে কি? এরূপ কেন হল? তার একমাত্র কারণ এই যে, অহংকার ও অহমিকা তাদের এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছিল যে, তারা প্রকৃতি ও তার স্রষ্টার সাথে পাল্লা দেবার দুঃসাহস করেছিল। খোদার শাশ্বত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানকে তাঁরা অবজ্ঞার চোখে দেখেছিল। হে আমার ভাবমুগ্ধ দর্শকবৃন্দ! তোমরাও কি সে পথ ধরে নিজেদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দিবে?'

এভাবে ফেরাউনের গগনচুম্বী প্রাসাদের মিনার তার দর্শকদের সম্বোধন করে বলছেঃ

'আমার স্রষ্টারা তোমাদের চাইতেও বেশ দৃঢ় ও শক্তিশালী ছিল। কিন্তু, তারা স্রষ্টার বিধানের সামনে অহংকার ও অহমিকার বলে মাথা ঝুঁকাতে অস্বীকার করেছিল। আহা! তাদের সেই বিরাট শক্তি নিমেষে ধূলিসাৎ হল। তারা চিরতরে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিল।'

যুগ যুগ ধরে মানুষ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তা দেখেছে আর ভেবে ভেবে হয়রান হয়েছে যে, এ বিরাট সৌধ চেয়েছিল তারা কোন্ উদ্দেশ্যে? রাউলান পিরামিডকে ফেরাউনের গোরস্তান ভেবেছে এবং মিসরবাসীদের এ বাহুল্য খরচকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এর আসল দিকটা থেকে সে কয়েক ক্রোশ দূরে রয়েছে। জ্ঞান ও উপদেশের দৃষ্টিতে সেগুলোকে অবলোকন কর। স্রষ্টাদের এ সব সৃষ্টির উদ্দেশ্য তারা নিজেরাই বলে দিচ্ছেঃ

'আমাদের এ সুসজ্জিত এলাকায় এগুলো এ জন্য দাঁড় করে রাখা হয়েছে যে, ভাবি জাতিগুলোর কাছে আমরা সাক্ষ্য দিয়ে চলব যত খোদাদ্রোহীদের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে। আমরা তাদের ধ্বংসাত্মক পরিণাম সবার সামনে যুগে যুগে উঁচু করে তুলে ধরব। মোবারকবাদ জানাচ্ছি তাদের, যারা আমাদের মর্মবাণী কান পেতে শুনছে এবং জ্ঞান ও উপদেশের দৃষ্টিতে আমাদের তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।'

গত পরিচ্ছেদে আপনারা নারীর স্বরূপ বেশ কিছুটা বুঝতে পেরেছেন হয়ত। আমাদের দেশে সাধারণত এ ধারণাই পোষণ করা হয় যে, ইউরোপের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পতাকাবাহীরা নারী ও পুরুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখে এবং তাদের সমান ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে। কিন্তু, আমার উদ্ধৃতি থেকে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, পাশ্চাত্যের মনীষীদের দোহাই পেড়ে প্রাচ্যে যতগুলো ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানো হচ্ছে, তার ভেতরে এটার মত এত ভিত্তিহীন ও মিথ্যা প্রচার আর কোন কিছু নিয়ে হয়নি।

প্রচার করা হচ্ছে, পুরুষ জাতির কঠোরতা ও যুলুমবাজীই নারীদের চার দেয়ালের ভেতরে আবদ্ধ রেখেছে। কিন্তু, আগের অধ্যায়ে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, পুরুষ নয়-সৃষ্টির বিধানই নারীদের দায়িত্ব ঘরের চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। আমি যে সব মনীষীর উদ্ধৃতি এ বইয়ে নিয়েছি, তাঁরা হচ্ছেন ইউরোপের অধুনাতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্মদাতা ও মনীষীকুলের শীর্ষস্থানীয়।

আপনারা অবশ্যই আমার বইয়ে উল্লিখিত জগদ্বরেণ্য মনীষীদের নাম ভুলে যাননি। মনীষী সোল সাইমান, সাধক ডোক্রশিয়া, অগাষ্ট কোঁতে প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিকরা আমার যাত্রাপথে আলো যুগিয়েছেন। সোল সাইমানের অকাট্য যুক্তি যেখানে কাসেম আমীন বেগের গলাবাজীকে সর্বতোভাবে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে, সে স্থানটি আপনারা যে ভুলে যাননি, সে বিশ্বাস আমার অবশ্যই রয়েছে। সোল সাইমান হচ্ছেন জ্ঞানের আকাশের সর্বজন পরিচিত সূর্য। বিজ্ঞান ও দর্শনের তিনি পারদর্শী

শিক্ষক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকপালদের আসরের সর্বমান্য সভাপতি। অগাষ্ট কোঁতের দেহবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের গবেষণামূলক যুক্তিগুলো নারী দরদীদের সব দাবি-দাওয়ার ওপরে কী ভাবে বরফ ঢেলে দিয়েছে, তা আপনাদের স্মৃতিপট থেকে যে মুছে যায়নি, তাও আমি জানি।

এ সব স্মরণীয় অভিমতগুলো কারুর পক্ষেই ভুলে যাওয়া সম্ভবপর নয়। হ্যাঁ, কিছুতেই তা সম্ভবপর নয়। কারণ, তারা হচ্ছেন ইউরোপীয় মনীষীদের শ্রেষ্ঠতম গুরু। তাঁদের কেউ হচ্ছেন মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা ও জন্মদাতা। তাই তাঁর নির্ভুল তথ্যের ঘায় বেচারা কাসেম আমীন বেগের যে মরণদশা দেখা দিয়েছে, তাও আপনারা দেখেছেন। ফলে, আমার ভেতরে যে প্রতিপক্ষের ওপরে জয়লাভের একটা নির্মল আনন্দের শিহরণ জাগছে, তাও আপনাদের স্মৃতিপটে অবশ্যই দাগ কেটেছে।

আমার শুধু আশাই নয়, প্রতীতিও জন্মেছে যে, সোল সাইমানের মত বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ব্যক্তির অভিমত আপনাদের অস্থির প্রাণে সান্ত্বনার ঝর্ণাধারা বয়ে দিয়েছে। মনীষী ডোক্রশিয়ার ভাষণ আপনাদের অন্তর থেকে যতসব অলীক সন্দেহের কালিমা চিরতরে মুছে দিয়েছে। সাথে সাথে নারী দরদীর ভিত্তিহীন চালবাজীর স্বরূপও আপনাদের সামনে উদঘাটিত হয়েছে। তাদের এখন আর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব ও মর্যাদা আপনাদের অন্তরে বেঁচে নেই।

এখন আমি জিজ্ঞেস করছি, কাসেম আমীন বেগের দীক্ষাগুরু মেতুন ভাযো ও ফ্রেশ লো জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ সব বিশ্ববিশ্রুত দিকপালদের সামনে মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়াতে পারে কি? তাদের পৃষ্ঠপোষকতা কি কাসেম আমীন বেগ ও তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের কোন কল্যাণে আসবে? কে আছে যে এখনও তাদের সমর্থনে উপরের প্রশ্নের 'হ্যাঁ' বাচক উত্তর দিয়ে নিজ নির্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে যাবে?

গোটা ইউরোপ সমবেত কণ্ঠে যাদের জ্ঞান ও মনীষার প্রশংসায় মুখর, যাদের সবাই আখ্যা দিয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যের রাজণ্যবর্গ বলে, তাঁদের সামনে কোথাকার কে এসে মাথা তুলে দাঁড়াবে কোন শক্তির বলে? আপনারা কি জানেন যে, মনীষী প্রুধোঁ ও স্যামুয়েল স্মাইলাস কোন্ স্তরের লেখক? শেষোক্ত মনীষীর পূর্ণ নাম আপনারা অবশ্যই আগে থেকে শুনে ধন্য হয়েছেন। কারণ, আপনারা শিক্ষিত লোক এবং এমন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে নেই যার আলমারীতে 'Duty' ও 'Self Help' নামের বই দুইখানা পাওয়া যাবে না। আর যদি কেউ প্রথমোক্ত ব্যক্তির জ্ঞান ও মনীষার পরিচয় পেতে চান, এনসাইক্লোপেডিয়া খুলে কয়েকটা পাতা নাড়া-চাড়া

করুন, তা হলেই দেখতে পাবেন, 'সোস্যালিজম'-এর সর্বজনস্বীকৃত জন্মদাতা ও স্বপ্নদাতা তিনিই। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইবতেকারুন নিযাম' হচ্ছে রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও অর্থনীতি তথা মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির জটিল বিধানের আদি উৎস।

হ্যাঁ- আমি জানি, ভাল করেই বুঝি যে, ইউরোপের এই মনীষীদের মতামত এতক্ষণে আপনাদের আমার ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে এবং আমার সঙ্গী করে দিয়েছে। আমার সাথে একমত হবেনই বা না কেন? যখন আপনারা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে দেখে এলেন যে, ইউরোপের বিখ্যাত মনীষীরা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্মদাতারা, এনসাইক্লোপেডিয়ার প্রণেতারা একযোগে আমার পূর্ণ সমর্থন যোগাচ্ছেন, আর আমি শুধু সবার শেষে সামান্য অথচ জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য করে যাচ্ছি, তখন আমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আপনারা সমর্থন জানাতে বাধ্য হচ্ছেন। স্মরণ করুন, খুব করে স্মরণ করুন, কিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যের রাজাধিরাজরা আমার প্রতিটি দাবি ও কথা উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করতে গিয়ে গোটা দুনিয়ার মানুষকে বলে দিচ্ছেন যে, ফরীদ বেজদীর মত খাঁটি সত্য কথা আর কেউ এ ক্ষেত্রে বলেনি।

পেছনের আলোচনা থেকে আপনারা পরিষ্কার জানতে পারছেন যে, প্রাচ্যের দেশগুলোতে নারী সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে আসছে, তাকে অন্যায় বলাই একাধারে অন্যায়, অবিচার ও মারাত্মক অপরাধ। প্রাচ্যজগত যদি নারীদের জ্ঞান ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপরিণত বলে আখ্যা দেয়, তাহলে এমন কি অপরাধ করে থাকে? ইউরোপের মনীষীদের একজন যখন নারীর জ্ঞানকে দুধের বাচ্চার জ্ঞানের সাথে তুলনা দিচ্ছে, দ্বিতীয়জন তাদের জ্ঞানকে আদিম স্তরের মানবের বুদ্ধির সাথে তুলনা দিচ্ছে, তৃতীয় মনীষী যখন তাদের জ্ঞানকে সবচাইতে দুর্বল বলে আখ্যা দিচ্ছে, তখন আপনারাই ভেবে দেখুন, ভাল করে বিবেচনা করে দেখুন, নারীদের দৈহিক ও জ্ঞান শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবতাদের এ সব মতামত থাকার পরেও প্রাচ্য দেশবাসী এমন কি বেশী বলেছে? তাই আপনারা এখন অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, নারী দরদীরা যে ধূয়া তুলছে, তাদেরই মান্য ও স্বীকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানে দেবতারা তা মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর জন্য বিশ্বসভ্যতার জন্যে, জীবন ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থার জন্যে, তাদের সে ধূয়াকে সবচাইতে ক্ষতিকর ও সহস্র সাংস্কৃতিক ব্যাধি সৃষ্টিকার বলে অভিমত পেশ করেছেন।

তবুও একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য ব্যাপার রয়ে গেছে। জ্ঞান ও মনীষার আহবান থেকে যা পাওয়া গেছে তা যদিও আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট, তবুও

আমাদের সংস্কার ও অহমিকা হয়ত অন্তরের সব সন্দেহ ও দাগ বিলোপ সাধনে বাধা দিচ্ছে। গত পরিচ্ছেদে বিভিন্ন স্থানে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা জোরের সাথে এ কথা ঘোষণা করেছেন যে, কাসেম আমীন বেগ এবং তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গরা যা বলছে তা প্রকৃতির বিধানের আগাগোড়া খেলাফ। এনসাইক্লোপেডিয়ার প্রণেতারা তাঁদের বক্তব্যে এ চিন্তাকেও ভুল প্রমাণিত করেছেন যে, দেহবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধান কার্য মেধাশক্তির দিক থেকে নর ও নারীকে সমান পর্যায়ের বলে প্রমাণিত করেছে। অগাষ্ট কোঁতে ও মনীষী প্রুধোঁ এ ব্যাপারে বিশেষ জোর দিয়েছেন যে, নারীর এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা স্রষ্টার বিধান ও প্রকৃতির নিয়ম কানুন লংঘন করে। তাই যখনই তা বাস্তবায়িত হবে, অমনি সভ্যতা ও জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি নড়ে উঠে জানিয়ে দেবে যে, নারীর এ নিরংকুশ স্বাধীনতা সমাজের মজবুত সৌধকে একদিন অকস্মাৎ বিধ্বস্ত করে ফেলবে।

এসব অভিমত শোনার পরে স্বভাবতই কয়েকটা প্রশ্ন জাগে। দেহ ও মনোবিজ্ঞানের সব গবেষণা তার ফলে অর্থহীন ও ভিত্তিহীন মনে হয়। সোল সাইমান, অগাষ্ট কোঁতে এবং মনীষী প্রুধোঁর মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতের সূর্যগুলোকেও তখন মনে হয় যেন অন্ধকারের দেবতা। ফরীদ বেজদীর বিপ্লবী লেখনীর শাণিত কথা ও দাঁতভাঙ্গা জবাবগুলোও তখন যেন মুহূর্তে নিষ্প্রভ হয়ে যায়, অবজ্ঞার চোখে দেখতে ইচ্ছে করে। কেন? সে কোন প্রশ্ন? তা হচ্ছে এইঃ

যে ইউরোপ এতসব গবেষণার উৎস ও এরূপ মহান গবেষকদের কেন্দ্রস্থল, সেখানে জনসাধারণের কর্মধারা তার সম্পূর্ণ বিপরীত কেন? যাদের শীর্ষস্থানীয় মনীষীদের এরূপ মতামত, তারা কেন তা অনুসরণ করে চলছে না? আমরা কি সে দেশের কাজ দেখব, না মতামত দেখব?

এ ভাবনাসূত্র এমনিভাবে এগোতে থাকে যে, ধারাবাহিক প্রশ্নমালা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে মনের কোণে একের পর এক। সন্দেহ দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হয়ে চলে। এ প্রশ্ন মগজে আসর জমিয়ে গোটা মনোভাবকেই ফরীদ বেজদীর বিরুদ্ধে চালু করে। এ কথা কি সত্যি যে, ইউরোপের মনীষীরা নারীদের নিরংকুশ স্বাধীনতা, সাম্য দাবী ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের পরিপন্থী? যদি তা সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে সেই ইউরোপের অধিবাসীরা তা মেনে চলছে না কেন?

আমাদের প্রতীতি জন্মানো হচ্ছে যে, নারীর দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা প্রকৃতিগত এবং স্রষ্টার বিধানই হচ্ছে এই যে, নারীর কর্মজগৎ নরের কর্মজগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকবে। আমাদের ইউরোপীর পণ্ডিতদের অভিমত শুনিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে, নারীরা যদি এর খেলাফে গিয়ে পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা করে, তারা যদি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে যায়, তাহলে গোটা সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরবে এবং মানব সংস্কৃতিতে সহস্র প্রকারের ব্যাধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। যার ফলে মানব সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।

যদি ওপরের মতামত সত্য হয়, তাহলে কি ইউরোপ তার বিপরীত কাজ করে অর্থাৎ নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়ে সভ্যতা ও জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে বসেছে? স্রষ্টার বিধানের বৈপরীত্য কি তাদের ভেতরে সে ব্যাধির সৃষ্টি করেছে, যা অতীতের বিরাট বিরাট সভ্য জাতিকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়েছে? ইউরোপের জীবন ধারা থেকে কি স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য নির্বাসিত হয়েছে?

আমাদের বলা হয়েছে যে, নারীদের প্রকৃতিগত দায়িত্বই হচ্ছে ঘরের চার দেয়ালের ভেতরের কাজ সম্পাদন করা। কিন্তু ইউরোপে নারীরা যে পুরুষের তালে তাল রেখে সাংস্কৃতিক টানাহেঁচড়ায় অংশগ্রহণ করে চলছে, তাতো আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এ অংশগ্রহণের ফলে ইউরোপে কোন ধ্বংসাত্মক ফল দেখা দিয়েছে কি? আমরা কি করে তা স্বীকার করতে পারি? কারণ, সেই ইউরোপ যে আজ বিশ্বসভ্যতার উৎসভূমি। যখন ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থা দুনিয়ায় সবচাইতে উত্তম, যখন ইউরোপ আজ গোটা সভ্য জগতের শিক্ষক এবং যখন ইউরোপের জাতিরাই দুনিয়ার বুকে সত্যিকার জীবনের স্বাদ উপভোগের সুযোগ লাভ করছে, তখন কিভাবে স্বীকার করব যে, তারা ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলছে?

মূলত এও আরেক ধোঁকা। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাচ্যের এক বৃহত্তর শিক্ষিত দল সে ফাঁদে পা দিয়েছে। দূর থেকে সব কিছুই ভাল দেখায়। ইউরোপকে আজ যেভাবে ভক্তি ও শুভেচ্ছা দিতে আমরা অভ্যস্ত, তাতে আমাদের প্রাণে এরূপ প্রশ্ন বা সন্দেহ জাগাই তো স্বাভাবিক! আমাদের দৃষ্টিতে সেখানের জীবনধারা অত্যন্ত সুন্দর ও সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা অপরিসীম চিত্তাকর্ষক মনে হয়। ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও সম্প্রসারিত সভ্যতার বিজলী বাতি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। তাই সেই বদ্ধমূল ভাল ধারণা আমাদের বাধা দিচ্ছে তাদের বিরোধী কোন মতামত অতি সহজে

মেনে নিতে। কিন্তু, যখন ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার একটা স্বচ্ছ চিত্র আমরা দেখতে পাব, তখন সব জটিলতা দূর হয়ে যাবে এবং সন্দেহের যাদু হাওয়া হয়ে উড়ে যাবে।

আমরা বিস্ময়ের সাথে তখন দেখতে পাব যে, এতদিনের উঁচু ধারণা আমাদের কতই বিভ্রান্তিকর ধোঁকা ছিল এবং মূল থেকে তা কতখানি দূরে ছিল। আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হব এই ভেবে, যে ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র, শিক্ষক ও আশ্রয়স্থল, সৃষ্টির বিধানের ব্যতিক্রম করতে গিয়ে সেখানকার জীবনধারা থেকেও শান্তি ও নিরাপত্তার নেয়ামত চিরতরে উধাও হয়েছে। যে ইউরোপ প্রাচ্য জগতকে অসভ্য, এমনকি জংলী ভেবে তাদের সারল্য ও মূর্খতার উপরে করুণার হাসি হাসছে, তারাই আজ নারীদের নিরংকুশ স্বাধীনতা দানের বদৌলতে স্বীয় সমাজকে পাশবিক চাল-চলন এবং দুঃখ ও অরাজকতার কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তুলছে। তাদের সমাজ আজ এতটুকু শান্তি ও শৃঙ্খলা দেখবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, যা আমেরিকার অসভ্য এলাকার অধিবাসীদের ভেতরে বিরাজমান। এমনকি আফ্রিকার বন এলাকার বৃক্ষতলের বাসিন্দাদের ভেতরেও যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রয়েছে, তাও তাদের স্বপ্নের অতীত হয়ে চলছে।

আপনারা কি ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার একটা ঝলক দেখতে চান? আপনারা কি সেই দৃশ্য দেখতে চান, যা আপনাদের মনকে সন্দেহের অস্থিরতা ও বেদনা থেকে মুক্তি দেবে? হ্যাঁ-আপনাদের অধীর দৃষ্টি তা দেখবার প্রতীক্ষায় রয়েছে। আমি আপনাদের বেশি সময় অপেক্ষায় রেখে কষ্ট দিতে চাই না। পাতা উল্টিয়ে চলুন। আগামী পরিচ্ছেদই আপনাদের সামনে সে চিত্র তুলে ধরবে।

ইউরোপের সামাজিক জীবন

"مصلحت نیست کہ ازپردہ برون افتد راز
ورنہ درِ مجلس رندان خبرے نیست کہ نیست"

'পর্দাঘেরা গুপ্ত কথা ব্যক্ত করা নয় ভাল,
নইলে ধরার কোন কথা নেই শরাবখানায়, তাই বল?'

গোটা প্রাচ্য জগৎ আজ একটা মারাত্মক বিভ্রান্তির কবলে হাবুডুবু খাচ্ছে। তা হচ্ছে পাশ্চাত্য জগতের প্রতি তাদের অন্ধ ভক্তি। তাদের চোখে ইউরোপ ও আমেরিকার সবকিছুই তার ফলে প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় হয়ে ধরা দেয়।

বলা বাহুল্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতের বিস্ময়কর অগ্রগতিই তাদের সাতখুন মাফ করে দিয়েছে। তাদের সর্ববিধ সামাজিক অনাচার তার ফলে একেবারেই চাপা পড়ে গেছে। তাদের বিশেষ ক্ষেত্রের সেই ভাল কাজগুলো অপরাপর যতসব মন্দ কাজগুলোকে একেবারেই চোখের আড়াল করে রেখেছে। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ .

(নিশ্চয়ই পুণ্য কাজ পাপ কাজগুলোকে দূর করে দেয়)।

কিন্তু আমার এ অধ্যায় আপনাদের সামনে পাশ্চাত্যের অন্ধকার দিকটারই হুবহু চিত্র তুলে ধরবে। এটাই হয়ত আপনাদের পয়লা সুযোগ হবে পাশ্চাত্যে জগৎকে আরেক দৃষ্টিতে দেখার, আরেকভাবে জানার।

যে ইউরোপের প্রতিটি কথা ও কাজ আপনাদের ভেতরে প্রশংসা ও অনুসরণের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের প্রবল প্লাবন সৃষ্টি করে, সেই ইউরোপের কথাই এখন বলতে যাচ্ছি। যখনই আমি তার ওপরের যবনিকা তুলে ধরব, সহসা আপনারা দেখতে পাবেন তার আসল চেহারাটা-জঘন্য ও কুৎসিৎ রূপ তার। আপনাদের পরম ভক্তির তীর্থস্থল ইউরোপকে তখন দেখবেন মানবতার অবমাননার এক নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্যতম দৃষ্টান্তস্থল রূপে।

হ্যাঁ-একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই আপনারা দেখবেন, যে ইউরোপ গোটা দুনিয়াকে

শিক্ষা ও সভ্যতার পথ দেখাবার আস্পর্ধা রাখে, তা আজ এরূপ মর্মান্তিক দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ ব্যাধিতে ভুগছে, যার প্রতিকার নেই কোথাও। বাইরে তাদের ঠাঁট ও আড়ম্বর যত বেশি উঁচু করে ধরছে, ততখানিই তারা দূরে রয়েছে সামাজিক সুখ শান্তি থেকে। এমনকি সে ক্ষেত্রে তারা যে কোন অসভ্য ও বন্য মানুষের চাইতেও কয়েকগুণ পেছনে পড়ে আছে। তাদের সে প্রদর্শনীর জীবন উপলব্ধি করে এশিয়ার তথাকথিত অসভ্য জীবনযাত্রা করুণার হাসি হাসছে। এমনকি তাদের সামাজিক জীবনের মর্মান্তিক দুর্গতি দেখে 'ওয়েস্ট মিনিস্টার এবি'র বৈজ্ঞানিক ও মনীষী সংসদ কান্নার রোল তুলেছে।

ইউরোপ সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণের জন্য তরঙ্গবেগে বায়ুভরে এগিয়ে চলছে। সে গতি 'আলেফ্ লায়লা'র বিশ্ববিখ্যাত অশ্বকেও নিমেষে হার মানায়। কিন্তু জড় জগতের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে হেঁচকা টান দিয়ে নিচে নামিয়ে আনছে। অনেক নিচে গড়িয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। সংস্কৃতির পাহাড়ে যদি সে এক পা এগোয়, দুষ্কৃতির ময়দানে তাকে দু'পা পিছিয়ে আসতে হয়। তথাকথিত সংস্কৃতির প্লাবন তার চারিত্রিক মানদণ্ড ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অনেক আগে-বহু দূরে।

আমার গ্রন্থের এ অধ্যায়টি পাশ্চাত্যের আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার মায়াপুরির চাবিস্বরূপ। এর দ্বারা আপনি সেই যাদুর তালা খুলে ফেলতে পারবেন, যা প্রাচ্য জগতের অন্ধ ভক্তির মোহজাল পাশ্চাত্য সমাজ জীবনের সিন্দুকে লাগিয়ে রেখেছে।

উচ্চ ধারণা, সীমাবদ্ধ জ্ঞান, সংকীর্ণ দৃষ্টি ও পূর্ব পুরুষের পূজা পাশ্চাত্য সমাজের মূল স্বরূপের ওপরে মেকি আবরণ ঢেলে রেখেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাচ্য জগৎ তাই তাদের সম্পর্কে চরম ভ্রান্তিতে পড়ে গেছে। আমার এ অধ্যায়টি সেই মেকী আবরণটি যদিও সামগ্রিকভাবে তুলে ফেলতে সমর্থ হবে না, তবু তাতে এতটুকু ফাঁক সৃষ্টি করবে যা দিয়ে যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই তার আসল রূপটা এক নজর দেখে নিতে পারবে। তখন যদি তাদের চোখে আবার কোনরূপ পর্দা পড়ে না যায়, তাহলে অবশ্য তাদের সব সংশয় দূর হবে।

হ্যাঁ-আপনাদের দৃষ্টি লোহিত সাগর পেরিয়ে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে চলে গেছে এবং আলোর একটা ঝলক দেখতে পেয়েছে। আলোটা বড়ই চটকদার। তাতে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য রয়েছে যা আপনাদের চোখ ধাঁধিয়ে ফেলছে। আপনাদের ধারণা, এ দ্যুতি পাশ্চাত্যের সুউচ্চ মীনার থেকে ঠিকরে পড়ে প্রাচ্যবাসীর চোখে আলো যোগাচ্ছে।

কিন্তু এ অধ্যায়টি আপনাদের লোহিত সাগরের এ পারেই ঘুরিয়ে আনবে। আপনারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে দেখতে পাবেন যে যাকে এদ্দিন প্রাচ্যের বাতিঘরের আলো বলে ভুল করেছিলেন, তা হচ্ছে বসফোরাসের এক সাধারণ কারুকার্য মাত্র।

ইউরোপের সাথে প্রাচ্য জগতের আজকের সম্পর্ক হচ্ছে গুরু-শিষ্যের। প্রাচ্য তাই ইউরোপের কাছে সর্বদাই হাতজোড় রয়েছে। তাদের অন্তরে বাসা বেঁধে আছে চরম গুরুভক্তি; ভক্তির তুফান সত্যের ভাণ্ডার ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ভ্রান্ত ধারণার ঝঞ্ঝা জোরে বয়ে চলছে। সেদিন আসন্ন যখন সত্যের ফেরেশতাই ভাল ধারণা ও ভক্তির দেবতার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে।

তাই আমার বইয়ের এ অধ্যায়টি আপনাদের পথ দেখাবার ভার নিয়েছে। সত্য ও খাঁটি ব্যাপারের হদীস দিয়ে তা অসত্য ও ধাপ্পার ঘনীভূত বিপদ থেকে উদ্ধার করবে আপনাদের। আপনাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে মুক্তি দেবে এ অধ্যায়। কারণ এ দুটোর সূত্র ধরেই পাশ্চাত্যের বালাই আপনাদের ভেতরে অনুপ্রবেশ করে আজ জেঁকে বসেছে।

আমার এ বক্তব্যের দলিল আপনারা একটু তলিয়ে দেখলে অনেকেই পেতে পারেন। প্রতি দেশে ও প্রতি অঞ্চলে আসল ঘটনা চাপা দেবার ও ভেতরগত দৌর্বল্য লুকাবার প্রয়াসে বাইরের চাকচিক্য ও ঠাঁট বজায় রাখার ব্যবস্থা জোরেসোরেই চলছে। কিন্তু, সাথে সাথে স্রষ্টা ও তাঁর প্রকৃতি মানুষের এই ধাপ্পাবাজির প্রয়াসকে ভেতরে ভেতরে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ করে দেয়ার ব্যাপারে মোটেই ঢিল দিচ্ছে না। মানুষ কৃত্রিম ও সাময়িক সাফল্যের গৌরবে আত্মবিস্মৃত হয়ে স্রষ্টা ও তাঁর প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাম্ভিকতার পথ বেছে নেয়। তারা তখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, এই কৃত্রিম অপপ্রয়াসই তাকে সাফল্যের শীর্ষদেশে নিয়ে যাবে। কিন্তু, বিশ্বপ্রকৃতির বিধান তার চালবাজির রহস্যোদঘাটন করে দেয়। পরন্তু, তাকে সতর্ক করে দেয় এই বলে, মানুষের লাখো অপপ্রয়াস স্রষ্টার ন্যায়দৃষ্টির সামনে মুহূর্তের জন্যেও টিকে থাকতে পারে না।

আপনারা আমার এ সব কথা বাহুল্য ভেবে আমার প্রতি অবাক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন কেন? আমি তো শুধু নিজের দাবি ও মতামত নিয়েই আপনাদের কাছে উপস্থিত হইনি। আমি যা বলছি তাতো আজকের দৈনন্দিন সমাজ জীবনে সংঘটিত চরম সত্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। আপনারা প্রতিদিন পর পর তার বহু নজীর দেখতে পাচ্ছেন।

আমার বর্ণনা আর ইউক্লিদাসের ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আসলে একই জিনিস। পৃথিবীর মানুষ তাকে ভুল করে দুই নামে স্মরণ করছে। আমার এ বক্তব্য আর জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ মূলত একই। তবে ভুল করে এ যুগের লোক দুই বস্তু বলে জানে। আমার মত মেনে না নেয়া আর দুয়ে দুয়ে চার হয়-এ কথা না মানা, সমান কথা।

আপনারা দুনিয়া এবং দুনিয়াবাসীর ওপরে একবার নিরপেক্ষভাবে চোখ বুলিয়ে নিন। তখনই আপনাদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্ম নেবে যে, সেরূপ চরম দুর্গতি শুধু সে দেশ ও জাতির ভেতরে দেখা দেয়, যেখানে মেকিত্ব ও ধাপ্পা চরম পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করে। যেখানেই ভেতরে দৈন্য, সেখানেই তা চাপা দেবার জন্যে বাইরের আড়ম্বর ও ভেল্কিবাজির মহড়া সীমা হারিয়ে চলতে শুরু করে।

একবার লক্ষ্য করে দেখুন, এইসব তথাকথিত সভ্য জাতিরা তাদের ভেতরকার বহুবিধ ব্যাধি দূর করার জন্য কত রকমের বিস্ময়কর ও অভাবনীয় পন্থা আবিষ্কার করে চলছে। কত শত চিকিৎসক হাজার ধরনের গবেষণায় রত আছে। লাখো ধরনের ওষুধ আবিষ্কার করছে। কোটি কোটি টাকা স্বাস্থ্য সংরক্ষণের খাতে খরচ করছে। এত কিছু সত্ত্বেও ব্যাধি তাদের পেছন ছাড়ছে না। এক ব্যাধি সারতে না সারতে দশ ব্যাধি নতুন করে দেখা দেয়। আজ গাঁয়ের অর্ধ সভ্য ও মরুচারী যাযাবরদের ভেতরে যে সব ব্যাধির নাম-নিশানা খুঁজে পাওয়া যায় না, ডাক্তার ও ওষুধপত্তর বিহীন বনভূমি ও পাহাড়ী এলাকার অসভ্য জাতির ভিতরে যার নামও শুনেনি কেউ কোনদিন, সে সব ধ্বংসাত্মক ব্যাধি দিন দিন সভ্যদের তীর্থতুল্য শহরগুলোতে হু হু করে সৃষ্টি হয়ে চলেছে। অথচ ওষুধপত্তর ও ডাক্তার ছাড়াই আজ গায়ের মূর্খ মানুষগুলো অবৈজ্ঞানিক বিধি ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে যেভাবে সুস্থ সবল জীবনের প্রাচুর্য ও শান্তি ভোগ করছে, আমাদের সভ্য শহরবাসীরা টাকার ওপরে গড়াগড়ি গিয়ে এবং ঘরে ঘরে ডাক্তার ডিসপেন্সারী ও হাসপাতালের যুগান্তকারী ব্যবস্থা করেও তা কল্পনা করতে পারে কি?

এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে যে, সেই অজ গাঁয়ের লোকগুলো কৃত্রিম জীবন পদ্ধতি থেকে অনেক দূরে থেকে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহজ সরল জীবনযাপন করে চলছে। পক্ষান্তরে শহরবাসীরা; প্রকৃতিকে জয় করার উদগ্র নেশায় তার বিরুদ্ধে এক কৃত্রিম জীবন পদ্ধতি অনুসরণের পরীক্ষা চালাচ্ছে। তার থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে লাখো ধরনের জটিল ব্যাধি। অসভ্য জাতিগুলো যখন প্রকৃতির বিধানের সামনে সদা আনত থেকে প্রাকৃতিক বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের আকৃতি প্রকৃতির প্রতিপালন ব্রত

চালাচ্ছে, সভ্য জাতিগুলো তখন জ্ঞান ও শিক্ষার প্রাচুর্য গৌরবে দাম্ভিক সেজে জীবন পদ্ধতিকে চিত্তের খেয়াল খুশিমতকৃত্রিম হতে কৃত্রিমতর করে নিয়ে বাহ্যিক নিত্য নতুন প্রতিষেধক আবিষ্কার করে তাদের প্রকৃতিগত ত্রুটিপ্রসূত ব্যাধির সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে। সৃষ্টির চিরন্তন বিধানের সাথে তারা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে তারা প্রকৃতির বিধানের সহজ জীবন যাত্রার অনুসারীদের চাইতেও মারাত্মকভাবে জড়িয়ে যায় এবং তাদের এই অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রকৃতির প্রতিশোধ বন্যার বেগে নেমে আসে। আর প্রকৃতির সহস্র বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত হয় তারাই, যারা তা এড়াতে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ফেলে বেশি করে।

এ ব্যাপারে সভ্য জাতিগুলোর উদাহরণ তুলে ধরতে গিয়ে শুধু তাদের নারী শ্রেণীর অবস্থাটা দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করলেই যথেষ্ট। ইউরোপের কতিপয় কল্পনা বিলাসী ও মোহাচ্ছন্ন লোকের দাবি হচ্ছে এই যে, তাদের নারীরা বেশির ভাগ স্বাধীনতা ভোগ করছে এবং অসভ্য জাতির মেয়েদের চাইতে তারা প্রকৃতিগত শক্তির বেশ সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে। এই মিথ্যা দাবিদাররা স্বমতের অনুকূলে অনেক দলিল প্রমাণ খাড়া করে থাকে। কিন্তু অপরদিক থেকে স্রষ্টা তাদের দাবির অসারতা প্রতিপন্ন করে চলছেন। কখনও তিনি তাদেরই সর্বমান্য সেরা মনীষীর দ্বারা তাদের গোমর ফাঁক করে দেন। কখনও বা তিনি স্বীয় লীলার মাধ্যমে তাদের সতর্ক করে বলেনঃ হে উদাসীন ও স্বপ্নচারী মানব! আমার সাথে আড়ি দিয়ে যাবে কোথায়?

আসুন, আপনারা এবারে দেখুন যে অসভ্য জাতির নর-নারীর ভেতরেও ততখানি পার্থক্য নেই, যতখানি সভ্য জাতিগুলোর ভেতরে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে বিধাতা যেন নারী স্বাধীনতার জন্যে আত্মোৎসর্গী দেশগুলোর নর-নারীর পার্থক্যটা বেশী করে তুলেছেন।

তবুও একি কথা? এ হচ্ছে এক বাস্তব নির্দশন, যা প্রমাণ করছে যে, সভ্য দুনিয়ার নারীরা ক্রমাগত স্বাভাবিকতা হারিয়ে অধঃপতনের চরমে পৌছে চলেছে। তাদের এই অভাবনীয় দুর্গতিই আজ বাঙময় হয়ে চিৎকার করে বলছেঃ তোমরা নারীদের বাহ্যিক অধীন ও বন্দীদশাকে যতই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাও না কেন, তবু সে অবস্থার অসভ্য নারীদের চাইতে তোমাদের সভ্য নারীরা কঠিনতম বন্দী দশায় দিনদিন মরণের পথে এগিয়ে চলছে।

'তাহ্‌রীরুল মারআতের' প্রণেতা কাসেম আমীন বেগ বলছেনঃ 'অসংখ্য নারী আজ অফিস ও আদালতে, গীর্জা ও ময়দানে, তার ও ডাক বিভাগে, প্রকাশনা ও

সংবাদপত্রে কাজ করে যাচ্ছে। নারীদের বেশির ভাগ কাজ শিক্ষা দপ্তরেই জুটছে। এ ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শতকরা পঁচানব্বই জনই নারী শিক্ষয়িত্রী।'

বিজ্ঞ লেখক তাঁর প্রায় মন্তব্যের সাথেই এরূপ একটা বাক্য জুড়ে দেন। এর থেকে নারী স্বাধীনতার ভাল দিকটা আমাদের সামনে তুলে ধরতে চান; তাদের অর্থনৈতিক দুর্গতির দিকটা তিনি ইচ্ছা করেই এড়িয়ে যান।

মনীষী সোল সায়মান 'রিভিউ অভ রিভিউজ' পত্রিকার অষ্টাদশ সংখ্যায় লিখেছেনঃ

'নারীরা আজ কাগজের মিল ও ছাপাখানা ইত্যাদিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে। সরকার তাদের থেকে কারখানার কাজ নেয়া আরম্ভ করেছে। তারা অবশ্য তা থেকে বেশ কিছু উপার্জনও করছে। কিন্তু, তার বিনিময়ে তারা নিজ নিজ সোনার সংসারকে বরবাদ করছে। হ্যাঁ-সন্দেহ নেই যে পুরুষরাও নারীদের উপার্জন থেকে উপকারই পাচ্ছে। কিন্তু সাথে সাথে পুরুষের কায়-কারবার দিন দিন সীমাবদ্ধ হয়ে চলছে। কারণ, তাদের ক্ষেত্রগুলো ধীরে ধীরে নারীরা দখল করে নিচ্ছে বলে তারাও ক্রমে ক্রমে হাত গুটিয়ে বেকার হতে চলেছে।'

আরেকটু এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ

'ইউরোপের কিছুসংখ্যক নারী তো উপরোল্লিখিত নারীদের চাইতেও কয়েক ধাপ উন্নত স্তরে পৌঁছে গেছে। তারা কেউ সরকারী অফিসের কেরানী, কেউ দোকানে বিক্রেতা, কেউ শিক্ষয়িত্রী কেউ তার ও ডাক বিভাগে কর্মনিরতা এবং কেউ বিভিন্ন ব্যাংকে চাকরি করছে। সাথে সাথে এ ব্যাপারটাও বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে যে, চাকরি জীবন তাদের সংসার জীবন থেকে দূরে হটিয়ে নিচ্ছে। তারা আজ ঘর-সংসারের আলো নিজ হাতে নিভিয়ে চলছে।'

এ হচ্ছে এমনই এক ব্যক্তির কথা যিনি একটা সংসারেরও মালিক। জনৈক সংসার কর্তার চাইতে সংসারের অভিজ্ঞতা আর কার বেশি থাকতে পারে? তাই তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত এ কথায় কর্ণপাত না করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি?

শ্রদ্ধেয় লেখক লিখেছেনঃ

'আমেরিকায় নারীদের চরম উন্নতির প্রমাণস্বরূপ শুধুমাত্র ১৮৮০ সালের আদম শুমারীর উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি। তাতে দেখা গেছে যে, শিক্ষা দপ্তরে সেখানে

শতকরা ৭৫ জন নারী কাজ করছে। তা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শতকরা ৬৩ জন ও কারিগরীতে শতকরা ৬২ জনই নারী।'

কিন্তু, মাননীয় লেখক সাথে সাথে এ কথাটা লিখতে ভুলে গেলেন যে, তার ফলে সমাজদেহে কি বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কারণ, সে আদম শুমারীর রিপোর্ট যে পাঠ করেছে, তার অবশ্যই সে কথা জানা রয়েছে। আমি আপাতত পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমেরিকার নারীদের শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নতির ওপরে ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত ম্যাডাম ডাফরিনোর সম্পাদিত 'আনিসুল জায়েস' পত্রিকাখানার দিকে। তাতে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতির হিসাব নিকাশ তুলে দিয়ে পরিশেষে মন্তব্য করেছেনঃ

'কিন্তু, এসব দেখে শুনে প্রকাশ্যত জানা যায় যে, নারীরা দিন দিন যতই বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতই তারা এগিয়ে চলছে, পুরুষরা তত তাদের তালাক দিয়ে চলছে। তালাকের এ হিড়িক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সবচাইতে মাত্রা ছাড়িয়ে চলছে। এ ব্যাপার আজ এরূপ ভয়াবহ স্তরে পৌছেছে যে, এমন কি প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কিংবা অন্যান্য দেশগুলো তা কল্পনাও করতে পারবে না।'

মাননীয়া ভদ্র মহিলা তালাকের যে ভয়াবহ চিত্র আমেরিকার সমাজ জীবন থেকে তুলে ধরলেন, তা যথাযোগ্য স্থানে আলোচনার জন্য রেখে দিলাম। এখানে শুধু এতটুকু বলে রাখতে চাই যে, যতই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সাহিত্যে দর্শনে গা ভাসিয়ে চলছে, ততই তারা পুরুষ জাতির ঘৃণ্য ও অবজ্ঞার পাত্রী হয়ে চলছে। আর সবচাইতে মারাত্মক ক্ষতিকর ব্যাপার হয়েছে তাদের বাইরের কাজে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় নামাটা।

মাদাম মার্টিনের সভানেত্রীত্বে ১৮৭০ খৃস্টাব্দে আমেরিকার নারীদের এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার থেকে নারীদের রাজনৈতিক অধিকার দাবি করা হয়। তারা এমন সব রাজনৈতিক নেতাদেরও বশ করে ফেলেছিল, যারা সর্বদাই নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ক্ষতিকারক মনে করতেন। এ সম্মেলনের নারী সদস্যরা প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দান, বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িকীতে লেখা দান ও দলীয় নেতাদের যুক্তি-তর্কের দ্বারা বশ করানোর কাজে লিপ্ত থাকত। এমনকি তারা শেষ পর্যন্ত ভীষণ আন্দোলন তুলে উযীর সভা কর্তৃক তাদের দাবি মানিয়ে নিল। সেই থেকে তারা আমেরিকায় পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দেই মাদাম মার্টিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে প্রার্থীনী হলেন এবং বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। প্রেসিডেন্ট হয়ে সবে মাত্র দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যাবেন, এমনি মুহূর্তে তাঁর দলে বিরাট ভাঙ্গন দেখা দিল। তাঁর সব সঙ্গিনীরা তাঁকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল। বেচারী চরম সংকটাপন্ন হলেন।

সরকার এ অবস্থা দেখে তৎক্ষণাৎ নতুন ফরমানবলে চিরতরে নারীদের সে পথ বন্ধ করে দিল। কারণ, সরকার খুব ভালোভাবেই বুঝে নিল যে, নারীদের ভেতরে মিলেমিশে কাজ করার ক্ষমতা নেই আদৌ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'রিভিউ অভ রিভিউজ' পত্রিকার অষ্টাদশ সংখ্যায় বিস্তারিতভাবে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

মনীষী প্রুধোঁ নারীদের এই অসঙ্গত স্বাধীনতার চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে লিখেছেনঃ

'আজকালকার এই তথাকথিত নারী স্বাধীনতার জিগিরকে তো আমি পছন্দই করি না। পরন্তু, যদি প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে অতীতের মত আজও নারীদের পুরোপুরি কয়েদ করে রাখার জন্যই আমি পরামর্শ দিব।' (ইবতেকারুন -নিযাম)

বলা যেতে পারে, যুগের আন্দোলন ও প্রবাহ নারীদের যে স্বাধীনতার দাবিদার করছে, তার উদ্দেশ্য নয় এ সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে দেয়া বা প্রাথমিক যুগের মত উচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। তাই নারীদের এ ব্যাপারে অপরাধের দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না।

এর জবাবে বলা চলে, যে নিজকে ইতিহাসজ্ঞ বলে জাহির করে, সে অবশ্যই ঠিক কথা বলে। কিন্তু, আজকের যত সব সভ্য দেশগুলোর নারীরাই তো বিবাহকে পরিহার করে চলছে। তাদের ধারণায় এ সামাজিক পদ্ধতিটা তুলে দেয়ারই যোগ্য। তারা এ থিওরীর ওপরে বড় বড় কিতাব রচনা করে চলছে। 'রিভিউ অভ রিভিউজ'-এর অষ্টাদশ খণ্ডে লিখেছেঃ

'যে বিয়ে শাদীকে আমাদের আবহমানকালের মানব সমাজ অপরিহার্য মনে করে গেলেন, আজ তার গুরুত্ব সর্বত্র যেন ক্ষুণ্ন হয়ে চলছে। আজকের শিক্ষিতা নারীরা দিন দিন যে ভাবে সর্বক্ষেত্রে তাদের উন্নয়ন ও অধিকার বাড়িয়ে চলছে এবং সাথে সাথে তাদের অধিকার বাড়ানো ও কমানোর যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে, এ সব কিছুই আমাদের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার উপরে প্রচণ্ড আঘাতস্বরূপ।'

আরও একটু এগিয়ে লেখা হয়েছেঃ

'পুরুষদের বিয়েতে অরুচি ও বিচ্ছেদে রুচি বিশেষ করে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে দৈনন্দিন যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারতা লাভ করছে। তাই নারীদের উচ্ছৃঙ্খলাচারণ ও উম্মাভাবের যে মারাত্মক ব্যাধি সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করছে, তার যথাবিহিত প্রতিকার সম্পর্কে আজ আইন প্রণেতাদের সতর্ক হতে হবে।

ব্যক্তিগত বা জাতিগতভাবে নারীকে কয়েদী সাজানোর নিকৃষ্টতম নজীর হচ্ছে তার জীবিকার বোঝা তারই ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া এবং সেই বিনম্র শরীর ও প্রেম প্রীতিপূর্ণ কোমল অন্তঃকরণ নিয়ে কঠোরদেহী পুরুষদের সাথে জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হওয়া। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার কোনদিন ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরে সেখানকার বিস্ময়কর সৌধ ও বিরাট কল-কারখানাগুলো দেখবার সুযোগ হয়ে থাকে, তাহলে তাতে সব চাইতে যে বস্তু আপনার আগে নজরে পড়বে, তা হচ্ছে সেই কোমলাংগী নারীর বহর। তাদের নিয়োজিত করা হয়েছে কঠিনতম কষ্টসাধ্য কাজে। দেখবেন, একদল নারী হয়ত তপ্ত ইঞ্জিনে কয়লা দিচ্ছে। যার ফলে তাদের মনোমুগ্ধকর মুখমণ্ডল আগুনের তাপে ও ধোঁয়ার মোড়কে কাল্চে হয়ে আছে। এরূপ অসহনীয় ও তিক্ততম জীবন ধারা তাদের কপালে অদৃশ্য হস্তে এ কথাই লিখে রেখেছে, 'পুরুষ নারীর ওপরে যত নিপীড়ন চালাতে পারে, এ হচ্ছে তারই চরম নিদর্শন।' আপনারা বিজ্ঞদৃষ্টি বুলিয়ে এ লেখা সুস্পষ্টভাবে দেখতে ও পড়তে পারবেন। কেয়ামত তক তাদের কপালের সে দাগ মুছবার নয়।

এরপরে যদি কেউ কষ্ট স্বীকার করে তাদের থেকে জানার মর্জী করেন যে, তারা এ কঠোর নিপীড়নের বিনিময়ে কি পারিশ্রমিক পায়? তা হলে অসংখ্য নারীর সমবেত কণ্ঠের এ ধ্বনিই শুনতে পাবেন যে, এ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ও অসহনীয় দুর্গতি ভোগার পরেও দৈনিক তাদের ভাগ্যে বিশ সেন্টের বেশি মেলে না। তাদের এ পারিশ্রমিক সভ্য দেশের উন্নতমানের জীবিকা অনুপাতে এক ওয়াক্ত খোরাকীও দিতে পারে না। অথচ সে দেশে খুঁজে দেখবার অবকাশ পেলে দেখতে পাবেন যে, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার শতকরা অতিরিক্ত পাঁচজন হবে নারী। এ তো আমি সে সব দেশের কথা বলছি, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আজ যে সব দেশ সর্বোন্নত বিবেচিত হচ্ছে।

'ইলমল ইনসানে'র পারদর্শী গুরু জিওম ফ্রেয়ারো 'রিভিউ অভ রিভিউজ' এর প্রথম খণ্ডে (১৮৯৫ খৃঃ) লিখেছেনঃ

'যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে আজ আমরা আমাদের জীবনধারা চালিয়ে যাচ্ছি, তার জটিলতা দিন দিন এরূপ ভয়াবহরূপে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে যে, এরূপ দিন যাচ্ছে না যেদিন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির সামনে কিছু না কিছু নতুন অভিজ্ঞতা ও মারাত্মক সমস্যা দেখা না দেয়। তাই আমাদেরও আজ ডাক্তারের ভূমিকা নিয়ে এরূপ এক প্রেসক্রিপশান তৈরি করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, যা আমাদের এ যুগের ডাক্তাররা সাধারণত আজকের সামাজিক ব্যাধি দূর করার জন্য প্রস্তাব করে থাকেন। তা হচ্ছে গৃহত্যাগ করে বনে জঙ্গলে ফকির হয়ে চলে যাওয়া। যদিও সন্ন্যাসব্রতের এ নূতনরূপ কোন ধর্ম ও জাতির বিধি-ব্যবস্থার ভিত্তিতে নয়, তবুও আমরা অবশ্যই এরূপ একটা জীবন ব্যবস্থার হুমকির সম্মুখীন হয়েছি যা আমাদের মধ্যযুগের সেই সন্ন্যাস জীবন গ্রহণে বাধ্য করে ছাড়বে।

সব সভ্য দেশেরই প্রতিটি নর-নারী এ তিক্ত অভিজ্ঞতা দৈনন্দিন বেশ করেই অর্জন করে চলছে যে, দাম্পত্য জীবনের পথে আজ দিনের পর দিন বিঘ্ন ও অন্তরায় চরম আকারে বেড়ে চলেছে। অর্থনৈতিক সমস্যা সে ব্যাপারে এক প্রচণ্ড বাধা হয়ে ক্রমে ক্রমে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। এ সমস্যার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যেও অনেকে এখন ধৈর্য ধরে একাকী থাকাকেই প্রিয় ও শ্রেয় মনে করছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এ সিদ্ধান্তে পৌছার সুযোগ দেখা দেয় যে, দাম্পত্য জীবনের এ চরম বিপর্যয়ের ফলে অসংখ্য নর-নারীর যেভাবে বিবাহ বন্ধনমুক্ত অবস্থায় জীবন চলছে, সমাজ জীবনের উপরে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়া অপরিহার্য।

এর আরও একটা অশুভ পরিণতি রয়েছে। তা হচ্ছে এই 'চিরকুমারী থাকায় অবিবাহিতা নারীর যে ক্ষতি, অবিবাহিত পুরুষের চাইতেও তা মারাত্মক হয়ে থাকে। কারণ অবিবাহিত তরুণের অশুভ প্রতিক্রিয়া তার ব্যক্তিগত ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাতে তার সামাজিক মর্যাদা আদৌ নষ্ট হয় না এবং সমাজ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন আত্মঘাতী পন্থাও অবলম্বন করতে হয় না। পরন্তু তারা মুক্তভাবেই পবিত্রতা বিসর্জনকারী অসচ্চরিত্রা নারীদের সাথে থেকে তার জৈবিক চাহিদা মিটিয়ে নিতে পারে।

পক্ষান্তরে, নারীদের বেলায় তা আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, তারা সামাজিক আক্রমণ থেকে গা বাঁচাবার জন্য চিরতরে মাতৃত্বের আশা জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়। অথচ তাদের জীবনের সেটাই হচ্ছে পরম ও চরম কাম্য ও উদ্দেশ্য। এর পরিণামে ব্যক্তিগতভাবেও তার ভেতরে নানা ব্যাধি ও অশান্তি আত্মপ্রকাশ করে গোটা জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এ ধরনের অভিশপ্তা নারীদের বিষময় প্রতিক্রিয়া দিনে দিনে

সমাজ দেহকে পংগু ও জর্জর করে ফেলে।'

সভ্য জগতের এই বিখ্যাত মনীষীর মন্তব্য ও এ ধরনের আরও বহু মতামত আমাদের সামনে রয়েছে। তা দেখে বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না যে, ইউরোপীয় সভ্যতার কাঠামোতে এরূপ অজস্র জটিল রহস্য রয়েছে যা শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করার অধীর অপেক্ষায় দিন গুণছে। তার ভেতরে বিশেষ করে নারী স্বাধীনতাজনিত গুরুতর রহস্যের দ্বারই সবার আগে উদঘাটিত হবে।

তাই আমাদের কারুর যদি হীনমন্যতার এতখানি চরম বিকাশ ঘটে থাকে যে, ইউরোপকে অনুসরণ না করে তার আর নিস্তার নেই, তা হলে আগে তার জ্ঞান ও বিবেককে কিছুমাত্রায় চাঙ্গা করে হলেও তাদের প্রকৃত দশাটা একবার তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করা উচিত, তা হলে অন্তত ঘা খেয়ে ফেরার লাঞ্ছনাটা তাকে পোহাতে হবে না। কারণ, নীতিকথা হচ্ছেঃ ভেবে শুনে কর কাজ, করে ভেবোনাক। তা ছাড়া কাজ নষ্ট করে পরে পস্তাবার কোনই অর্থ হয় না।

যদি আমাদের ততটুকু জাগ্রত চেতনার অভাব থাকে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সে সব জটিল মারপ্যাঁচ আমাদের মাথায় একান্তই না খেলে, তা হলে সে সব সভ্য দেশের মনীষীদেরই আমাদের পথের দিশারী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দাস্তান থেকেই আমরা সত্যিকারের পথের নির্দেশ পেতে পারি।

নারীদের স্বাধীনতা দানের সবচাইতে জোর সমর্থক ও এই আন্দোলনের বিশিষ্ট সদস্যা দার্শনিক ফাওরিয়া লিখেছেনঃ

'আজ নারীর কি অবস্থা? তারা সব ধরনের বঞ্চনা ও বিপদের জীবনযাপন করছে। কর্মক্ষেত্রে নেমে উপার্জন করে খাবার অধিকার ও সুযোগটুকু পর্যন্ত তাদের নেই। কারণ, পুরুষরা তার সব ক্ষেত্রই দখল করে বসে আছে। এমন কি, সেলাই ও কারুকার্য যা একান্তই নারীদের কাজ ছিল, তাও পুরুষরা অধিকার করে রয়েছে। পক্ষান্তরে, নারীদের দেখতে পাবেন যে, তারা এই পৃথিবীর টানাহেঁচড়ার জীবনের যত সব কঠিন কঠিন কাজে লিপ্ত হচ্ছে-যা একান্তই তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ।

এখন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, এও যদি না পারবে, তা হলে ধন সম্পদ থেকে বঞ্চিতা নারীরা আর কি উপায় অবলম্বন করে বাঁচবে? তারা শুধু রূপ দেখিয়ে কিংবা দেহের বেসাতি করে খাবে নাকি?

হ্যাঁ-হতভাগা নারীদের জীবিকা উপার্জনের এটাই একমাত্র উপায় বটে-খোলা ময়দানে দেহের বেসাতি খুলে বসা কিংবা রূপ দেখিয়ে কাউকে ভুলিয়ে গভীর রাতে

তার অংকশায়িনী হওয়া। পুরুষ মনীষীরা তো নারীদের এই একমাত্র দুর্বলতাকে পুঁজি করে নারী স্বাধীনতার বিতর্কে তাদের মাথায় চড়ে বসে। এই একমাত্র দুর্ভাগ্যই তাদের বাধ্য করে এ ধরনের সমাজ, সংস্কৃতি ও স্বামীর দাসত্ব মেনে নিতে। তার থেকে মুক্তিলাভের উপায় ভেবে আজ পর্যন্তও নারীরা কুল-কিনারা করতে পারছে না। নারীদের এ দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে আমরা কি কোনরূপ ইনসাফের দৃষ্টি দিতে পারি না?

এখন বিবেচনা করে বলুন দেখি নারী বেচারীরা এ কঠিন দুর্ভাগ্য থেকে কি করে মুক্তি পাবে আর পেয়েই বা কোথায় যাবে? যখন বিজ্ঞান আমাদের এ কথা বলছে যে, বস্তুজগতের উন্নয়ন যতই হু হু করে যুগে যুগে চরমে এগিয়ে চলছে, তখন আমাদের চারিত্রিক অবনতি ও মানসিক দুর্বলতা বেড়ে চলছে। তখন বিংশ শতাব্দীর এ চরম উন্নতির মুহূর্তে কেন আমরা তাদের চরম দুর্গতি দেখে চোখের জলে বুক ভাসাব না? কেন তাদের ব্যাপারে শংকা ও উদ্বিগ্নতায় অতিষ্ঠ হয়ে রাতের ঘুম চিরতরে বিদায় দেব না?

এবার ভেবে-চিন্তে বলুন দেখি, কোন দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি কি এ কথা স্বীকার করতে পারে যে, নারীরা দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে যে কাজের উপযোগী হয়ে জন্ম নিয়েছে এবং যে স্বাভাবিক দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছেড়ে তারা জীবন সংগ্রামের কঠিনতম ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নিজেদের বিপন্না ও বিপর্যস্ত করবে? সে ক্ষেত্র তা শুধু কঠোর প্রকৃতির পুরুষদেরই উপযোগী। কিন্তু, নারীরা সে ক্ষেত্রে প্রবেশ করে শুধু বাইরের দিক থেকেই বিপর্যস্ত হচ্ছে তাতো নয়, বরং ভেতরের দিক থেকেও তো তারা তিলে তিলে মরে যাচ্ছে। এ সংকট এড়াবার উপায় কি তাদের?

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক মনীষী প্রুধোঁ তাঁর প্রণীত 'ইবতেকারুন নিযাম' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

মানব জাতি চারিত্রিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রেই নারীদের কাছে আদৌ ঋণী নয়। তারা জ্ঞানের সূক্ষ্মপথে নারীদের সহৃদয়তা ছাড়াই এগিয়ে চলেছে। তারা নিজেরাই যত বিস্ময়কর বস্তুর আবিষ্কর্তা।

মনীষী প্রুধোঁ তাঁর বক্তব্যটি এভাবে লিখেছেনঃ

'সাংস্কৃতিক জগতে নারীরা পুরুষের সাথে যে বাজী রেখেছিল, তা ছিল আধুনিক কলকারখানার সাথে চুল্লীর বাজী রাখার মতই হাস্যাস্পদ। তাই তাতে অতীতেও তারা কোন সফলতা চোখে দেখেনি, আজও দেখার আশা নেই। আর কলকারখানার কাজে তো পুরুষের সামনে নারীদের বৃহত্তর মেশিনের সামনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলকজার

মতই দেখা যায়।'

বিখ্যাত মনীষী সোল সাইমান ফ্রান্সের খ্যাতনামা লেখক লুসোভিয়ার বই সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

'নারীর নারীই থাকা উচিত' এ হচ্ছে মঁসিয়ে লুসোভিয়ার মন্তব্য।

নিঃসন্দেহে নারীকে নারীই থাকতে হবে। কারণ, তারা একমাত্র নারীত্বের বদৌলতেই তাদের কল্যাণ দেখতে পাবে। আর সে কল্যাণে তারা অপরকেও ধন্য করতে পারবে। তাই আজ আমাদের নারীদের অবস্থা শোধরাতে হবে। তার মানে এ নয় যে, তাদের গোটা চেহারাই বদলে ফেলতে হবে। আমাদের পরম কর্তব্য হচ্ছে, তাদের পুরুষ হবার প্রয়াস থেকে ফিরিয়ে রাখা। কারণ, পুরুষ হবার সাধনা চালাতে গিয়ে তারা তাদের ভেতর ও বাইরের সব সৌন্দর্য হারিয়ে বসবে।

সন্দেহ নেই, প্রকৃতি তার সব সৃষ্টিকেই পূর্ণরূপ দান করেছে। কোন কিছুরই অভাব রাখেনি তাতে। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তার দেখাশোনা চালানো, তার ভেতরকার প্রকৃতিগত অবদানকে পূর্ণরূপে বিকাশলাভের সুযোগদান। সাথে সাথে যেসব ব্যাপারে আমাদের প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দেবে, তা থেকে বাঁচার প্রয়াস চালানোও আমাদের অন্যতম কর্তব্য।"

কোন কোন দার্শনিক বলেছেন, বিপদই জীবন অর্থাৎ জীবন মানেই বিপদের ঝুঁকি নেয়া। তাদের কথায় বুঝা যায়, জীবনভর সে কাজের আনন্দ ভোগ করার সুযোগ লাভ করেনি। আমি বলছি, জীবন খুবই সুন্দর, বড়ই আনন্দের। অবশ্য জীবনকে সুন্দর দেখতে হলে, তাতে আনন্দ পেতে হলে পয়লা শর্তই হচ্ছে, নর ও নারী যার যার যথাযথ দাযিত্ব বুঝে সানন্দে তা পূর্ণ করে যাবে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মনীষী জিওম ফ্রেয়ারো 'রিভিউ অভ রিভিউজ'-এ লিখেছেন ঃ

"ইউরোপের বহু নারী-পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে সবক্ষেত্রে সমানে কাজ শুরু করে দিয়ে আজকাল বিয়ে শাদীর বহাসটা ছেড়েই দিয়েছে। সে সব নারীদের নারী ছাড়া অন্যকিছু নামে অভিহিত করাই উচিত। কারণ, দৈহিক গঠন ও প্রকৃতিগত স্বভাবে এক হতে না পারায় তারা পুরুষ নাম নিতে পারছে না। আবার নারীসুলভ কাজ তাদের ভেতরে একান্তই দুর্লভ বলে তাদের নারী বলবারও জো নেই।"

বলা বাহুল্য, এই খ্যাতনামা গুরু নারীদের ওপরে এ ধরনের নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছেন যে, কৃত্রিম জীবন ধারার মোহে স্বাভাবিক দায়িত্ব বর্জন করে স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করায়, তারা অপরাপর নারী থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে ভূতে ধরা নারীদের মত। মানবীয় প্রকৃতি যেন সবাক হয়ে তাদের থেকে এ

প্রমাণ পেশ করছে যে, যদি তোমরা আমার অধিকার অস্বীকার কর তাহলে আমি তোমাদের এমনি দশা করে ছাড়ব।

এরপরে মাননীয় অধ্যাপক লিখেছেন ঃ

"সংস্কৃতি ও মানবীয় জীবন পদ্ধতির বিশেষজ্ঞগণ প্রকৃতির বিধানের এরূপ বিরোধী কার্যকলাপের অশুভ পরিণাম এখন থেকেই অনুভব করতে শুরু করেছেন। কারণ, এ সব নারীরা পুরুষদের সাথে জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নেমে সমাজের ওপরে একটা বোঝা হয়ে চলছে। তাদের এরূপ উপযোগী কাজের খুবই অভাব, যা থেকে তারা জীবিকার ব্যবস্থা চালিয়ে নিতে পারে। যদি কিছুদিন আরও এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে, তাহলে সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থায় যে গুরুতর ভাঙ্গন সৃষ্টি হবে তা সুনিশ্চিত।"

এসব মূল্যবান মতামত জেনে-শুনেও কি আমাদের কেউ নারীদের খেয়ালখুশীমত বাইরের কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সাথে অংশ গ্রহণের জন্য উস্কানি দিতে যাবে? যখন আমরা প্রমাণ পর্যন্ত পেলাম যে, নারীদের এ কর্মপন্থা সমাজ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবে, এর পরেও কি নারী স্বাধীনতার আন্দোলনকে সম্প্রসারিত ও সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা আমাদের ওপরে অপরিহার্য বিবেচিত হবে?

ইউরোপে অর্থোপার্জনের হাজার ব্যবস্থা রয়েছে। এ সত্ত্বেও তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যে, মজুরীর ক্ষেত্রটা পুরুষদেরই একচেটিয়া থাক এবং নারীদের সে ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রয়াস থেকে ফিরিয়ে রাখা হোক। সেক্ষেত্রে এটা কতই আক্ষেপের বিষয় যে, আমাদের দেশে উপার্জনের পন্থা এত সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কি করে নারীদের তাতে আমদানীর জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছি?

এত কিছু জেনেশুনেও কি প্রকৃতির বিধানেরই পরিপোষক ইসলাম সমাজ ও জীবন ব্যবস্থাকে আমরা মেনে নিতে দ্বিধা করব? ইউরোপের যে মহামারী ধীরে ধীরে আমাদের গ্রাস করে স্থূল আদর্শ ইসলাম থেকে আমাদের দিনের পর দিন দূরে সরিয়ে নিচ্ছে, জ্ঞানের চক্ষু নিয়ে আজও কি সেই মহামারী দূর করব না? আমরা কি সেই মহামারী থেকে বাঁচার ফিকির না করে তাতে গ্রেপ্তার হবারই তদ্‌বীর চালাব?

নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র

বিশ্বস্রষ্টা তাঁর সব সৃষ্টিকেই সব দিক থেকে পূর্ণ করে উত্তম স্বভাবের ভিত্তিতে গড়ে তুলেছেন। প্রতিটি সৃষ্টিকে তার প্রয়োজনীয় সবকিছুই দান করেছেন। যার যে ধরনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রয়োজন, তাকে তাই দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যথাযথ কাজে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা ও শক্তি দান করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বাক্‌শক্তিহীন জীবজন্তুর দাঁত সম্পর্কে চিন্তা করুন। দেখতে পাবেন, সেগুলোর গঠন ও বিন্যাস একেক জীবের একেক রকম। তৃণভোজী জীবজন্তুর দাঁত একরূপ। তা সাদা এবং এতটুকু ধারালো যেন ঘাস চিবিয়ে ও ছিঁড়ে খেতে পারে। আবার মাংসাশী প্রাণীগুলোর দাঁত সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ। তার মাড়ীও সুদৃঢ় করা হয়েছে যেন নিজের আহার্য ঠিকমত পিষে খেতে পারে।

স্থূল কথা, এ ভাবের সব জীবেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে এবং বিশেষ ধরনের কাজই তা দিয়ে সম্পাদন করা চলে। যে শ্রেণীর দৈনন্দিন প্রয়োজনে যে ধরনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপরিহার্য, তাকে তাই দেয়া হয়েছে।

প্রকৃতির ইতিহাস নিয়ে যারা চিন্তা করে, তাদের জন্যে এই প্রাকৃতিক নিয়মটা নর ও নারীর কর্মক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের এবং পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নারীর অনধিকার চর্চা নিষিদ্ধকরণের মস্তবড় দলীল হয়ে দাঁড়ায়। যদি তাদের প্রকৃতিসম্মত কাজের বিরুদ্ধে অন্র কাজে বাধ্য করা হয়, তা হলে এ কথা সুনিশ্চিত যে, কঠিন প্রকৃতি ও কঠোর অংগ-প্রত্যংগের অধিকারী পুরুষদের হাতে তাদের ধরনে নাজেহাল হতে হবে এবং সেজন্যই পুরুষরা তাদের এ পথে নিয়ে আসতে উৎসুক। এরপরে দেখতে পাবে, পুরুষরাই আবার তাদের নির্দয়ভাবে সেই বিপদসংকুল ক্ষেত্র থেকে অপমান করে হাঁকিয়ে দিচ্ছে।

নারীর গঠন গাঠন ও প্রকৃতিই প্রমাণ দিচ্ছে যে, তাদের পুরুষের জগৎ থেকে আলাদা এক জগতে বাস করা অপরিহার্য। তা না হলে তাদের দশা অধ্যাপক জিওম ফ্রেয়ারের কথানুরূপ হবে। মানে, তারা নর ও নারীর মাঝামাঝি তৃতীয় এক জীবের প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে। যার বিশেষ পরিণতি হতাশা, দুর্ভাবনা, স্থায়ী দুর্গতি ও ভূতগ্রস্ত হওয়া বৈ কিছুই নয়।

নারী অনুভূতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে শ্রেণী অবশ্যই দয়া ও প্রেম-প্রীতির বাস্তব প্রতীক বলেই প্রতীয়মান হবে। যদি তাদের প্রকৃতি বা স্বভাব লক্ষ্য করা যায়, তা হলে দেখা যাবে আত্মোৎসর্গ, পরোপকার ও পুণ্য কাজের দিকেই তাদের ঝোঁক। এসব গুণ ও স্বভাব বাইরের সংগ্রামবহুল ক্ষেত্রের জন্যে একেবারেই অনুপযোগী। কারণ, বাইরের দুনিয়া হচ্ছে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, টানাহেঁচড়া, স্বার্থান্ধতা ও বাড়াবাড়ির ক্ষেত্র। এসব অবস্থার সাথে যথাযোগ্যভভাবের নারীরা কিরূপে তাতে অংশগ্রহণ করবে? যেসব জটিলতম সমস্যা ও কঠিনতম সংকটে বড় বড় বীর নায়কদের মাথা ঘুলিয়ে যায়, বুক শুকিয়ে যায়, চোখ ধাঁধিয়ে যায়, সেখানে কোমলপ্রাণা নারীর যাবে মোকাবেলা করার জন্যে কঠোরপ্রাণ হওয়া অপরিহার্য। তাই দয়া-মায়া ও প্রেম-প্রীতির আধার কোমল দেহ ও স্বকি দশা ঘটবে? তাই, যেসব দেশে 'নারী স্বাধীনতা' মেনে নিয়ে তাদের পুরুষের সাথে একত্রে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেখানে নারীদের চরম দুর্গতি দেখলে দয়ার উদ্রেক হয়। বস্তুত, তারা সেখানে বড়ই কৃপার পাত্রী হয়ে আছে। তাদের জীবিকা অর্জনের পন্থা সেখানে বড়ই সীমাবদ্ধ। নারীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচাইতে বড় ভক্ত ও সমর্থক দার্শনিক ফাওরিয়া স্বয়ং এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"নারীরা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়ে বড় বড় কঠিন কাজের দুর্বহ বোঝা বয়ে চলছে এবং চরম অভাব অনটনে ও উপবাস অনশনে তাদের দিন কাটছে।"

মনীষী প্রুধোঁ যে নারীদের কদাচিৎ দরকারী ছোট ছোট কলকজার সাথে তুলনা দিয়েছেন, তা আপনারা অবশ্যই ভুলে যাননি। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সেই 'রিভিউ অভ রিভিউজ' পত্রিকায় লিখেছেনঃ

"নারীরা হাজার খাটুনি খেটেও দিনশেষে অতিরিক্ত বিশ শতাংশ (সেন্টস) উপার্জন করতে পারে, যা তার একবেলা খোরাকের পক্ষেও যথেষ্ট নয় কিছুতেই। এর কারণ কি? এর পরিষ্কার কারণ হচ্ছে এই যে, নারীদের বাইরের ক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষমতা এতই কম যে, পুরুষদের সাথে তারা প্রতিযোগিতা করে এগোতে পারছে না। যদিও কোন নারী একটা ভাল কাজ বাগিয়ে বসে, অমনি সেখানে বেকার পুরুষদের কেউ গিয়ে হাযির হয় এবং কর্মদক্ষতার প্রভাবে বেচারীকে শুধু কোনঠাসাই করে না, বিতাড়নের ব্যবস্থাই করে। এ ভাবে পুরুষরা সবখানেই হতভাগীদের পেছনে ফেলে নিজেদের স্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলোর অধিকার অব্যাহত রাখে। এমনকি সেলাই ও রান্না-বান্নার কাজেও তারা মেশিনাদি আবিষ্কার করে হতভাগীদের বিতাড়নের ব্যবস্থা করেছে।"

নারী স্বাধীনতার সমর্থকরা বলে থাকে, লেডী ডাক্তার, লেডী ইঞ্জিনিয়ার, বড় বড় লেখিকা ও শিক্ষয়িত্রীদের যে খবরাখবর আমরা দিনরাত পাচ্ছি, তারা কি নারী নয়? তার জবাব হচ্ছে এইঃ একেতো এরূপ নারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাও আবার সে সব বিত্তশালী পিতার মেয়ে তারা, যারা মেয়ের ওজন মেপে সোনা খরচ করে তাকে এ পর্যন্ত এনে দিয়েছে। সেরূপ মেয়েদের তো উপার্জনেরও প্রশ্ন আসে না।

পক্ষান্তরে, এদের তুলনায় দরিদ্র ও নিঃস্ব নারীদের সংখ্যা লাখো গুণ বেশী। তাদের ওপরে দৃষ্টি বুলালে যে চরম দুর্গত জীবনের ছবি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, তা বড়ই মর্মান্তিক। তা ছাড়া এও তো ভাববার বিষয় যে, সেসব মহিলা ডাক্তার ও মহিলা ইঞ্জিনিয়াররা কি নারী প্রকৃতি থেকে মুক্তিলাভ করতে পেরেছেন? হয়ত কেউ বলবেন, হ্যাঁ। এ জবাব যদি সত্য বলেও মেনে নেয়া হয়, তা হলে জিজ্ঞাস্য যে, তারা দু'একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে অসংখ্য ভাবী ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের সম্ভাবনা বিলুপ্ত করার চাইতে কি এটাই ভাল নয় যে, তাদের দু'চারজনের ত্যাগের মাধ্যমে শত সহস্র ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার সৃষ্টি হবে?

আক্ষেপের বিষয় এই, যেসব সরলা নারী একদিন 'মা' হবার গৌরবে বুক ফুলিয়ে চলত, আজ তারাই 'মা' হবার নাম শুনলেও কানে আঙ্গুল দিয়ে থাকে। হায়! এ কি আপদ দেখা দিল?

সন্দেহ নেই, নারীর এ বিবর্তন প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল। তাই তাদের প্রকৃতিগত মানবতা এর ফলে বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। যে প্রাকৃতিক অবদান ও আনুকূল্য তাদের মানবতার কল্যাণ ও উন্নতির পরিপোষক করে গড়েছিল, তা তারা বর্জন করে মনুষ্যত্বই হারাতে বসেছে।

বিজ্ঞ লেখক (কাসেম আমীন বেগ) লিখেছেন ঃ

"বিশ্ব সৃষ্টির বিধানের চিরন্তন নিয়ম অনুসারে যেসব নারী নিঃসঙ্গ ও অসহায় জীবন যাপন করতে আজ বাধ্য হচ্ছে তাদের কি উপায় হবে? নিজের জীবিকা ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়ে পড়ে তাদেরকে আজ দু'পয়সা রোজগারের জন্যে কঠোর পরিশ্রমের কাজে হাত দিতে হচ্ছে।"

আমাদের কথা হচ্ছে, ঠিক এমনি অসহায় ও অরক্ষিতা নারীদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজে বাধ্য না করে অন্য কোন উপায়ে বাঁচানো যায় কিনা, সেটাই তো আমাদের বিবেচ্য হওয়া উচিত। বিপন্নকে যদি বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে নিজেরই হাত পা

ছুঁড়তে হল, তা হলে আপনারা নারী দরদীরা তাদের কি হিল্লাটা আর করে দিলেন? প্রকৃত সহানুভূতিশীল সমাজের তো তখন কর্তব্য হবে তাদের যথোপযোগী ব্যবস্থার আঞ্জাম দিয়ে এতিম শিশুদের নিয়ে বাঁচবার একটা সুরাহা করে দেয়া। যে সমাজে এতটুকু সহানুভূতির অভাব, তাদের বলা হয় সভ্য সমাজ! অথচ যে সমাজ এ ধরনের সহানুভূতিপূর্ণ বিধানের ভিত্তিতে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, তারা হবে মধ্যযুগীয় বর্বর সমাজ! বিপন্নকে অধিকতর বিপদে ঠেলে দেয়ার নাম সভ্যতা আর তাকে সুবিধা সুযোগ দেয়ার নাম হবে বর্বরতা!

খোদার দিকে চেয়ে দয়া করে সেই হতভাগী নারীদের ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখুন, যারা বিয়ে শাদির কথা শুনে নাক সিটকিয়ে নকল পুরুষ সেজে নিজ নিজ পেট বাঁচাবার গরজে প্রখর দুপুরে তপ্ত মরুর বুকে দিনভর ছুটাছুটি করে বেলাশেষে একবেলা অন্ন জোটাবার মত পারিশ্রমিকও পাচ্ছে না। এমন কোন নির্দয় রয়েছে, যে সেই দুর্বল দেহ ও স্বভাবের মেয়েদের এরূপ কঠিন নির্যাতন ও দুর্গতিকে সমর্থন করবে এবং তাকে বিংশ শতাব্দীর সোনালী সভ্যতা বলে গলাবাজী করে বেড়াবে?

আমি আগেই বলেছি, নারীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও প্রকৃতি প্রত্যেক দিক থেকেই পুরুষের থেকে পৃথক অন্য কোন দায়িত্ব প্রতিপালনের উপযোগী করেই গড়ে তোলা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, যখন নারী গর্ভবতী হয়, তাদের সে মুহূর্তটি বড়ই সতর্কতার সাথে কাটাতে হয় এবং নিজের প্রতি তার খুবই যত্ন নিতে হয়। এ সময়টিতে তাদের ওপরে বাইরের বহু কিছু, বিশেষ করে ভয়সূচক ব্যাপারগুলো যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বড় বড় গ্রন্থ এর উপর গবেষণা করেই লেখা হয়েছে।

এ কালটি যখন পার হয়ে সন্তান প্রসবের সময় আসে, তখন তারা যথার্থই পীড়িত হয়ে পড়ে। সে সময়ে তারা বিভিন্ন ধরনের জ্বরের শিকারে পরিণত হয়। সে সবের দুঃখ-দুর্দশা কমবেশী তাদের প্রত্যেককেই ভোগ করতে হয়।

এরপরে সন্তান বুকে ধরে দুধ পান করাতে হয়। সেটা হচ্ছে এমনি এক সময়, যখন সেই দুর্বল অস্তিত্বের বাঁচা-মরা নির্ভর করে মায়ের স্তনের ভাল-মন্দের ওপরে।

সে ক্ষেত্রে কোন নারী যদি রাজনীতিতে গা ভাসিয়ে পার্লামেন্টের সদস্যা হয়ে বসেন এবং তিনি গর্ভবতী হয়ে থাকেন, তাহলে পার্লামেন্টে আজ যে ভাবের ঝগড়াঝাটি ও ধস্তাধস্তি হয়ে থাকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বেচারীর দুর্গতিটা দয়া করে একবার ভেবে দেখবেন কি? অথবা যদি সে হতভাগ্য কোন একটা প্রস্তাব নিয়ে দাঁড়ায়

আর বিরুদ্ধ পক্ষ 'শেম' 'শেম' বলে হৈ হল্লা তুলে তাকে নাজেহাল করে বসিয়ে দেয় কিংবা প্রতিপক্ষের কোন শক্তিশালী বক্তা তার প্রস্তাবের অসারতা প্রতিপন্ন করে তাকে সম্পূর্ণ হাস্যাস্পদ করে তুলে এবং গোটা পরিষদ তাকে ধিক্কার দেয়া শুরু করে, তা হলে তার বেদনাদায়ক প্রতিক্রিয়া কি সে বেচারীর গর্ভের সন্তানের ওপরে প্রভাব বিস্তার করবে না? যদি সে সন্তানের মা হয়ে থাকে, তাহলে তার স্তনে কি এসবের বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না?

আক্ষেপের বিষয় যে, খোদা নারীদের নিরুপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। অথচ আজ খোদার শাশ্বত বিধান ও প্রকৃতির চিরন্তন নীতির বিরোধিতা করে তাদের সংগ্রামবহুল জীবনে টেনে আনার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ফলে "যে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করবে, সে নিজেকেই পীড়ন করবে"-খোদার এ বাণীকেই বাস্তবায়িত করা হচ্ছে।

ঠিক আছে, আমরা কিছুক্ষণের জন্যে এ কথাটা মেনে নিলাম যে, গোটা দুনিয়ার সিদ্ধান্ত হল, নারীরা আজ থেকে পুরুষের সব কাজেই সমান যোগ্যতা রাখে। তাতে বিশ্বপ্রকৃতির কতটুকু কি ব্যতিক্রম হল, তা যেন কেউ পরোয়াই করল না। তারা নারীদের পূর্ণ অধিকার দিয়ে দিল পুরুষদের সব কাজ তাদের কাঁধে তুলে নেবার। এখন জিজ্ঞাস্য যে, স্বভাবের ধর্ম (ইস্‌লাম) অনুসারীদের পক্ষেও কি এ স্বভাব বিরুদ্ধ কাজে সম্মতি দান ঠিক হবে? তারা জেনেশুনেও কি দুনিয়ার বিভ্রান্ত জাতিগুলোর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত জনমতের খাতিরে মেনে নেবে? আমরা যদি গোটা দুনিয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে মুসলিম নারীদের জন্য প্রকৃতিসম্মত শান্তিপূর্ণ বিধান ও ব্যবস্থা অনুসরণ করি, তাহলে সেটা কি তাদের ওপরে যুলুম হবে?

আক্ষেপ! আজ যেন চারদিক থেকেই আমাদের আশা ও কল্যাণের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এমনকি আমরা আজ বিজাতির মারাত্মক ব্যাধিগুলোও চোখ বুঁজে নিজেদের ভেতরে গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়ে উঠেছি।

ইতিহাসের সিদ্ধান্ত

পুরুষের কাজে স্থায়ীভাবে নারীর অংশগ্রহণ কোন দেশেই কি সম্ভবপর হয়েছে? এ প্রশ্নের মীমাংসা খোদা তাঁর একটিমাত্র বাণীতেই করে রেখেছেন ঃ

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি খোদার নির্ধারিত সীমালংঘন করবে, সে অবশ্যই আত্মপীড়ক হবে।

যাঁরা ভাঙ্গা-গড়ার পৃথিবীর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস জানেন, তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, প্রকৃতির ধারায় এমনি এক বিশেষ নিয়মনীতি রয়েছে, মানুষ যখনই তার ব্যতিক্রম করতে বা লংঘন করতে চায়, তখন স্বয়ং প্রকৃতিই তা রুখবার ব্যবস্থা করে নেয়। এমনকি তা থেকে হয় মানুষ ফিরে থাকতে বাধ্য হয়, অন্যথায় কৃতকার্যের সাজা ভোগ করে। আদি মানব থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের যে সুদীর্ঘ স্রোত বয়ে আসছে, তা সামগ্রিকভাবে একটা বিরাট শিক্ষা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। প্রতি মুহূর্তে তাদের সঠিক পথ নির্ধারণের প্রয়াসপথে অজস্র শিক্ষা তারা অর্জন করার সুযোগ লাভ করেছে।

আগের অধ্যায়ে এ কথাটা ভালভাবেই প্রমাণ করে এসেছি যে, নারীদের পুরুষের সাথে কার্যক্ষেত্রে অংশগ্রহণ একটা সামাজিক ব্যাধি এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল। তাতে এও যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্রষ্টার বিধানের বিরোধিতা করে উপরে যতই প্রদর্শনীর মহড়া চালানো হোক না কেন, আর যত সুন্দর সুন্দর আবরণই তার ওপরে জুড়ে দিক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা চাপা থাকে না। এ ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে তোলার জন্য আবার আলোচনা করছি।

শুধু আমি নয়, প্রতিটি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত নর ও নারী এ কথাটা ভালভাবেই জানে যে, নারীর ভেতরে এমন একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৌন্দর্য রাখা হয়েছে, যা সে দাম্পত্য জীবন ও মাতৃত্বের ভেতর দিয়েই প্রমাণিত ও প্রস্ফুটিত করতে সমর্থ হয়। তাই তাকে সে ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা মূলত তার পূর্ণত্ব ও সৌন্দর্যের পক্ষেও হানিকর।

আমি খুব ভালরূপেই জানি যে, মানবজাতি দিন দিন উন্নতির পথেই এগিয়ে

চলছে, পিছিয়ে যাচ্ছে না আদৌ। এ উন্নতি তো তদ্দিনই সম্ভবপর হবে, যদ্দিন মানুষ স্বপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই স্ব-স্ব বিধি ব্যবস্থা চালাবে। এ জন্য বলা হয়-কোন জাতিই সফল জাতি হতে পারে না, যতক্ষণ তাদের ভেতরে কাজকর্ম ভাগ করে যথোপযোগী কাজে প্রত্যেককে নিয়োজিত না করা হয়। বিশেষ করে দুই শ্রেণীর ভেতরে তাদের প্রত্যেকের উপযোগী কাজ ভাগ করে নেয়া উচিত। নর ও নারীর দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের ভেতরে কাজ বন্টন করা হবে।

যখন আমরা শুনি যে, অমুক জাতির মেয়েরা ঘর সংসারের কাজ ছেড়ে বাইরে এসে পুরুষের কঠোর কাজে অংশগ্রহণ করছে, তখন যদি আমাদের চোখে দৃষ্টিশক্তি থাকে ও আমাদের মনটা সুস্থির ও সুস্থ থাকে, তা হলে কখনই আমাদের তা সমর্থন বা অনুসরণযোগ্য ভাববার কারণ দেখা দেবে না। পক্ষান্তরে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এটাই হবে যে, তার চাইতে মারাত্মক ও ক্ষতিকর ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। সুতরাং আমাদের সেরূপ পরিস্থিতি থেকে অনেক দূরে সরে থাকতে হবে। কারণ, এ কাজ পূর্ণত্ব ও যথার্থের পরিপন্থী। সে ভ্রান্ত জাতিকে বাইরের থেকে যতই সুখী ও উন্নত মনে হোক, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা যতই বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখাক, তার প্রভাবে পড়ে আমরা কখনই তাদের খারাপ কাজগুলো অনুসরণ করতে যাব না।

পৃথিবীর বুকে যুগে যুগে বহু সভ্যতা জন্ম নিয়েছে। বেশ কিছুদিন এক এক সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জগতজোড়া বিস্তৃতিও লাভ করেছে। গোটা পৃথিবী তাদের ভেল্কিবাজীতে বিস্মিত হয়েছে। গোটা মানব জাতির চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে সে যাদুর খেলা। অবশেষে উন্নতির অহংকারে স্রষ্টা ও তাঁর বিশ্ব প্রকৃতির সাথে টক্কর দিয়ে অকস্মাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে চিরতরে। তারা এমনভাবেই দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিল যে, তাদের নাম-নিশানাও রেখে যেতে পারেনি কোথাও। 'আল মারআতুল জাদীদা'র রচয়িতা স্বয়ং এ সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়ে লিখেছেনঃ

'আমি এ ব্যাপারে একমত যে, স্রষ্টার প্রকৃতি নারীদের শুধু ঘর সংসার ও সন্তান-সন্ততির তদারকের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন এবং গর্ভ, প্রসব, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি স্বাভাবিক ও কঠিনতম ব্রত পালন করে তাদের পক্ষে পুরুষের কাজে অংশগ্রহণ সম্ভবপর নয়। পরন্তু, এ ক্ষেত্রে আমি এও বলে দিচ্ছি যে, সমাজের সবচাইতে উত্তম সেবা নারী দাম্পত্য বাঁধন, সন্তান দান ও তাদের লালন-পালনের ভেতর দিয়েই করে থাকে। আর এটা তো এরূপ প্রকাশ্য ব্যাপার, যা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না আদৌ।'

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কাসেম আমীন বেগও নারীর সাফল্য জীবন মনে করেন দাম্পত্য বাঁধন ও পারিবারিক জীবনের মধ্যেই। তারও বিশ্বাস যে, নারী কারুর স্ত্রী হয়ে সন্তান-সন্তুতির মা হলে এবং তাদের লালন-পালন করলেই সমাজের সব চাইতে উত্তম সেবা করবে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করেই তিনি আবার অন্যদিকে মোড় নিচ্ছেন।

'কিন্তু, ভ্রান্তি তো এখানেই যে, এই বুনিয়াদী দায়িত্ব পালনের উপযোগী শিক্ষা-দীক্ষা, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নিজের সন্তানদের জন্যে উপার্জনের ক্ষমতা লাভ করে, এরূপ শিক্ষা আমরা তাদের দিতে অনিচ্ছুক।'

আমাদের কথা হচ্ছে এই, ইউরোপের সামাজিক জীবন পদ্ধতির সাথে মুসলমানদের জীবনের পার্থক্য হচ্ছে আকাশ-পাতাল। যার কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে, সে-ই ভালরূপে বুঝতে পারে যে, এ দু'টি সমাজ জীবন কোন ক্ষেত্রেই একাকার হয়ে যেতে পারে না। হ্যাঁ- যদি এ দু'টোর যে কোন একটা স্বীয় অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য লোপ করে দিয়ে অন্যটির ভেতরে মিশে যায় কিংবা তার অংশ হয়ে যায়, তাহলেই তাদের ভেতরে ঐক্য দেখা দিতে পারে।

সন্দেহ নেই, বিজ্ঞ লেখক যা লিখেছেন, যদি তা ইউরোপীয় সমাজের জন্যে সেখানকার কেউ লিখতেন, তাহলে সবাই তা চোখ বুঁজে মেনে নিত এবং সবার অন্তরেই তার সাড়া জাগত। অবশ্য তা এ জন্য নয় যে, তার এ কথাটির ভেতরে মানব জীবনের সাফল্যের কোন বীজ নিহিত রয়েছে, বরং ইউরোপীয় সমাজে এমন কোন ঘর নেই, যার কোন নারী পুরুষদের সাথে বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করে না। সেখানে এমন স্ত্রী খুবই দুর্লভ, যে ভবিষ্যতে স্বামীর সাথে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মোকাবিলা করার জন্য আগে থেকেই পুঁজি সংগ্রহের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে না।

পক্ষান্তরে, প্রাচ্যজগতের নারীরা প্রায় সর্বদাই প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের গতিপথ নির্ধারিত করে চলছে। তাই বিজ্ঞ লেখকের মন্তব্যটি প্রাচ্যের মাটিতে খুবই ভাল সাড়া পাবে বলে মনে করার কারণ নেই। এখানে তার কথায় বিরূপ প্রতিক্রিয়াই দেখা দিতে বাধ্য। কারণ, প্রাচ্যজগতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নর-নারীরা তার এ নতুন ধর্ম ও মতবাদকে বড়ই অশুভ লক্ষণ বলে মনে করে। প্রাচ্যের নারীরা পুরুষ জাতি বেঁচে থাকতেই বাইরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে অপারগ হয়েও অংশগ্রহণে বাধ্য হবে, এ তারা ভাবতেও পারে না। তারা তাই জোড়হাতে সর্বদা এ প্রার্থনাই করে থাকেঃ প্রভো! এরূপ দুর্দিন দেখা দেয়ার আগেই আমাদের দুনিয়া থেকে পার করে নিও।

একজন ইউরোপীয়ান এ কথা জানেন যে, তাদের দেশে এমন নারী অসংখ্য রয়েছে, যারা নিজের ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালনের ক্ষমতা আদৌ রাখে না এবং অনটন অনশনে তাদের জীবন এরূপ দুর্বিষহ হয়ে চলছে যে, প্রতি মুহূর্তেই তারা মরণ কামনা করছে। এমন কি বহু নারী তাদের দেশে জঠর তাড়নায় অধীর হয়ে আত্মহত্যা করে ত্রাণ লাভ করছে। তাই তারা যখন বিজ্ঞ লেখক বন্ধুর আলোচনা শুনবে, খুবই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়বে সন্দেহ নেই। সাথে সাথে তার আকুতিও জাগবে প্রাণে-হায়! শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে যথাশীঘ্র এ ব্যবস্থা এসে যেত এবং হতভাগী নারীরা চির বঞ্চনার হাত থেকে দ্রুত মুক্তিলাভ করত!

প্রাচ্যের জনসাধারণ অসুবিধা ভোগ করলেও নারীর এরূপ দুর্গতি দেখার সুযোগ তাদের কমই হয়েছে। (কারণ, এ দেশে নারীরা স্বামী পরিহার করে নিজেই সন্তান নিয়ে স্বাধীন সংসার ফেঁদে বসে না। তাই এদেশে তাঁর মন্ত্রের যাদুকরী প্রভাব দেখা দেয়ার সম্ভাবনা আদৌ নেই বললেই চলে।) তারা বরং সে ধরনের জীবন পদ্ধতি ঘৃণার চক্ষে দেখে আসছে, দেখবেও। বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে ইসলামের মহান প্রভাব মুসলিমদের ভেতরে এ চিন্তাই জাগিয়ে তুলবেঃ হায়! ইউরোপের বিপর্যস্ত নারীদের যদি আমাদের পুরুষরা কোনরূপে ভ্রান্তি ও দুর্গতির বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিতে পারত।

পর্দা প্রথা কি স্বাভাবিক?

আগেই বলে এসেছি, নারীদের স্রষ্টা যে এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, তা অর্জনের প্রয়াস হচ্ছে তাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণ থেকেও এটা দেখিয়ে আসা হয়েছে যে, নারীদের পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ তাদের অতুলনীয় নারীত্বসূলভ বৈশিষ্ট্যকে দূর করে দেয়। সে কঠোর রুটির লড়াই তাদের ভেতরকার সুকোমল বৃত্তিগুলোর পক্ষে হলাহল বৈ নয়। তাই সে কাজ তাদের ধ্বংসের পথই উন্মুক্ত করে দেয়। বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল্যবান সিদ্ধান্তগুলো পেশ করে এ কথাও ভালভাবে প্রমাণ করে এসেছি যে, নারীদের পুরুষের দায়িত্বাধীনে ঘর সংসারের সর্বময় কর্ত্রী করে সন্তান ও অন্যান্যের সেবা-যত্নে নিয়োজিত রাখাই উচিত। স্থূল কথা, এতসব কিছু প্রমাণিত হয়ে যাবার পরে আমার এখনকার বক্তব্য হচ্ছে এই পুরুষের ওপরে নারীদের যে অজস্র দায়িত্ব চাপিয়ে রাখা

হয়েছে, তার বিনিময়ে পুরুষদেরও তো নারীর ওপরে কিছুটা অধিকার থাকা চাই। সে অধিকার হচ্ছে এই যে, নারীরা পুরুষকে চালক মানবে এবং তাদের মাথার তাজ মনে করবে। পুরুষের মাথায় নারীরা এত কঠিন বোঝা চাপিয়ে দিয়েও যদি তার বদলে তাদের স্বাভাবিক অধিকারটুকু মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে সৃষ্টির স্বাভাবিক বিধানেরও অবমাননা করা হবে। আমার ধারণায় তো নারীদের ওপরে পুরুষের এ ন্যায্য প্রাপ্যটুকু সম্পর্কে বেশি কিছু যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে না। এ তো এরূপ প্রকৃতিগত অধিকার যা নারীরা চোখ বুঁজেই যে কোন মুহূর্তে অনুভব করে নেয়। পুরুষরাও স্বভাবত আবহমানকাল থেকেই এ ধারণা সুস্পষ্টত পোষণ করে চলছে।

নর-নারীর এই স্বাভাবিক সম্পর্কের দিক থেকেই বিবেচনা করলে দেখা যাবে, নারীদের ঘরের কাজে চার দেয়ালের ভেতরে আগলে রাখা বা বাইরে টেনে এনে মুক্ত ময়দানে ছেড়ে দেয়া পুরুষেরই দায়িত্ব। তাই তারা যেভাবে চায় নারীকে চালাবে। সে ক্ষেত্রে নারীদের পক্ষে স্বামীদের ওপরে হাজার বোঝা চাপিয়ে দিয়েও তাদের স্বাভাবিক অধিকারটুকু ছিনিয়ে নেবার প্রয়াস একেবারেই বাতুলতা বৈ নয়। আর এরূপ জুলুম দুনিয়ার বুকে কোন দিন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না।

দুনিয়ার সব কাজ-কারবারই চলে বিনিময়ের সাহায্যে। এক বস্তুর বিনিময়ে শুধু আমরা অন্য বস্তু আশা করতে পারি। তাই যে ব্যক্তি নারীর ওপরে পুরুষের অধিকারকে অস্বীকার করে বা সে অধিকারে প্রশ্ন তোলে, সে যেন প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধানের ওপরেই প্রশ্ন তোলে। অবশ্য অজ্ঞতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ প্রায়ই প্রকৃতির বিধানের ওপরেও প্রশ্ন তুলতে অভ্যস্ত। তবে সে প্রশ্ন যে নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়, তাও দিবালোকের মতই সত্য।

বলা বাহুল্য, মানুষ যদি কোন কিছু করার আগে এতটুকু ভেবে নেয় যে, প্রকৃতির বিধানের সাথে তার সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা, তা হলে দুনিয়ার বুক থেকে 'অসম্ভব' শব্দটাই লোপ পেত। কারণ পৃথিবীতে 'অসম্ভব' বলে কোন বস্তুই নেই, যদি তা বিশ্ব প্রকৃতির বিরোধী না হয়।

বস্তুত, নারীকে ঘরে রাখা বা বাইরে নেয়ার অধিকার সর্বতোভাবেই পুরুষদের হাতে ন্যস্ত রয়েছে। তার প্রকাশ্য প্রমাণ তো এটাই যে, যখন কোন নারী স্বাধীনতার জন্য ধ্বনি তোলে কিংবা তাদের কোন দরদী পুরুষ নারী স্বাধীনতার ওকালতি করে, তখন তাদের সব আবদারই পুরুষের কাছে তুলে ধরা হয়। পুরুষকেই প্রতিপক্ষ ধরে

তাদের সংগ্রাম চলে থাকে।

'আল্ মারআতুল্ জাদীদা'র প্রণেতা লিখেছেনঃ

'আমি যা কিছু লিখছি জ্ঞানীদের তথা শিক্ষিতদের জন্যই লিখছি। বিশেষ করে আমি তাদের জন্য লিখছি, যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তাদের ওপরে আমি ভরসা রাখছি আশা পূরণের। তারাই আগামী দিনে আমার স্বপ্নকে করবে বাস্তবায়িত। কারণ, একমাত্র এই আধুনিক শিক্ষিত সমাজই যথার্থ শিক্ষার অধিকারী। তাদের ভেতরে এতটুকু শক্তি জন্মেছে, যা থেকে তারা নারীদের সমস্যাটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে সমর্থ।'

এ কথার অর্থ কি? কাদের কাছে এ আবেদন? নারীদরদী বন্ধুর এ আরজনামা পড়েও কি কেউ এ কথা অস্বীকার করবে যে, নারীদের স্বাধীনতা দেয়া বা নেয়ার বাগডোর পুরুষদেরই হাতে রয়েছে? এতেও তো বুঝা যাচ্ছে যে, নারীদের পরিচালনার ক্ষমতা পুরুষদেরই। যদি তা না হয়ে নারীদের হাতেই সে অধিকার থাকত, তাহলে বিজ্ঞ লেখক নারীদের উদ্দেশ্য করে বলতেন ঃ হে নারী সমাজ! পুরুষের দাসত্বের জিঞ্জির পা থেকে চূর্ণ করে ছুঁড়ে ফেল।

তাছাড়া নারীরাই বা নিজেদের দাবি-দাওয়া পুরুষ উকিলের কণ্ঠে তুলে দিচ্ছে কেন? কেন তারা সভা-সমিতি করে পুরুষদেরই কাছে আবেদন নিবেদন জানাচ্ছে? তারাই তো পুরুষদের খপ্পর থেকে ছুটে পালাতে পারে।

আদপে, যারা নারীদের পুরুষের খপ্পর থেকে বাঁচাবার জিগির তোলে, তাদের এ কাজের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে কোন দুর্বলতম পরাধীন জাতির সকলতম প্রভুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ব্যর্থ হৈ হল্লার সাথে। কারণ, যতদিন পর্যন্ত সে দুর্বলতম জাতি নিজেদের ভেতরে স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণের যোগ্যতা সৃষ্টি না করবে, তদ্দিন তাদের সে আন্দোলন একেবারে নিরর্থক। তাই এ ভাবের নারী স্বাধীনতার আন্দোলন যে শুধু নিরর্থকই নয়, অমূলকও, তা না বললেও চলে। কারণ, নারীদের স্বভাবই পুরুষ থেকে স্বাধীন হবার নয়। সুতরাং তাদের দরদী উকিলদের স্বপ্ন যে চিরদিন স্বপ্নই থেকে যাবে, সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার কোনই কারণ থাকতে পারে না।

আমার উপমাটা এখানে অবশ্য যথাযথ সম্পূর্ণ নয়। কারণ, দুর্বলতম পরাধীন জাতিরও তো কোন একদিন স্বাধীন হবার সম্ভাবনা থাকে। আজ হোক কি কাল, একদিন তারা স্বাধীনতা অর্জনের যোগ্যতা ও সুযোগ লাভ করবেই। কিন্তু, নারীদের

অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। নারীদের বৈশিষ্ট্যই দাবি করে পুরুষদের সহায়তা। পুরুষরা তাদের খোরপোষ ও আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করুক এবং তাদের রুজী রোজগারের কঠিন সংগ্রাম থেকে বাঁচিয়ে রাখুক, এটাই তাদের স্বাভাবিক দাবি।

বলা বাহুল্য, এ বিরাট দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে পুরুষরা নারীদের ওপরে অবশ্যই কিছু দাবি রাখে। তা কি? তা হচ্ছে এই যে, নারীরা তাদের সংরক্ষণ ও পরিচালনের দায়িত্ব পুরুষের ওপরেই ছেড়ে দেবে।

এতদ্‌সত্ত্বেও আমি বলছি না যে, নারীরা পুরুষের হাতছাড়া হয়ে বাঁচতে পারে না। তবে, সেক্ষেত্রে পুরুষ কখনও নারীদের দায়িত্বের বোঝা বইতে যাবে না। পরন্তু, নারীদেরই নিজ স্কন্ধে জীবিকা থেকে শুরু করে সবকিছুই বয়ে চলতে হবে। নিঃসন্দেহে তারা বাইরের কঠিন জীবন সংগ্রামে লিপ্ত ও বিপর্যস্ত হতে বাধ্য হবে। ফল দাঁড়াবে এই, আদিম বর্বর যুগের নারীদের এবং এ যুগের বর্বর জাতির নারী সমাজের মতই তারা রাস্তাঘাটে অসীম লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করে চলবে। তবুও যদি নারী দরদীরা চায় যে, সভ্যযুগের সভ্যজাতির নারীদেরও আদিম বর্বরতার শিকারে পরিণত করতেই হবে, তাদের সীমাহীন লাঞ্ছনা ও অনাচার ব্যাভিচারের জাহান্নামে পৌঁছে দিতে হবে, তাহলে আমাদের আর কিছু বলার থাকতে পারে না। আমরা তখন শুধু খোদার কাছে এ প্রার্থনাই জানাবঃ প্রভো! এ বালা অন্তত আমাদের ওপরে নাযিল করো না।

আজ যে সব দেশের নারীদের সম্পর্কে জোর গলায় প্রচার করা হয় যে, তারা সবচাইতে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে চলছে, তলিয়ে দেখলে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, তাদেরও সে স্বাধীনতার বাগডোর পুরুষের মুঠোয় রয়েছে। মানে, যদি এই মুহূর্তে সে দেশের পুরুষরা ইচ্ছা করে যে, নারীদের চার দেয়ালের ভেতরে আটকে রাখবে, তাহলে নারীদের সে ইচ্ছার সামনে মাথা নোয়ায়ে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। যেভাবে তারা আবহমানকাল ধরে পুরুষের আনুগত্য মেনে আসছে, এখনও তাতে বিন্দুমাত্র অমত করতে পারবে না। এ তো হচ্ছে এরূপ একটা স্বাভাবিক ও চিরন্তন সত্য যা তারা মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য রয়েছে হাজার বার। তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যাবে তাদের মনের নিভৃত কোণে কি কথা পাথর খোদাই হয়ে আছে।

'আল্ মারআতুল জাদীদা'র রচয়িতা লিখেছেনঃ

'পুরুষের এরূপ অবস্থা ঘটলে যখন গণ্ডগোল সৃষ্টি হওয়া অবধারিত ছিল, তখন নারীদের স্বাধীনতা কেন পর্যুদস্ত করা হয় এবং পুরুষের স্বাধীনতাকে মর্যাদার চোখে দেখা হয়? নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতির মানদণ্ড কি দু'ধরনের হবে নাকি? প্রত্যেক স্বাধীন সত্তার কি এ অধিকার নেই যে সে ইচ্ছেমত চলবে? হ্যাঁ- সে ক্ষেত্রে শুধু এই শর্ত থাকবে যে, তার স্বাধীনতা যেন খোদায়ী ও রাষ্ট্রীয় আইনের আওতা ছাড়িয়ে না যায়।'

আমার মত তো এ ব্যাপারে এই যে, এটাও হচ্ছে সেই দুর্বলতম জাতির সবলতম প্রভুর বিরুদ্ধে ব্যর্থ শোরগোল সৃষ্টির মত। তারাও তো এভাবে চিৎকার দিতে থাকে যে, মানুষের যখন অধিকার রয়েছে যার যার পথে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাবার, তখন দুর্বল জাতিকে কেন সবল জাতিরা এগোতে দিচ্ছে না? কেন তারা অন্যায়ভাবে তাদের পথ আটকে থাকে? কেন বিজয়ী জাতি বিজিত জাতির জন্য পথ ছেড়ে দেয় না? তাদের ভেতরে কি ইন্‌সাফ বলতে কিছু নেই? বিজিত ও বিজয়ী জাতির অধিকার কি ভিন্ন? প্রতিটি স্বাধীন সত্তাকে কি আইনের আওতার ভেতরে থেকে সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করে দেয়া হয় না? ইত্যাদি।

এখন কথা হচ্ছে যে, এ সব যুক্তি শুনে যদি বিজয়ী জাতিরা ভড়কে গিয়ে বিজিত জাতিগুলোকে তক্ষুণি মুক্তি দিয়ে দিত, তাহলে অবশ্য আশা করা যেত যে, নারীদের যুক্তি শুনে পুরুষেরাও মুষড়ে পড়ে তাদের এক্ষুণি মুক্তি দিয়ে দিবে বলগাহারা হয়ে বেড়াবার জন্য।

আদপে তাদের এসব শানানো যুক্তি কাজে লাগছে না কেন? কারণ হচ্ছে, প্রকৃতির রহস্য পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করে এবং মানব জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, দু'টি বস্তুর ভেতরে সাম্য প্রতিষ্ঠা শুধু তখন সম্ভবপর, যখন উভয়ের ভেতরে সবদিক থেকেই সমতা বিরাজ করে। এতো এরূপ একটা স্পষ্ট কথা যা সবাই নিজ নিজ জীবনের কার্যকলাপে এবং অন্যান্য জাতির কার্যধারা দেখে অজস্র প্রমাণের সাহায্যেই বুঝতে পারে।

এ জন্যই যে কোন ক্ষেত্রে সাম্যের প্রশ্ন তুলবার আগে আমাদের দেখা উচিত যে, বাইর ও ভেতরগত দিক থেকে তাদের ভেতরে সাম্য রয়েছে কিনা। অবশ্য এ প্রশ্ন তোলার আগেই একদল বন্ধু স্রষ্টাকে দোষারোপ করতে লেগে যাবে। তাকেই হয়ত যালেম বলে বসবে তারা, কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত যে, গোটা সৃষ্টিজগতের প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির ভেতরে পার্থক্য সৃষ্টি আদৌ অবিচার নয়। অবিচার

হচ্ছে, দুই বিপরীতধর্মী সৃষ্টিকে স্বভাবের বিরুদ্ধে জবরদস্তির সাথে এক করে দেবার প্রচেষ্টা।

এ ধরনের প্রয়াস ব্যর্থ ও নিরর্থক হবার কারণ যা বললাম তাই-ই নয় শুধু, আরও কারণ রয়েছে তা ছাড়া। তা হচ্ছে এই যে, এ ধরনের কথাবার্তা আসল ব্যাপারের সাথে কোন সংযোগই রাখে না। আসল কথা হচ্ছে যে, নর ও নারীকে স্রষ্টা স্বয়ংসম্পূর্ণ দু'টি শ্রেণীরূপে সৃষ্টিই করেননি, বরং দু'টো অসম্পূর্ণ অস্তিত্ব মিলে মিশে একটা সম্পূর্ণ সত্তার কাজ দেবে-এ ভাবেই সে দুই শ্রেণীকে তিনি গড়েছেন। তাই দেখা যায় যে, পুরুষ জাতির ভেতরে এমন কতকগুলো অভাব রেখে দেয়া হয়েছে, এমন সব দিক থেকে তাদের অসম্পূর্ণ রাখা হয়েছে, যা একমাত্র নারীর সংযোগেই পূরণ হতে পারে। সেভাবেই নারীদের ভেতরেও এমন কতকগুলো অভাব ও অসম্পূর্ণতা রাখা হয়েছে, যা একমাত্র পুরুষের দ্বারাই পূর্ণ হতে পারে।

অবশ্য এ জন্য পরস্পর সম্পূরক শ্রেণী দু'টোকে সজাগ থাকতে হবে যার যার অভাব সম্পর্কে এবং একে অপরের থেকে তা পূরণ করে নেবার মনোভাব রাখতে হবে দাম্পত্য জীবনের ভেতর দিয়ে। মানব সভ্যতা ও জীবন ধারার সামগ্রিক রূপ সুবিন্যস্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। কোনদিক থেকেই আর শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে না।

বস্তুত, যেদিন উভয় শ্রেণী নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝবে, বুঝতে পারবে একে অপরের ওপরে অধিকারের গুরুত্ব, তখনই গোটা পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ নেমে আসবে সন্দেহ নেই। তখন দেখা যাবে যে, এ দুই শ্রেণীর ভেতরে বিভেদ সৃষ্টি করার ও উভয়কে স্বতন্ত্র করে দেখবার প্রয়াস কতই হাস্যকর ছিল। আমি তো বুঝতেই পারি না, যে দুই শ্রেণীকে পরস্পর সম্পূরক করে গড়া হয়েছে গোটা মানব সমাজের পূর্ণরূপ বিকাশের জন্য, তাদের পৃথক পৃথক রেখে মানব সমাজ কিভাবে অক্ষুন্ন থেকে পূর্ণতা লাভ করতে পারে? হাইড্রোজেন থেকে অক্সিজেন স্বতন্ত্র করে নিলে পানির অস্তিত্ব যে রূপ লয় পায়, এরূপ ক্ষেত্রে মানব সমাজও যে তেমনি লয়প্রাপ্ত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? তাছাড়া পরস্পর নির্ভরশীল দু'টো সত্তা কিভাবে সমতার দাবি করতে পারে? কিভাবে তাদের একে অপরের থেকে মুক্ত ও স্বতন্ত্র ভাবতে পারে? হ্যাঁ, যদি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে ভিন্ন করে দিয়ে পানি পানের আশা করা যায়, তাহলে অবশ্য নর থেকে নারীকে পৃথক করে মানব সমাজ টিকিয়ে রাখা যেতে পারে এবং এ সংসার সুখের হতে পারে।

হ্যাঁ-এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কেউ হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারেন যে,

পয়লা অধ্যায়ে তুমি নর ও নারীকে খোদা পৃথক পৃথক কাজের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকৃতি ও প্রকৃতি দিয়ে গড়ে তুলেছেন বলে প্রমাণ করে এসেছ। এখন আবার তার বিপরীত কথা শোনাচ্ছ কেন?

তার জবাব দিচ্ছি। পয়লা অধ্যায়ে আমি একজন কেমিষ্ট সেজে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পৃথক সত্তা ও অস্তিত্বের বিশ্লেষণ করেছি। সেখানে উভয়ের ভেতরকার সম্পর্ক দেখানো হয়নি। সেখানে শুধু দেখানো হয়েছে কার ভেতরে কোন ধরনের কাজ করার কতটুকু ক্ষমতা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে সেগুলো কোন রূপ নেবে তা দেখানোর প্রয়াস সেখানে ছিল না। সেখানে শুধু দেখানো হয়েছে যে, মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় পুরুষের অবদান বেশী। কারণ, তাদের ভেতরে সভ্যতা সৃষ্টির ক্ষমতাও বেশি। যে কোন রাসায়নবিদ এ কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলবে- হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পৃথক গুণাগুণ বিচার করে দেখা গেল যে, পানি সৃষ্টির ক্ষেত্রে অক্সিজেনের চাইতে হাইড্রোজেনের ক্ষমতা অনেক বেশি। আমি যে রূপ বলছি যে, মানবতার সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে নারীকে পুরুষের তুলনায় স্বাধীনতার প্রশ্নে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে বেশি; ঠিক তেমনি একজন রাসায়নবিদও বলছেন যে, পানিসৃষ্টির মৌলিক স্বার্থে হাইড্রোজেনের তুলনায় অক্সিজেনের ত্যাগ স্বীকার করতে হয় বেশি। এর মানে তো আর এটা হবে না যে, হাইড্রোজেন অক্সিজেনকে বাদ দিয়েই পানি সৃষ্টি করতে সক্ষম?

এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, তথাকথিত নারী দরদীরা পুরুষের আধিপত্যে নারীর অবস্থানটা আদৌ ভাল মনে করে না। সেটাকে তারা দাসী ও বন্দী জীবন বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু, তারা মুহূর্তের জন্যও ভেবে দেখতে রাজি নয় যে, পুরুষরা নারীদের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থার জন্য দিনরাত কিভাবে মজুর খেটে চলছে। তারা তো নারীদের মুখ চেয়েই স্ব-স্ব জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। অথচ পুরুষের এ সীমাহীন ত্যাগের যেন কোন মূল্যই নেই।

যদি আমরা এক পাল্লায় নারীদের স্বার্থে পুরুষের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিটা তুলে দিই এবং অপর পাল্লায় তার বিনিময়ে নারীর শুধুমাত্র আনুগত্যের আত্মিক স্বীকৃতিটা রাখি, তাহলে পরিষ্কার দেখা যাবে যে, পুরুষের ত্যাগ ও সেবার পাল্লা অনেক ভারী হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, উভয়ের ব্রতকে দু'দিকে রেখে বিচারে বসলে যে কেউ বলে দেবে যে, নারীর দাসীবৃত্তি শুধু মৌখিকই। মূলত পুরুষই হচ্ছে নারীর চির গোলামের গোলাম।

হ্যাঁ-অনেক সময়ে দেখা যায় যে, নারীর ওপরে পুরুষের প্রাধান্যের ফলে কোথাও বা তারা নিপীড়িত হয়ে থাকে, অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করে থাকে। কিন্তু, তা মূর্খতার দরুন। উভয়ের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তিই সে জন্য দায়ী।

পক্ষান্তরে শিক্ষিত দম্পতিরা একে অপরকে যথেষ্ট মর্যাদার চোখে দেখে থাকে এবং তাদের পারস্পরিক প্রেম প্রীতির সংসার বড়ই মধুর হয়ে থাকে। তারা স্বভাবতই নীরবে যে যার দায়িত্ব প্রাণপণে প্রতিপালন করে চলে। তাই তাদের কল্পনায়ও কোন তথাকথিত নারী স্বাধীনতা ঠাঁই পায় না। তারা ভাল করেই জানে যে, তারা একে অপরের সম্পূরক-পরস্পর নির্ভরশীল। তাই উভয়ের মিলনে মানবতার পূর্ণরূপ বিকাশ পাবে, অন্যথায় নয়। সুতরাং উভয়ের ভেতরে ছাড়াছাড়ি অসম্ভব। সে কল্পনা অবাস্তব স্বপ্নবিলাস মাত্র।

যখন আমরা ভালভাবেই জানতে পারলাম যে, নর-নারীর ভেতরে রয়েছে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং অর্ধাঙ্গিনী নারীরা পুরুষের অর্ধাঙ্গের সম্পূরক হয়ে আবহমানকাল থেকে পূর্ণ মানব সমাজ সৃজন করে চলছে, তখন এ কথাটাও মেনে নিতে বাধ্য যে, এদের ভেতরকার সব কাজই হবে পারস্পরিক সমঝোতার ভেতর দিয়ে। একে অপরের সাথে বিদ্রোহ ঘটিয়ে কিছু করতে পারে না, পারার উপায়ই নাই। সুতরাং নারীদের চারদেয়ালের ভেতরে পর্দা করে চলার প্রশ্নটা পারস্পরিক দায়িত্ব বন্টন ও তদজনিত সমঝোতার ওপরে নির্ভরশীল। (সে ক্ষেত্রে পর্দা স্বভাবতই যে নারীর কর্মক্ষেত্রের সীমারেখা হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে তা না বললেও চলে। কারণ, পুরুষ জাতির আওতায় থেকে তারা স্বদায়িত্বই প্রতিপালন করতে বাধ্য থাকবে। হ্যাঁ-যে পুরুষ স্বদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজে টেনে নেবার মত পোষণ করবে, সে অস্বাভাবিক কাজই করবে সন্দেহ নেই।)

এখানে আরেকটা প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তা হচ্ছে যে, পর্দা প্রাচীর তো আসলে অবমানিত বন্দী জীবনের পরিচায়ক। তাই, পর্দা প্রাচীরে আবদ্ধ রেখে দুনিয়ার সব কিছু থেকে নারীদের দূরে হটিয়ে রাখলে, তাদের পূর্ণ রূপ বিকশিত হবার সুযোগ থাকবে কি করে? পর্দা কি তাদের উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না? যদি তা সত্য হয়, তাহলে পর্দা প্রথা চিরতরে লোপ পাবার দিন কি অত্যাসন্ন নয়? এসব প্রশ্নের জবাব আসছে অধ্যায়ে আপনারা পেয়ে যাবেন।

বন্দী জীবন বনাম স্বাধীন জীবন

গত অধ্যায়গুলোতে আমি বিস্তারিতভাবে নারীর স্বরূপ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে এসেছি। আমি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ প্রচুর দলিল প্রমাণ সংগ্রহ করে ভালভাবে দেখিয়ে দিয়েছি যে, নারী জীবনের সার্থকতা শুধু তাদের স্বদায়িত্ব সম্পাদনের ওপরেই নির্ভরশীল, অনধিকার চর্চায় নয়। আমি এও দেখিয়ে এসেছি যে, নর-নারীর কর্মক্ষেত্র একাকার করে নেবার ফলে তথাকথিত সভ্যদেশগুলোতে কত সব অনাচার ও আপদ-বিপদ দেখা দিচ্ছে।

এ অধ্যায়ে আমার ইচ্ছে রয়েছে যে, নারীর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দাবি এবং তাতে পুরুষদের অহেতুক প্রভাব বিস্তার থেকে ফিরিয়ে রাখার একমাত্র উপায় ও হাতিয়ার নির্দেশ করব-ইন্‌শা আল্লাহ্!

এখন আমরা এমন একটা জটিল "সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করছি, যা মানব জাতির অর্ধাঙ্গ নারীর অধিকার সম্পর্কিত।

যখন আমরা স্বাধীনতার মত মানব জীবনের এমন একটা জটিল সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা ও বিচার বিবেচনা করতে বসেছি, তখন আর আমাদের ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষণভংগুর ঐশ্বর্য ও চাকচিক্যের দাপটে বিভ্রান্ত হলে চলবে না। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমাদের অনেক কিছুই জানতে, শুনতে ও প্রত্যেকটি ব্যাপারকে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে ভালভাবেই যাচাই করে নিতে হবে। হঠাৎ করে কোন কিছুর ওপরে মতামত দিয়ে ফেলা আদৌ ঠিক হবে না।

এ ভূমিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ইউরোপীয় নারীদের বাইরের চাকচিক্য ও ঠাঁট দেখে এবং তাদের বিশেষ কোন ক্ষেত্রে সাময়িক সুবিধা সুযোগ দেখেই সেটাকে খাঁটি ও স্থায়ী ভেবে ভুল করলে চলবে না। মানব জীবনে এরূপ বহু মায়া মরীচিকার মাঝে মাঝে আবির্ভাব ঘটে, যা তাদের বিভ্রান্ত করে অনেক দূরে নিয়ে পরিশেষে চরম হতাশা ও ব্যর্থতার সাথে ফিরিয়ে দেয়। হঠাৎ ব্যাঙের ছাতার মত এ পৃথিবীতে বহু মত ও পথ গজায়, যার আপাত চাকচিক্য ও নতুনত্বের মোহে অন্ধ হয়ে একদল মানুষ সেদিকে ছুটে যায়। কোনটা বা দু'চার দিন বেঁচে থেকে দুনিয়াবাসীকে চমৎকার এক ভেল্কিবাজী দেখিয়ে যায়। যখন মানুষ কালের বিবর্তনের সাথে সাথে মোহমুক্ত হয়ে

উঠে, তখনই তার খেলা শেষ হয়ে যায়। কারণ, সে সব ব্যাঙের ছাতার পৃথিবীর মাটির সাথে তেমন যোগ নেই। সে সব আদর্শ মানবের চিরন্তন স্বভাবের পরিপন্থী।

পৌরুষ তো এমনি এক শক্তি, যা ক্ষণিকের জন্য ধূলায় লুটিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু স্থায়ী ভাবে সেখানে গড়াগড়ি যেতে পারে না। পুরুষ মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু চিরতরে তাদেরকে বেড়াজালে আটকিয়ে রাখার ক্ষমতা মারাত্মক বিভ্রান্তিরও নেই। ক্ষণভংগুর বস্তুর মত শানে আছাড় খেলেই তারা চুরমার হয়ে যায় না। একদিন না একদিন তাদের ভেতর সত্যের আলো জ্বলে ওঠে। সঠিক পথের সন্ধান তারা বিলম্বে হলেও পেয়ে থাকে।

তাই বলছি, নারী স্বাধীনতার যে মায়া মরীচিকা আজ কিছু পুরুষকে বিভ্রান্ত করে চলছে, বিলম্বে হলেও তারা একদিন তার বিষময় প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবে। এমন দিন বেশি দূরে নয়, যখন এই নারী স্বাধীনতাকে চিরতরে গোর দেয়া হবে। শুধু তাই নয়, নারীর স্বাভাবিক অধিকারকেও তারা ছিনিয়ে নিয়ে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। তাদের সর্ববিধ আযাদী সে প্রতিবিপ্লবের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধের শাশ্বত বিধান।

যারা গোটা মানব জাতির ইতিহাসের ওপরে সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করবে না, তারা আমার এ দূরদর্শিতাকে কবিদের অসার হুংকারের মতই নিরর্থক মনে করবে। তবুও একদল বহুদর্শী লোক রয়েছেন যাঁরা আমার এ প্রাকৃতিক বিবর্তনের চিত্রকে নিখুঁত ও অভিজ্ঞতা প্রসূত বলে মনে করবেন। এমনকি, তাঁরা একে মানব ইতিহাসের চিরাচরিত রীতি বলেই মেনে নিবেন।

এ ব্যাপারে আমি রোমক সাম্রাজ্যের চিত্রটা তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করি। নবীন ইউরোপের জননী সেই রোমক সাম্রাজ্যের কথা বলতে যাচ্ছি, যার রাজধানী রোম শহরেই খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল। গোড়ার দিকে এ সাম্রাজ্য ছিল ক্ষুদ্রতম একটা দরিদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র মাত্র। এরপরে শতাব্দীর ভেতরে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গোটা দুনিয়ার উপরে অশেষ প্রভাব বিস্তার করে ফেলল। সাথে সাথে তাদের সাম্রাজ্যও বেড়ে চলল দিনের পর দিন। নবীন ইউরোপের জননী সেই রোমক সভ্যতাও নারীদের পর্দায় আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর 'এন্‌সাইক্লোপেডিয়ায়' লেখা রয়েছেঃ

'রোমের নারীরাও এভাবে পুরুষের পছন্দ মোতাবেক কাজ করত। তারা তাই সর্বদা ঘরকন্যা করাকেই জীবনের ব্রত মনে করে নিয়েছিল। তাদের স্বামী ও

বাপ-ভাইরা সংগ্রাম ক্ষেত্রে জীবন মরণের খেলায় মেতে চলত। ঘরকন্যার কাজ শেষ করে অবসর সময়টুকু তারা সেলাই ও বুননের কাজে কাটিয়ে দিত। তারা খুব কঠোর পর্দা প্রথার অনুসারী ছিল। এমন কি, তাদের ভেতরে যারা ধাত্রীর কাজ করত, তারাও ঘর ছেড়ে বেরোবার সময়ে মোটা কাপড়ের বোরখা দিয়ে গোটা শরীর আচ্ছাদিত রেখে বেরুত। বোরখার উপরে আবার তারা এরূপ একটা লম্বা চাদর জুড়ে দিত, যা তাদের পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে দিত। এ চাদরের ওপরেও আর একটা 'আবা' জুড়ে দেয়া হত। যার ফলে তাদের রূপ তো দূরের কথা, আকৃতিও বুঝবার সাধ্য ছিল না।'

যে যুগে রোমক নারীরা পর্দা করছিল, সে যুগে রোমকরা ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম উন্নত পর্যায়ে অধিষ্ঠিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তি, মান মর্যাদা- এক কথায় সব দিক থেকেই তারা ছিল দুনিয়ার বুকে অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠ জাতি। গোটা দুনিয়া তাদের শৌর্য বীর্য ও ঐশ্বর্যের কাছে ছিল নেহাৎই নগণ্য।

কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতি, শৌর্য বীর্য, সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য তাদের ভেতরে এনে দিল বিলাস ও বিভ্রান্তির চরম পর্যায়। আর তারই প্রবাহে গা ভাসিয়ে তারা নারীদের ভোগ বিলাসের অনুপম সামগ্রী হিসেবে ঘরের চারদেয়াল থেকে বের করে নিয়ে এল মুক্ত ময়দানে। তাদের প্রমোদ ভ্রমণের সঙ্গিনী, মদিরা পাত্র সরবরাহকারিণী, বিভিন্ন আখড়ায় ক্ষণিকের আনন্দদায়িনী হয়ে চলল নারী। নারী তখন থেকে পর্দা-প্রাচীর থেকে পেল মুক্তি। কিন্তু তাদের মুক্তির স্বরূপ কি? এ যেন পাঁজর ছেড়ে মুক্ত হাওয়ায় প্রাণের মুক্তিলাভ।

পরিণাম দাঁড়াল এই, সেই শিকারীর দল (পুরুষ জাতি) সুযোগ পেল মুক্ত মাঠে তাদেরে কামনার শিকারে পরিণত করতে, তাদের পবিত্র চরিত্রে চির কলঙ্কের কালিমা লেপন করতে, আর তাদের প্রকৃতিগত লজ্জা শরমকে চিরতরে নির্মূল করতে। এমন কি, যারা একদিন সাত পাল্লা আবরণের নিচে নিজেদের লুকিয়ে রাখত, তারা পুরুষের সাথে মুক্ত ময়দানে থিয়েটারে অংশগ্রহণ শুরু করল। পুরুষরা তাদের যথেচ্ছা ব্যবহার করতে শুরু করল। বল নৃত্য ও গানের আসর জমিয়ে নারীদের সেখানে আমদানি করা শুরু হল।

এভাবে এগোতে এগোতে নারীদের তারা এমন স্তরে পৌছাল যে, গোটা দেশে নারীদের প্রভাব ও আধিপত্য এমন কি পুরুষদের থেকেও বহুগুণ বেড়ে গেল। পুরুষদের রাষ্ট্রনায়ক বা পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়েও শেষ পর্যন্ত নারীদের কৃপাদৃষ্টির ওপরে নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়াল। তাদের সামান্য ইঙ্গিতে কারুর মাথার

রাজমুকুট খসে পড়ত, আবার তাদের ইঙ্গিতেই তা অপর কারো মাথায় শোভা পেত।

ব্যাস! এ অবস্থা চরমে পৌঁছার সাথে সাথেই তাদের পতন ও ধ্বংস শুরু হল। ফলে অচিরেই তারা এরূপভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল যে, ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই তা দেখে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে থাকে। বস্তুত, ভেবে হয়রান হতে হয় যে, কি করে সেই বিশাল রোমক সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় গাঁথুনির ইটগুলো দুর্বল নারীদের কোমল হাত একে একে খসিয়ে ফেলল এবং তাদের বিরাট সাম্রাজ্য সৌধটি চিরতরে ধূলায় মিশিয়ে দিল।

আমি জিজ্ঞেস করছি, নারীরা এ বিরাট বিপর্যয় ও ধ্বংস কি সজ্ঞানে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ডেকে এনেছিল? কখনও নয়। সে ব্যাপারে তাদের অপরাধ ছিল না আদৌ। কথা হল যে, তাদের পর্দা প্রাচীর থেকে মুক্ত ময়দানে এনে ছেড়ে দেয়ায় স্বভাবতই বাইরের কর্মরত পুরুষরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এ আকর্ষণই তাদের ঈর্ষা, ঝগড়া, এমনকি মারামারি কাটাকাটির স্তরে নিয়ে পৌঁছাল। এ হচ্ছে এমনি এক ঐতিহাসিক সত্য যা মানতে কেউই দ্বিমত করতে পারে না। মনীষী লুই পেরুল 'রিভিউ অভ রিফিউজের' একাদশ খণ্ডে 'রাজনৈতিক কোন্দল' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেনঃ

'রাজকীয় কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক মূলনীতিতে যত রকমের অনাচার ও অরাজকতা দেখা দিয়েছে, তার মূল কারণ সব যুগেই একরূপ দেখা যাচ্ছে। যা ভেবে সবচাইতে বেশি বিস্মিত ও হতভম্ব হতে হয়, তা হচ্ছে এই যে, অতীত যুগেও রাষ্ট্রীয় ও নীতিগত বিপ্লব বিবর্তনের মূলে যে কারণ সক্রিয় ছিল, আজও হুবহু সে কারণই দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ যত সব উঁচু পর্যায়ের নৈতিক অবনতি ও বিপর্যয়ের ব্যাপারে নারীর রহস্যজনক হাতই বেশী কাজ দিয়েছে।'

কিন্তু আমার ধারণায় বিজ্ঞ প্রবন্ধকারের গোটা দোষ নারীর কাঁধে চাপিয়ে না দেয়াই ভাল ছিল। কারণ, নারীরা আপন থেকে কোন দিনই ধ্বংসকামী হতে যায় না। সে সব হচ্ছে স্বার্থ শিকারী পুরুষদের ব্যাপার। অবশ্য তারা তাদের সে চক্রান্ত জাল বিস্তারের ক্ষেত্রে নারীদের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে থাকে।

বিজ্ঞ প্রবন্ধকার কিছুদূর এগিয়ে আজকের ভয়াবহ পরিস্থিতিকে রোমক সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সৃষ্ট পরিস্থিতির সাথে তুলনা করে দেখাতে শুরু করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

'রোমের গণতান্ত্রিক সরকারের পরবর্তী যুগে শাসকমণ্ডলী ও মন্ত্রণা পরিষদের সদস্যরা লাস্যময়ী ও বিলাসপ্রিয় নারীদের নিয়েই মত্ত থাকতেন। এ ধরনের নারী সে যুগে যথেষ্ট পাওয়া যেত। ঠিক সেদিনের সে অবস্থা আজও দেখা যাচ্ছে। আজও নারীদের দিকে চাইলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তারা বিলাস ব্যসনে যেন আপাদমস্তক ডুবে চলেছে। এ নেশা তাদের প্রায় মাতাল করে তুলেছে।'

এখন বলুন দেখি, যে রোমক জাতি একদিন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বদৌলতে মর্যাদা ও উন্নতির উচ্চতম মার্গে অধিষ্ঠিত ছিল। তারা অবশেষে গৌরবময় অতীতকে বিস্মৃত হয়ে কেন এরূপ ধ্বংসের অতল গুহায় পা বাড়াল? এতখানি উন্নতি ও মর্যাদার আসন পেয়েও এরূপভাবে বিপর্যয়ের চরম স্রোতে গা ভাসাতে তাদের কি একটুও লজ্জা হল না? কি করে এ কথা কল্পনা করা যায় যে, যারা তাদের সভ্যতা ও উন্নতির যুগে নারীদের এত কঠোর পর্দায় বন্দী রাখত, শেষ পর্যন্ত তাদের তারা এতখানি মাথায় চড়িয়ে দিল যে, বাদশাহ্ উযীর, সব কিছুই তাদের ইংগিতে বসতো আর উঠতো! এরূপ বিস্ময়কর পরিবর্তন যে কী করে সম্ভবপর হল তা আজ কল্পনায়ও আসতে চায় না।

অবশ্য সে বিবর্তন একদিনে আসেনি, এসেছে ধীরে ধীরে। নিঃসন্দেহে তা আস্তে আস্তে তাদের ভেতরে মাথা তুলেছিল এবং স্বভাবের ধারা বেয়ে তার প্রসারতা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। গোড়ার দিকে তার প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপও করেনি। কিছুটা যখন মাথা তুলেছে, তখন হয়ত গুরুত্ব দেয়নি। যেদিন তা ভেতরে ভেতরে দাবানলে পরিণত হয়ে হু হু করে জ্বলে উঠেছে, তখন দেখা গেছে যে, মুহূর্তের ভেতরেই তা গোটা সৌধকে ভস্মীভূত করে দিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এন্সাইক্লোপেডিয়ার সংকলয়িতা লিখেছেনঃ

"নারীদের আরাম আয়েশ ও বিলাস ব্যসনপ্রিয়তা রাজতন্ত্রের যুগে আত্ম প্রকাশ করল। এর পূর্বে যখন সেখানে গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, তখন নারীরা ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ থেকে স্বদায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিল, তখন তারা ঘরকন্যা ও সেলাই বুননের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। কিন্তু, ধীরে ধীরে সে দেশের নারীদের ভেতরে বিলাসপ্রিয়তা দেখা দিতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তা এরূপ বেড়ে চলল যে, তদানীন্তন রোমের বিখ্যাত দার্শনিক 'কাটন' স্বজাতিকে সে ভয়াবহ প্রবাহ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য কোমর বেঁধে লাগলেন। অবশ্য তার ফলে তাঁকেই ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।"

বস্তুত, কাটন সে যুগে তো সে অপরাধই (?) করেছিল, যা এ যুগে আমরা পর্দার সমর্থকরা করে চলছি। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যুগে যুগে যে দেখা দেয় তা নির্ঘাত। কিন্তু কাটনের উপদেশ সেদিন সে উন্মত্ত প্রবাহে ভেসে গিয়েছিল। এমনকি তাঁর জীবনই বিপন্ন হল। তার পরিণাম কি দাঁড়াল?

রোমকদের ঠাঁট ও বিলাসপ্রিয়তা সীমা ছাড়িয়ে গেল। এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার প্রণেতা যদিও তাদের বিলাসের সামগ্রীগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচিত করেছেন, আমি তা নিষ্প্রয়োজন ভেবে ছেড়ে দিলাম। আমি এখানে শুধু এতটুকুই তুলে ধরতে চাই যে, দার্শনিক কাটন তাঁর জাতিকে কী উপদেশ দিয়ে জীবন বিপন্ন করেছিলেন এবং স্বজাতিকে তিনি পর্দাপ্রথা বিলোপের ব্যাপারে কী সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন। সাথে সাথে এও দেখাব যে, কিভাবে দার্শনিক কাটনের সতর্কবাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

এসব হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য। তবে এগুলো বিদেশে বিজাতির ওপরে ঘটে গেছে বলে আমাদের তা ভাল করে জেনে রাখা উচিত। কারণ, আমাদের জানা রয়েছে যে, আজ আমরা সেই ধরনেরই একটা বিপদের সম্মুখীন হয়েছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার প্রণেতা লিখেছেন যে, যখন নারীর বলাস ও ব্যসন সাজ-সজ্জার মহড়ার ওপরে আরোপিত বিধি নিষেধের আইন বাতিল করার দাবীতে রোমকদের ভেতরে বিদ্রোহ দেখা দিল, তখন রোমের এই বিখ্যাত দার্শনিক খৃস্টপূর্ব দুইশ অব্দে স্বজাতির এক বিরাট সমাবেশে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

ঐতিহ্যবাহী রোমের নাগরিকবৃন্দ! তোমরা কি ভেবেছ, যে বিধান তোমাদের নারীদের স্বামীর অনুগত রাখছে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়োজিত করছে, তা তাদের গর্দান থেকে তুলে নিলে তাদের হাজার রকমের বাসনা ও মর্জী তোমরা চরিতার্থ করতে সমর্থ হবে? আজ তারা এতকিছু বন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আমরা কতখানি তাদেরে স্বদায়িত্বে নিয়োজিত রাখতে পারছি? তোমাদের কি এতটুকু কথাও জ্ঞানে আসে না যে, আজ যদি তারা সামান্যতম প্রশ্রয় পায়, তাহলে একদিন তারা তোমাদের সাথে সব ক্ষেত্রেই সাম্যের দাবী তুলে বসবে এবং তোমাদের তাতেও বাধ্য থাকতে হবে? তোমরাই বল দেখি, নারীরা যে শোরগোল শুরু করেছে এবং যে ভাবের বিদ্রোহাত্মক সভা-সমিতি করে চলছে, তাতে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কি যুক্তি থাকতে পারে?

শুনে নাও, তোমাদের এই নারীদেরই একজন আমাকে মুখের ওপরে শুনিয়ে দিয়েছে– "এটা আমাদের খুশী যে, আমরা মেলা তেহারের দিনে আপাদমস্তক সোনায় মুড়িয়ে, রং-বেরংয়ের জরীর কাপড়-চোপড় পরিধান করে, শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াব এবং রংগীন গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে কাতারে কাতারে মিছিল নামিয়ে সেই বাতিল আইনের (যাতে নারীদের সংযত হয়ে চলার নির্দেশ ছিল) ওপরে আমাদের জয়ের আনন্দ ঘোষণা করে ফিরব। আমরা চাই, তোমাদের পুরুষ জাতির যেরূপ শাসকমণ্ডলী নির্বাচনের ক্ষমতা রয়েছে, আমাদেরও তা নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকবে। আমাদের ভোটাধিকার দিতে হবে। (বর্তমান অবস্থার সাথে যেন হুবহু মিলে যাচ্ছে।) আমরা আরও চাই যে, আমাদের আয়, ব্যয় ও বিলাস সামগ্রীর ওপরে যেন কেউ হস্তক্ষেপ না করে।"

রোমকগণ! তোমরা আমাকে নর-নারী নির্বিশেষের বাহুল্য খরচের তীব্র সমালোচক বলে জান। আমি এমন কি সর্বসাধারণ থেকে শুরু করে শাসকমণ্ডলী ও আইন পরিষদের সদস্যদের অমিতব্যয়িতার কঠোর নিন্দা করে বেড়াই। তোমরা হয়ত আমার মুখে এ কথাও শুনে থাকবে যে, রোমের গণতান্ত্রিক সরকার আজ পরস্পর বিরোধী দুটো ব্যাধিতে ভুগছে। একটা হচ্ছে কার্পণ্য, আরেকটা বিলাসপ্রিয়তা। স্মরণ রেখ, এ দুটো ব্যাধি বিরাট সভ্য জাতি ও দেশকে সর্বনাশ করেছে। সতর্ক থেক, সেদিন তোমাদের ওপরেও ঘনিয়ে আসছে।

এরপরে এন্‌সাইক্লোপেডিয়া প্রণেতা মনীষী কাটনের এ ভাষণের ওপরে নিম্নরূপ টীকা লিখেছেন ঃ

"কাটন এ ব্যাপারে সেদিন আদৌ সাফল্য লাভ করেননি। সে আইন বাতিল হয়েছিল। তাঁর শত প্রচেষ্টাও তা বাঁচাতে পারেনি। তবে জাতির উদ্দেশ্যে তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়ে দেখা দিয়েছিল।"

আমাদের আজকের সামাজিক জীবনে নারীদের যে সীমাহীন স্বাধীনতার সৌভাগ্য রয়েছে, তার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলেও দেখা যায় যে, নারীদের ইত্‌রামী, নাজ নোখরা ও রং-ঢংয়ের আর অন্ত নেই। তারা তাদের অলংকারাদি ও প্রসাধন সামগ্রী, এক কথায় তাদের শোভা বর্ধনে সহায়ক সব কিছুর জন্যই যেন মাতাল হয়ে ওঠে। এ যুগের নারীদের এ সব লক্ষণ মূলত সে যুগের রোমক নারীদের চাইতেও ভয়াবহ পরিণতির ইংগিত দিচ্ছে।

সে কথাও এখন ছেড়ে দিলাম। আমি এখানে দেখাতে চাই যে, রোমকদের বিশাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটার পরে কি অবস্থাটা দাঁড়াল। তারপরেও কি সে দেশের নারীরা আপাদমস্তক স্বর্ণ বিমণ্ডিত হয়ে রং-বেরংয়ের সাজসজ্জা নিয়ে উচ্চাংগের গাড়ীতে চড়ে সড়কে সড়কে মহড়া দিয়ে চলল?

কখ্খনো নয়। বরং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া এতই প্রচণ্ডরূপ ধারণ করল যে, সে দেশের পুরুষরা কঠোর হস্তে নারীদের মাংস খাওয়া, হাসি-ঠাট্টা, কথাবার্তা, এক কথায় সব কিছুই বন্ধ করে দিল। এমনকি তাদের মুখে 'মোযেসীর' নামক সুদৃঢ় এক ধরনের তালা লাগিয়ে দিল। কোন ফাঁকেই তাদের মুখ থেকে যেন টু শব্দটি পর্যন্ত বেরুতে না পারে। শুধু সাধারণ নারীদের ওপরেই যে এ আপদ নেমে এসেছে তা নয়। রাজরাণী থেকে শুরু করে পথের ভিখারিণী পর্যন্ত একই দশায় পতিত হল। নারীদের এ দুর্গতি ইউরোপে বেড়ে গিয়ে এরূপ চরমে পৌঁছল যে, সতের শতকে রোমে তা নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন বসল। তাতে একমাত্র বিবেচ্য ছিল যে–"নারীদের কি আদৌ প্রাণশক্তি রয়েছে?"

সেদিনের নারীদের অপরাধমূলক কার্যকলাপের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পুরুষরা যে সকরুণ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল এবং যে ধরনের বিভিন্ন হাতিয়ার ও শয়তানী পদ্ধতি হতভাগিনীদের কষ্ট দেবার জন্যে ব্যবহৃত ও অনুসৃত হয়েছিল, তা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার বা এ লেখনীর আদৌ নেই। যদি কোন চিত্রকর সাহস করে তাদের সে চিত্র এঁকে আমাদের সামনে আজও তুলে ধরে, তা হলে সে লোমহর্ষক দৃশ্য দেখে সবাই কেঁপে উঠবে নির্ঘাত। তাদের শরীরে পুঁতিগন্ধময় উত্তপ্ত তেল ঢেলে দেওয়া হত। ঘোড়ার সাথে বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় টানা-হেঁচড়া করে ছুটে চলা হত। ফলে তাদের চামড়া খসে যেত, মাংস ছিঁড়ে যেত ও হাড়গুলো ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হত। বহু নারীকে ঘরের খুঁটির সাথে বেঁধে দেহের চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হত। ফলে, দেহের মাংসগুলো তাদের গলে গলে পড়ত এবং এরূপ জঘন্য অবস্থার ভেতর দিয়ে তাদের প্রাণবায়ু শূন্যে মিলিয়ে যেত।

এসব ভাবতেও আমাদের প্রাণ আজ ধড়ফড় করে ওঠে, শরীর ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়। 'রিভিউ অভ রিভিউজ' এর পঞ্চদশ খণ্ডে এসব বর্ণনা বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে। তা পাঠ করলেই জানা যায় যে, সেদিনের নিষ্ঠুর পুরুষরা তাদের ওপর কত কঠোর প্রতিশোধ নিয়েছিল।

এ চরম বিবর্তন যারা পর্যবেক্ষণ করার অথবা বুঝবার সুযোগ লাভ করেছে,

তাদেরই বিস্ময়াহত হতে হয়েছে। অবাক হয়ে তাদের ভাবতে হয়েছে এবং মনে মনে প্রশ্নও তুলেছে, এ নারীরা তো বলতে গেলে গতকালই পূর্ণ আযাদী ভোগ করেছে। এমনকি গোটা পুরুষজাতির ওপরে তারা কর্তৃত্বও চালিয়েছে। অথচ তাদের আজ এত বড় দুর্ভাগ্য কি করে দেখা দিল যে, ঘরে-বাইরে সমানে তারা পুরুষের কঠোর নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে চলল? আর সে কিরূপ নির্যাতন, যা ভাবতেও সর্বাঙ্গ শিউরে উঠে! যার চরম পাশবিক চিত্র দেখলে তা মানুষের কাজ বলে বিশ্বাস করা যায় না।

এ বিস্ময়কর বিপ্লব ও বির্বতন কি করে দেখা দিল? এ পরিবর্তনের মূলে কি ছিল? কোন বস্তু তাদের সর্বজনস্বীকৃত চরম স্বাধীনতার বিলোপ ঘটিয়ে এরূপ দাস ও বন্দী জীবনের নিষ্ঠুরতম পর্যায়ে টেনে আনল?

সন্দেহ নেই, এসব প্রশ্ন ইতিহাস পাঠকদের প্রাণে জাগবে। আর তারা সে প্রশ্নের জবাব ততক্ষণ পর্যন্ত পাবে না, যতক্ষণ তারা মনস্তত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞান আগাগোড়া ঘেঁটে না দেখবে। তা এখানে বিশ্লেষণ করে দেখাতে গেলে বইয়ের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে। তাই সংক্ষেপে দু'কথায় তা বলে দিচ্ছি।

যখন রোমকদের শাহী ঠাঁট ও সাম্রাজ্য উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছল তারা শান-শওকত ও মান-মর্যাদায় গোটা দুনিয়ার ওপরে প্রাধান্য লাভ করল, গোটা দুনিয়ায় যখন তাদের সামনে টু শব্দ করার মত কেউ ছিল না, তাদের অন্তরে তখন আরাম-আয়েশ ও বিলাস ব্যসনের মোহ ঠাঁই নিল। আর এ দুটো কোনদিনই নর-নারীর পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সম্ভবপর নয়।

রোমকদের ওপরে ধীরে ধীরে গ্রীক দার্শনিক ও তাদের ভক্ত রোমকদের প্রভাব পড়তে লাগল। তাই তারা ক্রমে ক্রমে নারীদের ঘরের বাইরে যাবার সুযোগ দেওয়া শুরু করল। এ ধারাই অব্যাহত গতিতে ক্রমোন্নতি লাভ করে গিয়ে এমনি পর্যায়ে দাঁড়াল যে, গোটা দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাদের মুঠোয় চলে গেল।

নর-নারীর এ ধরনের মুক্ত মেলামেশার ফলে বীর রোমকদের জীবনে চারিত্রিক দৌর্বল্য ও কলুষের ছায়াপাত ঘটল। আর তা বেড়ে গিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, সে কথা লিখতেও লেখনী কেঁপে উঠতে চায় লজ্জায়। পরিণামে তাদের শৌর্য বীর্যের পতন ঘটল, সাহস বিক্রম লোপ পেল এবং চরম মানসিক অধঃপতন দেখা দল। দেখতে দেখতে নারীকে কেন্দ্র করে শুরু হল তাদের ভেতরে মারাত্মক আত্মকলহ। তা

এতই বীভৎস আকারে আত্মপ্রকাশ করল যে, মানবতার নামগন্ধও তাতে বাকী রইল না।

ইত্যবসরে নতুন এমন সব পরিস্থিতির আবির্ভাব ঘটল, যা তাদের চিন্তা ধারাকেই পাল্টিয়ে দিল। সহসা তাদের গতি বিপরীত দিকে মোড় নিল। তাদের প্রতীতি জন্মে গেল, যত ফেৎনা ফাসাদের মূলই হচ্ছে নারী। নারীর বিরুদ্ধে তাই তাদের মনোভাব দিন দিন রুদ্র হতে রুদ্রতর হয়ে চলল। পরিণামে তাদের ওপরে দিন দিন কঠোরতার মাত্রা বেড়ে চলল– যার চরম রূপ আমি কিছুক্ষণ আগেই আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আঠার শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত সেই পাশবিক অধ্যায়ের জের চলল।

আমার খুবই বিশ্বাস যে পাশ্চাত্য দেশ আজ আবার সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চলছে। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের দেখানো পথেই এগিয়ে চলছে সন্দেহ নেই। কারণ তারাও আজ নারীদের হাজার রকমের প্রসাধনী, তাদরে কেশ বিন্যাসের বিভন্ন ধরনের উপকরণ ও নিজেদের কুৎসিত রুচি মোতাবেক তাদের সাজিয়ে রাখার সর্ববিধ সরঞ্জাম আবিষ্কার ও সরবরাহ করে চলছে। তাদের পবিত্রতা ও শ্লীলতা হানির অবাধ ব্যবস্থার জন্য তারা সহস্র রকমের পন্থা আবিষ্কার করে চলছে। দৈনন্দিন তাদের নারীদের তারা সেই বিপদসংকুল পথেই এগিয়ে নিয়ে চলছে, যে পথে তাদের পূর্ববর্তী বোনরা আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

গোটা ইউরোপের সুধীমণ্ডলী খুব ভালভাবেই আজ সে অবস্থাটা উপলব্ধি করছে। এখন সে ব্যাপারটা এতই পরিষ্কার হয়ে ধরা দিয়েছে যে, এনসাইক্লোপেডিয়ায়ও তারা তা উদ্ধৃত করেছে। এরপরে অবশ্যই তা আরও 'সুস্পষ্ট' হয়ে তাদের কাছে ধরা পড়বে।

এই হচ্ছে যখন তথাকথিত নারী স্বাধীনতার ইতিহাস, নারী স্বাধীনতার কেন্দ্রভূমি ইউরোপের পরিস্থিতি যখন এরূপ দেখতে পাচ্ছি, তখন আমরা প্রাচ্যের মুসলমানরা তাদের অনুসরণ না করে এমনকি অপরাধ করছি? যে ইউরোপের নারীরা পুরুষের হাতের পুতুল মাত্র, সেখানে তারা পুরুষের ইচ্ছায় মুক্তি পায় আবার তাদের ইচ্ছায়ই বন্দী জীবন বরণ করে, শুধুমাত্র পুরুষের খেয়াল চরিতার্থের ভিত্তিতেই যেখানে তাদের জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হয়, যখন ইচ্ছা পুরুষ তাদের সাজায় আবার যখন ইচ্ছা হয় কাঁদায়, ইচ্ছা হলেই মাথায় তুলে আবার নির্মমভাবে পদতলে পিষ্ট করে চলে, সেই ইউরোপের বাহ্যিক শ্লোগান ও সাময়িক ভেল্কিবাজীতে না ভুলে আমাদের প্রাচ্য

জগতের নারীরা কি তাদের স্থায়ী শান্তির জীবনকেই শ্রেয়ঃ মনে করবে না?

বলা বাহুল্য, মুসলমানদের পর্দা প্রথার মত নারী জাতির রক্ষাকবচ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। পর্দাই নারীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পূর্ণরূপ দান করতে পারে। ইসলাম তার নিখুঁত ও নির্ভুল বিধানের সুদৃঢ় ও অজেয় দুর্গে নারীদের আশ্রয় দিয়েছে। যতদিন মুসলমান আত্মভোলা না হবে, নিজেদের অতুলনীয় বিধান বিস্মৃত না হবে, তদ্দিন কি করে তাদের অন্তরে বাইরের অশুভ প্রভাব ছায়াপাত করতে পারে? যতক্ষণ মুসলমানের আদর্শচ্যুতি ও ধর্মান্তর না ঘটবে, ততক্ষণ তারা কিছুতেই তাদের নারী ও পুরুষের ভেতরকার অভেদ্য পর্দা প্রাচীরকে ভেঙ্গে ফেলতে পারবে না।

আপনারা কি দেখছেন না যে, বিগত তের শত বছরের ভেতরে পৃথিবীতে হাজার রকমের ওলট পালট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মুসলিম নারী সমাজ সে সব অশুভ প্রবাহ থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করে একইভাবে চলে আসছে? তাদের ছাড়া দুনিয়ার সব নারীরাই সে স্রোতে গা ভাসিয়েছে। তার কিছুটা নমুনা উপরে আপনারা দেখেও আসছেন। এখন বিচার করে বলুন দেখি, পর্দা প্রথার চাইতে কল্যাণকর এমন কোন্ ব্যবস্থা রয়েছে, যা নারীদের পুরুষের অবাধ ভোগ বিলাসের ক্রীড়নক হবার হাত থেকে বাঁচাতে পারে? এরূপ আর কোন্ ব্যবস্থা রয়েছে যা তাদের পথে, মাঠে, ঘাটে, প্রান্তরে পুরুষের পাশব প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হবার লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করতে পারে? ইউরোপের নারীরা কয়েক শতাব্দী ধরে পুরুষের যে পাশবিক নির্যাতনের নাগপাশে নিষ্পেষিত হয়ে চলল, সেরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুসলিম নারীদের পর্দা ছাড়া আর কোন্ বস্তু বাঁচিয়ে রেখেছে? একমাত্র পর্দা প্রথাই যে মুসলিম নারীকে আজও মান মর্যাদার সাথে বাঁচিয়ে চলছে তা কে অস্বীকার করবে? এরূপ অমূল্য রক্ষা কবচটি হাতছাড়া করতে তারা রাযী হবে কেন?

'আল্ মারআতুল জাদীদ্রা'-এর লেখক বলেছেন ঃ

"ইউরোপে আজ এরূপ বহু শক্তিশালী পার্টি রয়েছে যারা তাদের দাবী দাওয়া মেনে নেবার জন্য সরকারকে বাধ্য করে থাকে। অথচ আমরা দেখছি, তাদের একটি দলও আজ পর্যন্ত নারীদের পর্দায় রাখার দাবী উত্থাপন করেনি। কারণ, সেখানে তো তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। কারণ, সেখানকার ধর্মনেতারাও বিজ্ঞ ও সুধী সমাজের সাথে নীতিগতভাবে এ ব্যাপারে একমত, যদিও তারা নারী স্বাধীনতার এতখানি বাড়াবাড়ির সমর্থক নন। এখন আমাদের ভেতরে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এক্ষেত্রে তাদের মতৈক্য ঘটাল কিসে?"

আমার কথা তো এই যে, আধুনিক দর্শনের স্রষ্টা অগাষ্ট কোঁতে এবং এ যুগের সর্বজনমান্য সেরা মনোবিজ্ঞানীরা একবাক্যে বলছেন যে, নারীরা যে শুধু বেশী স্বাধীন হয়ে গেছে তাই নয়, পরন্তু তারা নারীসুলভ স্বভাবই হারিয়ে ফেলেছে। মূলত নারীত্বের সীমাই তারা লংঘন করে চলেছে। পাঠক-পাঠিকাদের অবশ্যই সেসব মতগুলো স্মরণ রয়েছে। সেসবের সামনে লেখক বন্ধুর যুক্তি যে কতটুকু জোর রাখে তা আপনারাই বিবেচেনা করবেন।

যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের মতামত তো রয়েছেই, তার সাথে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য সংকলন 'এনসাইক্লোপেডিয়া'র উদ্ধৃতিও এ ব্যাপারে মীমাংসার পথ নির্দেশ করেছে। এনসাইক্লোপেডিয়া তো হচ্ছে যুগ যুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার এবং বিশেষ করে ইউরোপীয় সেরা মনীষীদের মতামতের নির্যাস। সেই এনসাইক্লোপেডিয়া প্রণেতাই নারীর পাল্লায় পড়ে রোমকদের যে চরম ধ্বংস দেখা দিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বড়ই আবেগময় ভাষায় লিখেছেন ঃ

"আমাদের আধুনিক সমাজেও যেভাবে নারী স্বাধীনতার চরম দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে, তাদের নির্লজ্জ চালচলন ও হাসি তামাসা, তাদের হাব ভাব ও সাজসজ্জা, বিশেষ করে তাদের যে রূপের প্রদর্শনী ও মহড়ার তুমুল আয়োজন চলছে, তাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আমাদের ওপরে রোমকদের চাইতেও কঠিন বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসছে। এশিয়ার কেউ যদি আমাদের এসব শুনতে পায়, তা হলে আঁৎকে উঠবে। কারণ, এসব তাদের কল্পনারও বাইরে। কিন্তু সে বেচারারা এর বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস পাবে না। কারণ, তাদের ধারণা যে, শিক্ষা ও সভ্যতায় ইউরোপ তাদের অনেক উর্ধ্বে। তাই ইউরোপের সব কাজই ভাল। যা খারাপ দেখায়, তা হয়ত তারা বুঝতে অপারোগ বলে খারাপ মনে হচ্ছে। তাদের চিন্তাশক্তি তা বুঝবার মত এখনও উন্নত হয়ে উঠেনি। তাই এশিয়াবাসীদের কখনো ইউরোপীয়দের সমালোচনা করার অধিকার নেই।"

তিনি এ ব্যাপারে আরও অনেক কিছু বলার পরে লিখেছেন "নিঃসন্দেহে বলা চলে, যে, নারীদের রং ঢং ও হাল ফ্যাসানের চালচলন যে মানব চরিত্রের ওপরে বিষময় প্রভাব বিস্তার করছে, তা শুধু আমরাই আগে অনুভব করছি না ; বরং আমাদের খ্যাতনামা সাহিত্যিকরাও এ ব্যাপারে আগে কলম ধরতে আদৌ কসুর করেননি। যেসব নভেল আজকাল সবচাইতে জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি লাভ করছে, তাতেও নারীদের এই বল্গাহীন চালচলন ও চরম বেহায়াপনার জঘন্য চিত্র এঁকে দেয়া

হয়েছে। যেসব নারী এ উন্মাদনার চরমে পৌঁছেছে, প্রসাধন ও বিলাস ব্যসনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে ঘর সংসার উজাড় করে চলছে, তাদের থেকে কিভাবে আমরা নিস্তার লাভ করব তা বুঝতে পারি না। তারা আজ আমাদের সমাজের শালীনতা ও সভ্যতার মাথা খেয়ে চলেছে ও তার মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলবার উপক্রম করছে। এক কথায় বলা চলে- এ রোগের দাওয়াই নেই।"

ইউরোপের এত শান-শওকাত, শৌর্য বীর্য, জ্ঞান বিজ্ঞান ও হাজার রকমের উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও যদি সেখানকার এনসাইক্লোপেডিয়া রচয়িতা ও সেরা মনীষীরা মাত্রাহীন বাহুল্য খরচ ও সীমাহীন বিলাস জীবনকে চরম ধ্বংস ও পতনের কারণ বলে নির্দেশ করে থাকেন, তাহলে দারিদ্র্য জর্জরিত ও সমস্যাকীর্ণ এই এশিয়ায় নারীর প্রসাধনীর পেছনে বল্গাহীন বাহুল্য খরচ ও তার আকর্ষণে পুরুষের অজস্র অর্থের শ্রাদ্ধ আমাদের কোন্ পর্যায়ে ঠেলে দিবে?

পাঠক-পাঠিকারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, আমি নারীদের সতীত্বের দোহাই পেড়ে ঘরে আটকে রাখতে চাইনে এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমি তাদের পর্দার প্রয়োজনীয়তা মনে করি না। আমার তা মনে না করার কারণও রয়েছে। তা হচ্ছে এই, সতীত্ব রক্ষা নারীদের একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। সেটা তারা স্বভাবতই বাঁচিয়ে চলতে উদ্‌গ্রীব থাকবে। তাই সে ব্যাপারে আমাদের হস্তক্ষেপ করায় দুর্বল শ্রেণীর প্রকৃতিগত অধিকারকেও খর্ব করা হয়। তারা এমনিই লজ্জাশীলা ও বিনম্র স্বভাবা। পবিত্রতা তাদের অঙ্গের স্বাভাবিক ভূষণ।

এ কথা সবাই মানতে বাধ্য যে, চারিত্রিক শক্তি পুরুষের চাইতে নারীদের বেশী। তাদের ধৈর্য বা আত্মসংযমের শক্তি স্বভাবতই পুরুষের তুলনায় বেশী রয়েছে। আর এই চারিত্রিক শক্তি মানব জীবনের সেরা রত্ন। তাই অপেক্ষাকৃত দুর্বল চরিত্রের পুরুষ জাতির হিংস্র ও পাশবিক আক্রমণের হাত থেকে নারীরা আত্মরক্ষার জন্য পর্দার অজেয় দুর্গে আপনা থেকেই আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

(তাছাড়া সতীত্ব নারীদেরই বাঁচাবার প্রয়োজন অধিক। পুরুষের সতীত্বের প্রশ্ন সমাজে বড় হয়ে ধরা দেয় না। কারণ, তারা চরিত্র নষ্ট করলেও তার প্রমাণ পাওয়া ভার। নারীদের সতীত্ব নষ্ট হলে তার জেরও তাদের টানতে হয় বলেই সমাজে তাদের ধরা পড়বার আশংকা থাকে বেশী। আর নারীদের চরিত্র নষ্ট হলে সমাজ তাকে আদৌ ক্ষমা করতে রাযী হয় না। যেহেতু সমাজের চালকই পুরুষ সমাজ। সবকালের এটা চিরন্তন ব্যবস্থা। স্বাধীন নারীদের কেন্দ্রভূমি ইউরোপেও এই একই ব্যবস্থা চালু

রয়েছে। তাই দেখা যায়, নারী স্বাধীনতার অন্ধ সমর্থকরাও অসতী নারী নিয়ে ঘর করতে রাযী হয় না। এ ব্যাপারে তারা পর্দা সমর্থকদের চাইতেও অনুদার ও প্রতিক্রিয়াশীল। পর্দা সমর্থক ধর্মভীরুরা অসতী নারীকে প্রথমে সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে থাকে। যদি তাতে ব্যর্থ হয়, শাস্তি দেয়। তাতেও ফল না হলে পথ ছেড়ে দেয়, মুক্তি দেয় তাকে ইচ্ছেমত চলার জন্যে চিরতরে। পক্ষান্তরে, পর্দাবিরোধী অধার্মিকরাই নারীর সতীত্বের প্রশ্নে অবাধে হত্যালীলা চালিয়ে থাকে।)

স্থুল কথা, পুরুষ চরিত্রহীন হলেও সমাজে দিব্যি আরামে আসন গেড়ে জেঁকে বসে থাকতে পারে আর যত দুর্বিষহ লাঞ্ছনা নেমে আসে অসতী নারীর ওপরে। কারণ, অসচ্চরিত্রতা পুরুষের দেহে এরূপ কোন অস্বাভাবিক পরিবর্তন এনে দেয় না যার ফলে সমাজের চোখে ধরা পড়বার আশংকা থাকবে। তাই তারা ভেতরে চরম অপকর্ম চালিয়ে ওপরে পাক্কা সাধু সেজে চলতে পারে।

আবহমানকাল থেকেই দেখা গেছে যে, পুরুষরা হাজার রকমের চক্রান্ত করে নারীদের ঘর থেকে বের করে এনে কামনা চরিতার্থ করার প্রয়াস পেয়ে আসছে, আর নারীরা তাদের পাশবিক হামলা থেকে বাঁচবার জন্য সকরুণ ফরিয়াদ জানিয়ে আসছে। পৃথিবীর বুকে এ ধরনের যত দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো খতিয়ে দেখার পরে পরিষ্কার জানা গেছে যে, নারীকে চরিত্রহীন ও উচ্ছৃংখল করে তুলেছে পুরুষরাই। এমনকি মিসরের নারী স্বাধীনতার অন্ধ সমর্থক 'মেকতাম' পত্রিকায় ১৯০৮ সনের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় পর্দার বিরুদ্ধে লিখতে গিয়েই এ সত্যটিও স্বীকার করেছেঃ

"দুনিয়ার সব সমাজের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নারীদের সতীত্ব সম্পদের উপর পুরুষ আক্রমণকারীর ভূমিকা নিয়ে থাকে আর নারীরা আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালায়।"

সুতরাং কঠোর, অসংযত ও হিংস্র প্রকৃতির পুরুষদের পাশবিক আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দুর্বল নারীদের একটা সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল নির্দেশ করা কি ন্যায়সঙ্গত কাজ হবে না? এটা কী কথা যে, আমরা তাদের বাঁচতে দেব না, বাঁচবার ব্যবস্থাও হতে দেব না, শুধু তাদের চরিত্রহীন আখ্যা দিয়ে ঘৃণা করতে শিখব? যখনই নারীদের সতীত্বহীনদের অপবাদ দিতে উদ্যত হই, তখন এ কথাটা কেন ভাবি না যে, পুরুষের সহস্র চক্রান্তজাল থেকে বাঁচাবার জন্য আমরা তাদের কি ব্যবস্থা দিয়েছি? অথচ আমরা দেখছি যে, রক্তপিপাসু বাঘ ও বিষধর সর্প জঙ্গল ও গর্তে লুকিয়েও এ পুরুষের হাত থেকে নিস্তার পায় না।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, পুরুষরা নারীদের কোন্ ধরনের সৃষ্টিরূপে দেখতে চায়? তারা কি তাদের ভেতরকার মানবীয় বাসনা কামনার লুপ্ত শক্তিকে ধুয়ে মুছে ফেরেশ্‌তা হয়ে যাবে? তারা কি সর্ববিধ অনুভূতিশূন্য জড়বস্তু হয়ে থাকবে?

এরূপ চিন্তা যদি কোন পুরুষের মাথায় খেলতে থাকে, তা বড়ই পরিতাপের বিষয় বটে। পুরুষরা হাজার প্ররোচনা ও চক্রান্তজালে নারীদের আকৃষ্ট করার সীমাহীন সাধনা চালানো সত্ত্বেও দুর্বল নারীদের তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকতে হবে, নইলে সমাজে তাদের তিলমাত্র ঠাঁই হবে না-একি পুরুষের নির্দয় মনোভাবের পরিচায়ক নয়? এর চাইতে কি নারীদের বন্দী জীবন মারাত্মক?

এখানে হয়ত কেউ প্রশ্ন তুলে বসবে যে, তাহলে তুমি পুরুষদের পর্দায় থাকার বিধান দিচ্ছ না কেন? আক্রমণকারীদের বেঁধে রাখার ব্যবস্থা না করে আক্রান্তদের কঠোর কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখতে চাচ্ছ কেন? এতে কি নারীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না?

আমার জবাব হল এই, নারীদের পুরুষ জাতি থেকে পৃথক রাখার ব্যবস্থাকেই আমি অপরিহার্য ভাবছি। এখন বিবেচ্য যে, তা কিভাবে সম্ভবপর? বলাবাহুল্য, নারীদের স্বাভাবিক কর্তব্যই তাদের ঘরে থাকার নির্দেশ দেয় এবং স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের খাতিরেই পুরুষদের বাইরে ছুটে বেড়াতে হয়। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই যত দুর্যোগ দেখা দেয়। সামাজিক জীবনে দেখা দেয় বিশৃংখলা ও বিপর্যয়। পুরুষের দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা যখন বাইরে কাজ করার জন্যই উপযোগী এবং নারীদের স্বাভাবিক যোগ্যতা রয়েছে ঘরের কাজ কারবার চালাবার, তখন সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের উভয় শ্রেণীর পৃথক এলাকার নির্দেশ করতে হবে। তাতে যদি কোনও শ্রেণীর কিছুটা অধিকার ক্ষুণ্নও হয়, তবুও বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করে ও উভয় শ্রেণীর অধিকতর স্বার্থ অব্যাহত রাখার তাগিদেই আমরা এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। যদি কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত পুরুষদের হাত থেকে নারীদের বাঁচাবার কিংবা পুরুষকে সংযত রাখার আর কোন সুন্দর ব্যবস্থার নির্দেশ করতে পারেন, তাহলে আমরা মুস্‌লিম জাতি জান-মাল উৎসর্গ করে হলেও তা অনুসরণ করতে উদ্‌গ্রীব রয়েছি।

'আল মেকতাম' পত্রিকায় লিখেছেঃ

সতীত্ব রক্ষার জন্য সমাজে পর্দা প্রথা খুব ভাল ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ, সুধী সাহিত্যিক সমাজের ভেতরে এমন কেউ নেই, যিনি এই দাবী করতে

পেরেছেন যে, অজগাঁয়ের অশিক্ষিতা পর্দাহীন নারী সমাজের চাইতে শহরের শালীন পর্দানশীন নারীরা সতীত্বের প্রমাণ বেশী দিয়েছে কিংবা কোন কৃষকের বা যাযাবরের স্ত্রী কোন ভদ্রলোকের স্ত্রীর চাইতে কম সতীত্বের পরিচয় দিচ্ছে।"

আমিও তা মানি। হয়ত সবাই তা মানবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটা ভুললে চলবে না যে, একজন কৃষক বা বেদুঈন নারী জীবিকা অন্বেষণে জীবন সংগ্রামের নিকৃষ্টতম পর্যায়ে অবস্থান করে। মনোবিজ্ঞান বলে, সেরূপ পর্যায়ের লোক সর্বদা স্বীয় দেহ ও প্রাণরক্ষার জন্যই ব্যস্ত থাকে। তাই তাদের এরূপ মুহূর্ত খুবই কম মিলে, যা তাদের প্রাণে কিছুটা আনন্দ বা বিহার করে বেড়াবার আকাঙ্ক্ষা জাগাতে পারে এবং তাদের তা করে বেড়াবার ইন্ধন জোগাতে পারে। আপনারা লক্ষ্য করলে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, হয় স্বামী, নয় পিতামাতার সাথে তারা দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে ব্যস্ত রয়েছে। যখনই রাত আসে, সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহটা চাটাইয়ে এলিয়ে দিয়ে কোন মতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

তাই দেখা যায়, যে সব কৃষক ও বেদুঈন নারীর ঘরে কিছুটা পয়সা কড়ি জুটে যায়, দু'বেলা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা থাকে, তারা তক্ষুণি পুরুষের মুক্ত ময়দান ছেড়ে ঘরের কোণে আত্মগোপন করে।

'আল মেকতাম' পত্রিকার আরেকটা প্রশ্নের জবাব এখন বাকী রয়েছে। তা হচ্ছে এই, পুরুষ জাতিই আক্রমণকারীর ভূমিকা নেয় আর নারীরা সর্বদা আত্মরক্ষার সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাই জ্ঞান ও বিবেক এ পরামর্শই দেয় যে, নারীদের শিক্ষা দীক্ষার মান বাড়িয়ে তুলে চারিত্রিক শক্তিকে আরও দৃঢ়তর করে তোলাই উচিত। তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মাত্রা যথাসাধ্য প্রশস্ত করা হোক। তাহলেই তারা বুঝতে পারবে নিজদের যথাযোগ্য মর্যাদা এবং তদনুপাতে তা সুরক্ষিত রাখার জন্যেও যথেষ্ট বুদ্ধি ও শক্তি লাভ করবে।

তার জবাবে আমি বলব, সে ধরনের শিক্ষা দীক্ষা লাভ তো সব নারীর ভাগ্যে জুটছে না, জুটতেও পারে না। সেরূপ উন্নতমানের শিক্ষা তো কেবল ধনী লোকদের মেয়েরা পেতে পারে। কারণ, বছরের পর বছর ধরে শিক্ষা লাভের পরে তো সেই উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা লাভ সম্ভবপর। মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষায় এমনিই খরচ হয় ছেলেদের দ্বিগুণ। তাই এভাবে মেয়ের দেহ মেপে সোনা ব্যয় করে সেই উচ্চ শিক্ষা দেবার ক্ষমতা অধিকাংশ বাপ-মারই সাধ্যাতীত। শতকরা প্রায় নিরানব্বইটি মেয়েই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হবে। ফলে, সে পথে এগোতে গিয়ে তাদের শেষ পর্যন্ত,

সেই আক্রমণকারী পুরুষদের খপ্পরে গিয়েই পড়তে হয়। পরন্তু দু'চারজন নারীর সামর্থ্যের ওপরে ভরসা করে গোটা সমাজের জন্যে কোন নীতি নির্ধারণ করা চলে না।

হাল ফ্যাসানের নারীদের অন্ধ ভক্তেরা এই একটা খোঁড়া যুক্তি তুলে থাকে। তারা বলে বেড়ায়, মনের পর্দাই তো আসল পর্দা। ওটা থাকলে আর দেহ পর্দায় রাখার কোন প্রয়োজন থাকে না। আর মনের পর্দাই যদি না থাকে তাহলে দেহের পর্দায়ও কোন লাভ নেই। কথাটা শুনতে মন্দ নয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে, এ যুক্তিটা যেরূপ অসার, তেমনি অসম্ভব।

আমি ভেবে আশ্চর্য হই, যারা দেহকে পর্দায় রাখতে অপারগ, তারা কি করে মনের পর্দা বাস্তবায়িত করতে পারে? আমার মতে তো মনের পর্দার চাইতে দেহের পর্দা অনেক সোজা। ভেবে দেখার ব্যাপার যে, এই পুরুষগুলো নারীদের ওপরে কতখানি অবিচার করতে চায়। তারা কত কঠিন বোঝা তাদের মাথায় চাপিয়ে দিতে চায় দরদীর বেশে।

একদিকে তো তারা চীৎকার দিচ্ছে এই বলে যে, দুর্বল নারীদের ওপরে সবল পুরুষদের বর্বর হামলা চলছে। সাথে সাথে অপরদিকে শ্লোগান তুলছে-নারীদের বাইরে এনে পুরুষদের কবলে ছেড়ে দাও। তাদের আত্মরক্ষার ওই পর্দা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেল। পর্দা তো সবার মনেই লুকিয়ে আছে। ওতেই চলবে। চরিত্রবলই হবে আমাদের ভেতরকার পর্দা। চক্ষু লজ্জাও পর্দার কাজ দেবে। দার্শনিকরা এ পর্দার কথাই বলেছেন-ইত্যাদি।

সোবহানাল্লাহ্! ভক্তির বহর দেখলেই বাজিমাৎ। দুনিয়াটা যেন ফেরেশ্তায় ভরপুর। আর না হোক, এ যুক্তির সদাশয় আবিষ্কর্তারা অবশ্যই ফেরেশতা বটেন। তাই নারীদেরও তারা ফেরেশ্তা বনে যাবার নসিহত খয়রাত করছেন। বাইরে এসে দিনরাত পুরুষদের হাজার প্ররোচনা সত্ত্বেও তাদের ভেতরে যেন বিন্দুমাত্র মানবীয় স্বভাবের আভাস দেখা না দেয়। আশ্চর্য যুক্তি!

শিক্ষা দীক্ষার প্রভাব

আমাদের সদাশয় বন্ধুদের এতটুকু অনুগ্রহ হচ্ছে না কেন, যাতে করে নর-নারীর ভেতরে একটা প্রকাশ্য পর্দা প্রাচীর দাঁড় করিয়ে উভয় শ্রেণী ভয়াবহ টানাহেঁচড়ার হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে। তারা কেন নারীদের সে যুগ থেকে মুক্তি দিতে চাচ্ছে না, যে যুগে তাদের জীবন সংগ্রামের কঠোর ক্ষেত্রে পুরুষদের হার মানাবার পাল্লা দিতে হবে?

হ্যাঁ-এখানে বলা যেতে পারে যে, তুমি পুরুষ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অবিচারের আশ্রয় নিয়েছ, সীমা ছাড়িয়ে গেছ। তুমি যা কিছু দেখিয়েছ, এতক্ষণ ধরে যতকিছু দলীল দাঁড় করিয়েছ, তাতে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, চব্বিশ ঘন্টা নারীদের ষড়যন্ত্র জালে আবদ্ধ করার একটানা সাধনা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া যেন পুরুষদের আর কিছুই করার নেই। অথচ তোমার স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, শিক্ষা দীক্ষা এমনি এক সম্পদ যা মানুষকে উচ্চাভিলাষী, পণ্ডিত ভদ্র ও চরিত্রবান হবার পরম সৌভাগ্য দান করে।

আমি তার জবাবে বলব-এ সব শুধু বলাই চলে আর শুনতেও ভাল লাগে। মূলত, পৃথিবীর কোথাও এর বাস্তবতা তো আজ পর্যন্তও দেখা দিল না। যদি এ কথা সত্যি হত যে, শিক্ষা ও সভ্যতা মানুষকে বাড়াবাড়ির হাত থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে দেয় এবং বাহ্যিক যে কোন নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যবাধকতা প্রয়োজন থাকে না, তাহলে তথাকথিত উদারনৈতিক নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠির সব মতামতই তো সঠিক বলে মেনে নেয়া উচিত। কারণ, তারাও বলছে-যেসব প্রচলিত রীতি নীতি ও আইন-কানুনগুলোকে মানুষ খুবই মর্যাদা দিতে শিখেছে, আর যেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানুষের ওপরে আধিপত্য জমিয়ে নিয়েছে, এসব মানুষের ভেতর ও বাইরের শক্তি ও গুণাবলী বিকাশের পথে অহেতুক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে থাকে। তার বদলে যদি মানুষকে তাদের স্বভাবের ওপরে স্বাধীন ভাবে চলতে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে সম্পূর্ণ বাধা-বন্ধনহীন ভাবে তাদের সেসব শক্তি ও গুণাবলী আপনা থেকেই খুব চমৎকার হয়ে ফুটে উঠবে। যদি তাদের ভেতরে একান্তই খারাপ বিশেষণগুলো দেখা দেয়, তা দুনিয়ার সর্বত্র প্রসারিত প্রকৃতির সক্রিয় শক্তির সাথে ঘা খেয়ে সংশোধিত হয়ে চলবে। রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীলরা যে দাবী

করছে-আইন-আদালত দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে ও অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ করে, মানুষকে যার যার ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে দেয়, অত্যাচারীর গতিরোধ করে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ব্রত সম্পাদন করে, তা একেবারেই ভূয়া কথা। আদপে এসব আইন-কানুন দৈনন্দিন অপরাধীর সংখ্যা বাড়িয়ে চলা ছাড়া কোনই কল্যাণ আনতে পারে না। এই আইনই দুনিয়ার মানুষকে কঠোর প্রকৃতির ও অসচ্চরিত্র করে তুলেছে ইত্যাদি।

তাই বলছি যে, শিক্ষা দীক্ষা যদি মানুষকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যথেষ্ট হয় এবং আইন-কানুনের কোনই প্রয়োজন না থাকে, তাহলে এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, কোন মামলার রায় দেবার জন্য সাজানো কথাই যথেষ্ট। কোনরূপ দলীল প্রমাণ বা সাক্ষী সাবুদের সাহায্য নেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি যে, বন্ধুরা দুনিয়ার বুকে এমন কোন এলাকা বা দেশ দেখাতে পারবেন না, যেখানে শিক্ষা দীক্ষাই মানুষকে কঠোর পাশবিক প্রকৃতি থেকে মুক্ত করে দিয়েছে এবং সেখানে মানুষগুলো ফেরেশ্‌তার মতই জীবন যাপন করছে। দুনিয়ার ইতিহাস আমাদের সামনে পড়ে আছে। সব জাতিই আমাদের চোখের উপরে ভাসছে। সে সবের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত কোন জাতিই শুধুমাত্র শিক্ষা দীক্ষার বদৌলতে কোনরূপ আইন-কানুন ও বাধ্যবাধকতা ছাড়া নিষ্পাপ জীবন যাপন করেনি। কোন মানুষের অন্তরই কোনদিন শুধু এই ভেবে নম্র ও পবিত্র হয়ে উঠেনি যে, কুপ্রবৃত্তির কখনো প্রাধান্য পাওয়া উচিত নয়।

হায়! যদি আমি সেই বন্ধুদের মত হতে পারতাম যারা খেয়ালী পোলাও পাকিয়েই কলজে ঠাণ্ডা রাখে, তাহলে অবশ্যই শিক্ষা দীক্ষার প্রান্তহীন কল্যাণের ওপরে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা ঝারতে পারতাম। লম্বা টীকা তাতে জুড়ে দিতে পারতাম! কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার বাইরে তো এক পাও এগোতে পারছি না। যতক্ষণ আমি শোনার যোগ্য কথা বলার মনোভাব রাখছি আর সম্ভাব্য পথের নির্দেশ দিতে প্রয়াস পাচ্ছি, ততক্ষণ তো এর ব্যতিক্রমই করতে পারছি না।

শিক্ষা দীক্ষাই মানুষকে ফেরেশতা গড়ে দেবে আর আইন-কানুনের বাধ্য বাধকতার দরকার হবে না, তার বাতুলতা প্রমাণের জন্য আমি আরেকটি সহজবোধ্য উদাহরণ পেশ করছি। ভেবে দেখুন কোন সভ্য দেশে একটা মানুষকে তার শৈশব থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্তই শরাব পান করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া

হয়। সংবাদপত্রে, বই পুস্তকে ও সভা সমিতিতে সর্বত্রই সে শরাবের কু-ফল জানতে পায়। এমনকি শরাবখোরের বিভিন্ন রকমের মারাত্মক পরিণতি ও দুর্গতি সে নিজের চোখেই বহু দেখতে পায়। সে পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, শরাব মানুষের আর্থিক, মানসিক ও দৈহিক দৈন্য ও ধ্বংস ডেকে আনে। তাদের ভয়াবহ পরিণতি দেখে সবারই আক্কেল গুড়ুম হয়; অন্তর কেঁদে ওঠে। এতকিছু অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দীক্ষা পেয়েও দেখা যায় যে, বেচারা শরাবে ডুবে চলেছে। তার গোটা জীবন শরাবের সেবায় উৎসর্গ করেছে। তার ইতর বিশেষণগুলো দিন দিন বেড়ে চলছে। এখন বলুন, এত শিক্ষা দীক্ষা তার কোন্ উপকারে আসল? মহান সভ্যতা তার ওপরে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করল? এ প্রমাণটা কি সবার বোধগম্য এমনকি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়?

এর থেকেই আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, আক্রমণধর্মী পুরুষ জাতি কখনও শুধুমাত্র শিক্ষা সভ্যতার উছিলায় চরিত্রের দুর্গম পুলসিরাত পার হয়ে যেতে পারে না। তা যতই উঁচু ধরনের শিক্ষা ও সভ্যতা হোক না কেন। শিক্ষা দীক্ষার সাথে তাই আইন-কানুন দ্বারাও তাকে বাধ্য রাখতে হয়। ভাল শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে খারাপের সাথে ঘুলিয়ে ফেলে কুপ্রবৃত্তিকে সুপ্রবৃত্তির অনুগত করে ফেলবার সুযোগ যেন সে না পায়।

উদাহরণ প্রসঙ্গে আমি যে শরাবের উল্লেখ করলাম, তাতো মানুষের প্রকৃতিগত ত্রুটি নয়-অভ্যাসগত। অথচ তা থেকেই মানুষ হাজার শিক্ষা দীক্ষায়ও মুক্ত থাকছে না। সেক্ষেত্রে মানুষ কি করে তার প্রকৃতিগত পাশবিকতার হাত থেকে শুধুমাত্র শিক্ষা দীক্ষার নেক বরকতে বেঁচে থাকতে পারে? সেটাতো তার জীবনের ক্ষুধা, দেহের তাড়না। আপাদমস্তক তার প্রচণ্ড আবেগময় ব্যাকুলতা-যা তাকে বাধ্য করে, উন্মাদ ও বিভ্রান্ত করে, বিপথে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। হাজার সবক সে উন্মত্ত পশুর মুখে লাগাম দিতে ব্যর্থ সাজে।

তাই, মুসলমানদের পর্দা ব্যবস্থা নারীকে হেয় ও অবরুদ্ধ করে রাখার জন্য আরোপিত হয়েছে বলে যারা গলাবাজী করে ফিরছে তাদের এখন বুঝতে আদৌ কষ্ট হবে না যে, মূলত তা আক্রমণধর্মী পুরুষের হাত থেকে নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যেই করা হয়েছে। ইতিহাস তো এ কথাই শিক্ষা দিচ্ছে। এ সাক্ষ্যই আমরা দেখতে পাই তার প্রতি পাতায় যে, নারীকে প্রলুব্ধ করে বিভ্রান্ত করায় পুরুষরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রণী থাকে। নারীর স্বভাবসুলভ লজ্জা ও সামাজিক ভয় তাকে আত্মরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত রাখে। মুসলিম মা-বোনদের জন্যে পর্দা প্রথার নির্দেশ রেখে

ইস্‌লাম তাদের স্বভাবসুলভ নীতিরই পৃষ্ঠপোষকতা করছে, তাদের আত্মরক্ষার সংগ্রামেই সাহায্য করছে। তাই তাকে তাদের অবমাননার হাতিয়ার বলে আখ্যায়িত করা উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার বৈ কিছুই নয়। আর তা থেকে তাদের চরিত্রের দৌর্বল্যের প্রতিও কটাক্ষ করা হয় না।

মুসলিম নারী পর্দা প্রাচীরে আত্মরক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থার মাধ্যমে এ কথাই ঘোষণা করছে যে, আক্রমণধর্মী পুরুষদের বর্বর হামলা থেকে আত্মমর্যাদা বাঁচিয়ে রাখার উপকরণ তাদের হাতে দুটোই রয়েছে। একটা হচ্ছে চারিত্রিক শক্তির আধ্যাত্মিক প্রাচীর ও অপরটি হচ্ছে, বাহ্যিক আবরণের পর্দা প্রাচীর। এ দুটোকে ভেদ করে পুরুষের হিংস্র নখর তাদের দেহে কালিমার আঁচর কাটতে আদৌ সমর্থ হবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, এতকিছু জানা সত্ত্বেও কোন নারী কি পর্দাকে তাদের জন্য অবমাননাকর মনে করবে? কোন সৈন্যদল কি দুর্গকে কখনো অবমাননাকর মনে করে? আমার বিশ্বাস যে, এরপরে আর পুরুষও তাদের পর্দার বাইরে এসে দ্বৈত যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রলুব্ধ করবে না।

যেভাবে ইউরোপের কিছু লোকের ধারণা যে, রাষ্ট্র সরকার, আইন-কানুন, রীতি নীতি, ইত্যাদি হচ্ছে মানব জাতির আদিম যুগের জীবন পদ্ধতির স্মৃতিচিহ্ন মাত্র; ঠিক তেমনি কতিপয় লোক পর্দা প্রথাকেও জাহেলী যুগের নিঃশেষিত প্রদীপ বলে মন্তব্য করছে। তবে, আমার কথা হচ্ছে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভাল বা মন্দ বলার ভিত্তিতে গোটা মানব জাতির জীবন পদ্ধতি নির্ধারিত হতে পারে না বা কোন মূলনীতিও গ্রহণ করা যেতে পারে না। কারণ, দুনিয়ায় আজও হরেক খেয়ালের মানুষ রয়েছে। কারুর তো ধবধবে দাঁত দেখলে ভিমড়ি যাবার দশা। তাই সে নিজের দাঁতগুলোও সর্বদা কালো কুচকুচে করে রাখে মাজন লগিয়ে। কোথাও বা হাতের ওপর গোঁদ কেটে সৌন্দর্য জাহির করার প্রথা রয়েছে। তাই বলে কি তা সব দেশের মানুষেরই সুন্দর বলে গ্রহণ করাও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে?

কখ্‌খনও নয়। প্রতিটি কাজের ভাল-মন্দ বিচার বিবেচনার জন্য মানুষের জ্ঞান ও বিবেকই হচ্ছে সবচাইতে বড় মানদণ্ড আর তার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, তাই হবে সঠিক ও অভ্রান্ত। তাই যখনই আমরা কোন ব্যাপারে বা মানুষের কোন বিশেষ অবস্থার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে মনস্থ করি, তখন তার জন্য সে দুটো মাপকাঠি বা মানদণ্ডের ওপরে নির্ভর করাই বাঞ্ছনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

আমি গোড়াতেই বলে এসেছি যে, মানব জাতির গোটা অবস্থা এমনি একটা

বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ভাল-মন্দ ও সব রকমের সবক হাসিল করা যায়। একদল লোক যদি সেখানে পর্দাকে বন্দী জীবন আখ্যা দিয়ে ঘৃণা করতে শিখে, আরেক দল লোক তখন নারীর হাল ফ্যাসানের নগ্ন চালচলনকে তার চাইতেও ঘৃণার চোখে দেখে পর্দা প্রথাকেই ভাল মনে করে।

যা হোক, এ কথাটা এখন আর কারুর বুঝতে বাকী নেই যে, পর্দা প্রথাই নারীর মর্যাদা ও অধিকার, কল্যাণ ও স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ। এবারে আমাদের বিবেচ্য হবে, পর্দা নারীর জীবনে পূর্ণতা এনে দেয়, না ব্যর্থতা ডেকে আনে? পর্দা কি

নারী প্রগতি বনাম পর্দা প্রথা

মুসলিম জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে, যেখানে যা ভাল রয়েছে তা কুড়িয়ে নেয়া ও যা মন্দ তা বর্জন করে চলা। আমাদের ওপরে ফরয হচ্ছে মানবের সমগ্র জীবনধারা সমালোচনার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিশেষভাবে ঘেঁটেঘুটে না দেখে এবং তার কল্যাণ ও অকল্যাণের দিকগুলো খতিয়ে না দেখে কোন ব্যাপারে অগ্রসর না হওয়া। তাহলেই আমরা ক্ষতিকর কাজ থেকে গা বাঁচিয়ে কল্যাণকর কাজ অনুসরণের দ্বারা সফল জীবন অর্জন করতে সমর্থ হব। খোদাতা'য়ালাও আমাদের এ নসীহতই করছেন যে, অপরাপর জাতির পেছনের ইতিহাস থেকে তাদের ধ্বংসের কারণ বের করে নাও এবং তা থেকে বাঁচতে প্রয়াস পাও। তাহলে তোমাদের আর তাদের মত ধ্বংস ও পতন দেখা দেবে না।

এই নীতির ভিত্তিতেই আমি ইউরোপের আলো ও আঁধার দুটা দিকই পুরোপুরি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। আমরা সেখানকার অতীতের জাতিগুলোর ইতিহাস ঘেঁটে জানতে পেরেছি যে নারীদের বল্গাহারা স্বাধীনতা দেবার ফলে ভবিষ্যতে তাদের আরও সহস্র ধরনের অসহনীয় দুর্যোগ ও দুর্ভোগ তো পোহাতেই হবে, এমনকি পুরুষরাও তাদের হাতে বিপদগ্রস্ত হয়ে তাদের মনীষীদের মত হা মাতম তুলতে বাধ্য হবে। তাই আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে, সেই অনিবার্য পতন ও ধ্বংসের পথ পরিহার করে স্রষ্টার বিধান ও মানব প্রকৃতির গণ্ডির বাইরে আমাদের বিন্দুমাত্রও পা দিতে না হয়।

দুঃখের বিষয় যে, আমাদের তরুণদের এক দলকে নারী স্বাধীনতার ভূতে পেয়ে বসেছে। তারা তা থেকে মুক্ত হয়ে ইউরোপের শ্লোগান সর্বস্ব নারী স্বাধীনতাকে সামাজিক ব্যাধি ও বিকৃতি ভাবতে অক্ষম। ইউরোপের সর্বজন স্বীকৃত যুগস্রষ্টাদের সাথে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাঁদের মত সে সব অনাচারের অপপ্রচার থেকে দেশকে মুক্ত ও পবিত্র রাখার প্রচেষ্টার বদলে তারা এমন সব নির্বোধ ও বিভ্রান্ত ইউরোপীয়দের অনুসরণ করে চলছে, যারা স্বদেশের চিন্তাশীল মনীষীদের কাছেই ঘৃণার্হ্য ও পরিত্যাজ্য। একটু পরেই আমি ইউরোপের সুধী সমাজের মতামত উদ্ধৃত করে তা

প্রমাণ করে দেখাব।

আক্ষেপ! আমার দেশের নব্য সমাজ আজ ইউরোপের অন্ধ অনুসরণের ভেতরেই মানব জীবনের উন্নতির একমাত্র চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। তারা যদি একবারও ইসলামের অতুলনীয় সমাজ ব্যবস্থার নিখুঁত বিধানগুলোর ওপরে চোখ বুলিয়ে দেখত, তাহলে তারা অবশ্যই দেখতে পেত যে, ইসলামের পবিত্র প্রাণশক্তির স্বাস্থ্যকর প্রভাব, সে সব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মারাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার শক্তিই দান করছে। কিন্তু আমরা তো তার থেকে তখনই উপকৃত হতে পারব, যখন সেই প্রাণশক্তিকে আমাদের ভেতরে গ্রহণ করতে সমর্থ হব। মিঃ কাসেম আমীন বেগ তাঁর আল্ মারআতুল্ জাদীদায় লিখেছেনঃ

"তাই আমরা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করতে পারি যে, আমাদের দেশেও প্রতি বছর আগের বছরের চাইতে বাইরের কর্মক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। কারণ, আমরাও আজ সেই রাজপথে এগিয়ে চলেছি, যে পথে ইউরোপ আমাদের আগেই পদক্ষেপ করেছে।"

আমি বিজ্ঞ লেখকের এ ধারণার সাথে একমত হতে পারছি না। আমরা যে ইউরোপের অনুসৃত পথ ধরেই চলেছি, তাও মানতে রাযী নই। সেরূপ আশাও আমরা কখন পোষণ করিনি। এখনও যদি কেউ ইউরোপের জীবন ব্যবস্থা এবং আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়, তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাবে যে, উভয়ের জীবন ধারা ও তার উপকরণাদির ভেতরে তেমন কোন যোগ নেই।

যেমন, আমাদের জাতীয় দর্শন গড়ে ওঠে ধর্মকে ভিত্তি করে। আমরা এ বিশ্বাস বেশ মজবুত করে নিয়েছি যে, সে বুনিয়াদ আমাদের যদি কখনও টলে যায়, তাহলে ইহ ও পারলৌকিক মর্যাদা ও ঐশ্বর্যের আসন থেকে নেমে আমাদের পংকিল ধূলা মাটিতে গড়াগড়ি যেতে হবে। পক্ষান্তরে ইউরোপের জাতীয়তা গড়ে ওঠে গোত্র বা ভৌগোলিক এলাকাকে ভিত্তি করে। তাদের ধারণামতে বর্তমান যুগে তাদের সর্ববিধ উন্নতির চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে ধর্মহীন বৈষয়িক শিক্ষার ভেতরে।

তাই, আমাদের জীবন পদ্ধতির সাধারণ বিধানগুলোও ওপরে সামান্য দৃষ্টিপাত করেই যে কেউ এ কথা সহজে বুঝে নিতে পারে যে, যদ্দিন আমরা ধর্ম ছেড়ে গোত্র, ভাষা বা ভৌগোলিক ভিত্তিতে গড়া জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী না হব এবং ইস্লামকে বাদ দিয়ে (খোদা রক্ষা করুন) আমাদের উন্নতির চিন্তা না করব, তদ্দিনে আমরা

ইউরোপের হুবহু পদাঙ্কানুসরণ করতে সমর্থ হব না কিছুতেই। এখানে আমার জিজ্ঞাস্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, ইসলামই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্যবস্থা ও সর্বরোগের প্রতিষেধক, ততক্ষণ কি করে অনুরূপ ধ্বংসাত্মক চিন্তা আমাদের মাথায় ঠাঁই পাবে?

এ অভিমত তো শুধু আমিই পোষণ করছি না। ইউরোপের বহু মনীষীই এ মতের পরিপোষক। তারা খুব ভালরূপেই জানেন যে, বিশ্বত্রাস মুসলমানদের আজকের এ অধঃপতনের মূল হচ্ছে তাদের স্বধর্মে ঔদাসীন্য প্রদর্শন। সারকথা এই, যতক্ষণ আমাদের উন্নত সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীর অপরাপর জাতির থেকে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলবে, খোদা চাহেন তো তা থাকবেও, ততক্ষণ কিছুতেই আমরা অপর কোন জাতির অন্ধ অনুকরণ করতে পারবো না। কারণ, তার ফলে আমাদের সামাজিক কাঠামোর রূপ বদলে যাবে। তাই তা আমাদের মজ্জাগত স্বভাবের সাথে কোনদিনই খাপ খাবে না।

এখানে আরও একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইউরোপ নারীদের ব্যাপারে যে পথ অনুসরণ করে চলছে, তাদের মনীষীদের সাক্ষ্য থেকেই জানতে পাই যে, তা খুবই বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়ে চলছে। কারণ, ইউরোপের আলোকপ্রাপ্ত সুধী সমাজ নারীদের পুরুষের কাজ সামলাতে ব্যস্ত দেখে তাকে এরূপ এক সামাজিক ব্যাধি বলে ঘোষণা করছেন যার আশু প্রতিকার ব্যবস্থা অপরিহার্য। তবুও আমরা এমনকি দায়ে পড়ে গেলাম যার জন্য তাদের সেই ব্যাধি অহেতুক আমাদের ঘাড়ে তুলে নিয়ে তজ্জনিত সহস্র ধরনের দুর্ভোগের শিকারে পরিণত হব? অথচ সেই কঠিন দুর্ভোগের অসহনীয় যন্ত্রণায় গোটা ইউরোপ আজ তারস্বরে চীৎকার দিচ্ছে। যদি ইউরোপের অনুকরণ একান্তই আমাদের করতে হয়, তাহলে যেসব ক্ষেত্রে তারা সঠিক ও উত্তম পথ অনুসরণ করছে, তা দেখছি না কেন?

যা হোক, আমাদের আদপে কোন কিছুই বিনা বিচারে গ্রহণ করা উচিত নয়। জ্ঞান ও বিবেকের কষ্টি পাথরে ভাল-মন্দ যাচাই করে তারপর যা ভাল, যা কল্যাণকর, তাই নেয়া উচিত। নিছক বাহ্যিক চাকচিক্যে বিভ্রান্ত হওয়া বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয় আদৌ। যদি আমাদের আত্মবিশ্বাস না থাকে, তাহলে অন্তত ইউরোপের মনীষীরা তাদের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে যেসব মূল্যবান গ্রন্থ লিখে গেছেন, সেগুলোর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে দেখা উচিত। তাদের সেসব মতামত নোট বইতে লিখে তারপর নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে মাথা ঘামানো উচিত। তাহলেই বুঝতে পারব

যে, আমরা যদি নিজেদের ব্যাধির প্রতিকার নিজেরাই না করি, তাহলে অপর কোন জাতি এসে করে দেবে বলে আশা করা বাতুলতা মাত্র।

মনীষী 'ফাওরীয়া'র মতামত শুনে নিন। দেখুন যে, নারী স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষকতা করেও তিনি কিভাবে তাদের জীবিকা সংগ্রামের চরম দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরেছেনঃ

"আজকে নারীর অবস্থা কিরূপ? তারা বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের জীবন যাপন করছে। কাজ কারবারের গোটা দুনিয়ায় পুরুষেরই একচেটিয়া রাজত্ব চলছে। এমনকি সেলাই ও শিল্পের কাজেও পুরুষরা দখল জমিয়ে বসেছে। ফলে, নারীদের করতে হচ্ছে এখন যত রকমের কঠিন পরিশ্রম ও হাড়ভাঙ্গা খাটুনির কাজ। এখন বলুন, সর্ববিধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত নারীরা কি উপায়ে জীবন ধারণ করবে? তারা চরখা চালিয়ে খাবে, না রূপ দেখিয়ে দেহের বেসাতি করে জীবিকার ব্যবস্থা করবে? অবশ্য তাও তাদের সবার থাকলে তো!"

কতিপয় লোকের ধারণা যে, সমাজ বিধান ও জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের ইউরোপকে হুবহু অনুসরণ করে চলা উচিত। তাদের মতে সেটাই হচ্ছে আমাদের উন্নতির একমাত্র উপায়। আমি ত বার বার বলছি যে, আমাদের পথ ও ইউরোপের পথ সম্পূর্ণ পৃথক-একেবারেই বিপরীতমুখী। আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি যে, ইসলামী সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা আমাদের যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর অপরাপর সব জাতি থেকে পৃথক রেখে আসছে এবং খোদা চাহেনতো ভবিষ্যতেও রাখবে। তার আদর্শ ও দর্শন যতক্ষণ আমরা প্রত্যেকের অন্তর থেকে চিরতরে ধুয়ে ফেলতে না পারব, ততক্ষণ কোনক্রমেই ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। অথচ তা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, ইস্‌লামের দুর্জয় প্রাণশক্তি আমাদের এমনি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রেখেছে যে, অন্য কোন জাতি তা থেকে হাজার চেষ্টা করেও আমাদের বিচ্যুত করতে পারে না। আর যখনই তা সম্ভব হয়, তখন ইস্‌লামই আমাদের জাতীয় বুনিয়াদকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়।

এখন তার উদাহরণ নিন। আমাদের ভেতর থেকে দু'চারজন যারা ইউরোপে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে গমন করেছে, দেখতে পাবেন, সেখানকার জড়বাদী শিক্ষা ও সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যের মোহ তাদের অদ্ভুত উপায়ে আবিষ্ট করে ফেলেছে। ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার যাদু তাদের এমনিভাবে পেয়ে বসেছে যে, তাদের চালচলন, পোষাক-আষাক, কথাবার্তা, সালাম-কালাম, আহার বিহার, এক কথায় সবকিছুই ইউরোপের অন্ধ অনুকরণের ভেতরে বিলীন হয়ে চলছে। তাদের ওপর

একবার দৃষ্টিপাত করে বলুন দেখি, আজ কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাদের? তাদের কী বলে অভিহিত করা চলে? তারা কি এশিয়ার অধিবাসী বলে মনে হবে?

কখ্খনও নয়। কারণ, তারা আজ কথায় কথায় এশিয়া ও এশিয়ার অধিবাসীদের গালি দিচ্ছে। এখানকার রীতিনীতি ও চালচলনকে হেয় ও ঘৃণ্য মনে করছে। এশিয়ার দেশগুলি সবদিক থেকেই অনুন্নত, সবক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ-এছাড়া আর তারা কিছু ভাবতেই পারে না। স্বদেশের যে দিকেই তারা তাকায় 'আহা' বলে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ছাড়া তাদের উপায় থাকে না। যেদিকেই তাদের চোখ পড়ে, তাদের শুধু আক্ষেপই জেগে থাকে।

তবে কি তারা পুরোপুরি ইউরোপীয়ান বনে গেছে? তাও নয়। কারণ, তাদের আকৃতি যে তার বিরুদ্ধে জোর গলায় সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের মজ্জাগত স্বভাব প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ তার বিপরীতই প্রমাণ করে চলছে।

যদিও তারা মুখে মুখে নিজেদের খুবই শিক্ষিত ও উন্নত বলে জাহির করছে, মূলত তারা স্বভাববিরুদ্ধ শিক্ষা পেয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছে। তাদের ভেতরে আজ কোন কর্মপ্রেরণাও সাহস বা শৌর্যও নেই। তাদের ভেতরে এমন কিছুই পাওয়া যায় না যা থেকে দেশবাসী উপকৃত হতে পারে বা দেশের কোন কল্যাণ হতে পারে। এমনকি দেশের অর্থে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পরে তাদের ওপরে যে দায়িত্ব বর্তায়, তাও পালন করার ক্ষমতা তাদের থাকে না।

এরূপ কেন হচ্ছে? কারণ, তারা চাচ্ছে যে, ইউরোপের পুরোপুরি নমুনা হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পরিষ্কার অনুভব করছে যে, তাদের ভেতরে এমন একটা কি যেন বিরুদ্ধ শক্তি রয়েছে, যা তাদের ইউরোপের সাথে একাকার হয়ে যেতে দিচ্ছে না। ফলে, তারা এক তুমুল মানসিক দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়নে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে।

তবুও তারা ইউরোপের কার্যধারাকে এ জন্য ভুলতে পারছে না যে, সেগুলোকে তারা কিছুদিন ধরে খুব আগ্রহ সহকারে মশ্ক করে দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত করে ফেলেছে। তাই তারা সুধী ও সূক্ষ্মদর্শী সমাজের চোখের করুণার পাত্রই হয়ে দাঁড়াল ঃ

گئے دو نوں جہان کے کام سے وہ
ے ھونےحنہ اد ھر کے ھو ئےنہ اد ھر ك

দুকূল হারা হয়েই তারা ভাসছে সদায়
হায়রে কপাল! এদিক হারায় ওদিক না পায়।

* * *

পক্ষান্তরে, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, সার্ভিয়া, মন্টিনিগ্রো প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলোর তরুণরা প্যারিস ও লণ্ডনের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে এলে দেশবাসী তাদের নির্ভরযোগ্য বলেই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তারা দুঃসাহসিক কাজ ও অশেষ জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা দেশবাসীর প্রশংসা কুড়িয়ে নিতে সমর্থ হয়। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই, ইউরোপিয়ান হিসেবে তারা সবাই একই মন ও মগজের অধিকারী। তাদের জীবনধারা একই খাতে বয়ে চলে বলেই তারা বাইরের শিক্ষা ও ভেতরের সংস্কারের দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয় না বা দেশবাসীর নিন্দাভাজন হয় না। তারা নতুন করে সেখানের আচার-ব্যবহার শিখতে যায় না ; বরং শিখবার যা তাই শিখে বলেই তা তাদের কাছে কল্যাণকর ও সার্থক হয়ে ওঠে।

অপরদিকে মিসর বা পাক-ভারতের তরুণরা সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখতে গিয়ে স্বদেশ ও স্বজাতির সবকিছু বড় করে তুলে ধরার বদলে পাশ্চাত্যের বাইরের চাকচিক্যে বিভ্রান্ত হয়ে স্বদেশ ও স্বজাতিকে গালি দিতে ও ঘৃণার চোখে দেখতে শেখে। সেখানের যা কিছু শিক্ষণীয়, তা তাদের কাছে বড় হয়ে উঠে না। ফলে, দেশ ও জাতির চোখে স্বভাবতই তারা দুর্বহ বোঝা বৈ কিছুই হয় না।

এক্ষণে আবার আমি নারী সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করে বলতে চাই যে, যে মুসলমানরা নারীদের এমনকি নিকট সম্পর্কীয় ভাই বেরাদরের সামনেও বেরোতে দেয় না (অথচ তা হচ্ছে পর্দার কঠোরতম রূপ) এবং যথাসাধ্য পর্দার কড়াকড়ি অব্যাহত রেখে চলে, তাদের থেকে এ আশা কি করে করা যায় যে, তারা স্বীয় স্ত্রী বা কন্যাকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করবে যার ফলে ওরা বাজারে দোকান খুলে বসবে বা কারখানায় গিয়ে পুরুষের সাথে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করবে? যে ক্ষেত্রে মুসলমানরা নিজ নিজ স্ত্রীর কণ্ঠস্বর পর্যন্ত কোন পুরুষকে শুনতে দিতে নারাজ, সেক্ষেত্রে তাদের মেয়েদের কি করে তারা সে শিক্ষা দিতে রাযী হবে, যার ফলে ওরা পুরুষের সাথে জীবন সংগ্রামের মুক্ত ময়দানে নেমে রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ঝেড়ে বেড়াবে? অথচ তার ফলে হাজার হাজার ভিন পুরুষ ওদের দেখবে, ওদের কণ্ঠস্বর শুনবে।

প্রায় এক শতাব্দী হল মাত্র মুসলমানরা ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসেছে। এর আগেও তো তারা বহু পর্দাহীন জাতির সাথে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মিলেমিশে চলে আসছে। কিন্তু, তার ফলে তাদের ভেতরে উত্তরোত্তর পর্দার কড়াকড়ি বেড়েছে বৈ

কমেছে কি? আজ পর্যন্ত কি তারা সে সব জাতির যুগ-যুগান্তরের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে পর্দা প্রাচীর ভেঙ্গে তাদের সাথে একাকার হয়ে যাবার কল্পনাও করেছে? তবুও যদি বলা হয় যে, নারী স্বাধীনতা মেনে নেয়ার ভেতরেই মুসলমানদের সর্ববিধ কল্যাণ ও উন্নতির চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে, তাহলে স্মরণ রাখবেন যে, সে উন্নতির শীর্ষদেশে চড়ে বেড়াবার আগেই মুসলমানরা দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে। তারা তখন অন্য কোন নামে বেঁচে থাকতে পারে হয়ত। কিন্তু, ইসলামের সুশীতল ছায়াতল থেকে সেদিন তারা চিরতরে বিতাড়িত হবে–সন্দেহ নেই।

তবুও আমাদের হতাশ হবার কারণ এখনও দেখা দেয়নি। যদি আমরা এখনও সবাই বুঝতে সমর্থ হই এবং এক বাক্যে মেনে নিই যে, পুরুষের সাথে বাইরের কাজ কারবারে নারীদের অংশগ্রহণ করতে দেয়া জাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক একটা ব্যাধি বৈ কিছুই নয়, তাহলে তার প্রসারতা কামনা না করে বিলোপের প্রয়াসকে অগ্রাধিকার দেব এবং এভাবে আমরা স্বজাতির প্রচলিত ধারণাকেই কাজে লাগিয়ে ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলব। আমরা যখন পরিষ্কার জানতে পারলাম যে, স্রষ্টা ও তাঁর প্রকৃতির বিধানের বিরোধিতাই হল যে কোন জাতির ধ্বংসের মূল, তখন আমরা দুনিয়ার বড় বড় মনীষীদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নারী স্বাধীনতাকে প্রকৃতির বিধানের পরিপন্থী জেনেও তা পরিহার করে চলব না কেন? আর এ কথাও তো সত্যি যে, প্রকৃতির বিধান ও স্রষ্টার পবিত্র ফরমানের খেলাফে আমরা যা কিছুই করতে যাই না কেন, শেষ পর্যন্ত গোড়ার অবস্থায়ই ফিরে আসতে হবে। তবে তা বিদ্রোহের যথাযোগ্য শাস্তিভোগ করার পরেই–আগে নয়। কারণ, প্রকৃতির বিধান অপরিবর্তনীয়। স্বয়ং স্রষ্টা বলেন ঃ

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্‌র প্রকৃতির বিধানের কখ্খনও ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না।

পর্দার সার্থকতা

যুগে যুগে মানুষের ভেতরে এ প্রভাবটা চিরন্তনরূপেই দেখতে পাওয়া যায় যে, কোন মানুষ যদি কোন একটা মত ও পথকে যে কারণেই হোক–পছন্দ করে ফেলে, তাহলে তার সমর্থনে হাজার রকমের যুক্তি সংগ্রহের কারসাজি চালানো সে ব্যক্তির স্বভাবসিদ্ধ কাজে পরিণত হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে কোন কারণে যদি সে কোন একটা কাজকে মন্দ বলে ফেলে তাহলে তার বিরুদ্ধে দুনিয়ার যত দলীল আদিল্লা হতে পারে তা সবই যোগাড় করে নেয়। তাই বিশ্ব-প্রকৃতির অবস্থা ও তার স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারা যদি তার অন্তর্নিহিত সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণরূপে প্রতিভাত হয়ে না চলত, তাহলে নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, দুনিয়ার মানুষ কোন দিন যথার্থ সত্যকে খুঁজে বের করতে সমর্থ হত না। পরন্তু তারা বিভ্রান্তির চক্রজালেই ঘুরপাক খেয়ে মরত। কারণ, স্বয়ং খোদা বলছেন ঃ

وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَئٍ جَدَلاً

অর্থাৎ ঃ মানুষ বড়ই ঝগড়াটে স্বভাবের।

'আল্ মারআতুল জাদীদা'র লেখক বলছেন ঃ

"পর্দার বড় রকমের ক্ষতিকর দিকগুলো হল এই, তা নারীদের স্বাভাবিক স্বাধীনতা হরণ করে তাদের পূর্ণভাবে গড়ে উঠবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রয়োজনীয় মুহূর্তেও তাদের নিজের রুজী কামাই করে খেতে দেয়া না। স্বামী-স্ত্রী মিলে জ্ঞান সংস্কৃতির জগত থেকে আনন্দ আহরণ করে বেড়াবার সুযোগ দেয় না। পর্দা নারীদের যোগ্য মা হতে দেয় না। ফলে, তাদের সন্তানরা উপযুক্ত পরিচর্যা ও শিক্ষা-দীক্ষা পায় না। এই পর্দা প্রথার পরিণামে মানব সমাজের অর্ধাঙ্গ অচল হয়ে বোঝার মতই ঝুলতে থাকে।"

এখন আমি বলছি যে, আগে যেসব উদ্ধৃতি ও প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার কল্যাণকর দিকগুলো এই ঃ

১। পর্দা নারীদের যথার্থ ও স্বাভাবিক স্বাধীনতার নিরংকুশ স্বাদ উপভোগ করার পূর্ণ সুযোগ দান করে। নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা যে কিরূপ তা আপনারা অবশ্য জেনে এসেছেন।

২। পর্দা নিজকে গড়ার ব্যাপারে নারীকে পূর্ণ সহায়তা করে। কিরূপে গড়ে ওঠার ব্যাপারে? মা হিসেবে গড়ে ওঠার ব্যাপারে।

৩। পর্দা পুরুষের ক্ষেত্রে নারীদের অবৈধ হস্তক্ষেপ বন্ধ রাখে। কিরূপ অবৈধ হস্তক্ষেপ? যা জড় সভ্যতার মেরুদণ্ড পর্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছে। যার ক্ষতিকর পরিণাম সম্পর্কে ইউরোপ ও আমেরিকা উভয় মহাদেশের মনীষীরা জোর গলায় সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এমনকি তাঁরা সেখানকার অধিবাসী ও সরকারের ওপরে অনবরত চাপ দিচ্ছেন নারীদের সঠিক জীবন ধারা অনুসরণের ব্যবস্থা করতে।

৪। পর্দা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখময় করে। উভয়কে সে জীবনের আনন্দ পুরোমাত্রায় উপভোগ করার সুযোগ করে দেয়।

৫। পর্দাই এমন সব যোগ্য মায়ের সৃষ্টি করতে পারে, যারা সন্তানদের পুরোপুরি ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলবার ও আদর্শ পথে পরিচালিত করবার ক্ষমতা রাখে।

৬। পর্দাই মানব সমাজের বাহ্যিক শৃংখলা এনে দেবার সাথে সাথে ভেতরের শান্তি দান করে। যে কোন মানুষের দৈহিক সুস্থতার সাথে মানসিক শক্তিলাভের মতই তা পূর্ণ সুস্থ ও সবল সমাজের পত্তন করে।

আমি তো এসব কথাই ইনিয়ে বিনিয়ে এরূপও বলে দিতে পারতাম ঃ পুরুষের জন্য এর চাইতে উত্তম ব্যবস্থা আর কি হতে পারে যে, তার সর্বদা এরূপ এক অংকশায়িনী রয়েছে, যে শয়নে-স্বপনে, দিনে-রাতে, দেশে-বিদেশে, সুখে-দুঃখে, রোগে ও নিরোগে সব অবস্থাতেই তার সমভাগী বন্ধুরূপে লেগে থাকে। জ্ঞান বুদ্ধি ও আচার ব্যবহারে সে পুতুলের মত ইচ্ছানুরূপ গড়ে উঠে। নিজের স্বামীর কখন কোথায় কি দরকার, সবই সে জানে। স্বামীর মন মেজাজের সে পুরোপুরি খবর রাখে। তার ঘরের ষোল আনা কাজ সে আঞ্জাম দেয়। তার স্বাস্থ্যের দিকে প্রতিটি মুহূর্ত লক্ষ্য রাখে। স্বামীর মর্যাদার প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। তার সব কাজে প্রেরণা যোগায় ও সব রকমের কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকে। স্বামীকে তার দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সজাগ রাখে। সে ভাল করেই বিশ্বাসী যে, স্বামীর কল্যাণেই তার কল্যাণ ও স্বামীর অকল্যাণে তারই অকল্যাণ। তাই স্বামী ও সন্তানের জন্য সে কল্যাণময়ীই হয়ে দাঁড়ায়।

এরূপ একজন বান্ধবী যার ঘরে নেই, সে পুরুষ কি কখনও ভাগ্যবান বলে বিবেচিত হবে? কি করে তাকে ভাগ্যবান বলব, যার এমন একটি স্ত্রী নেই, যে তার ওপরে আত্মসমর্পণ করে রেখেছে। যে ক্ষমতা ও গুণপনায় সাক্ষাৎ দেবী। যার ওপরে সে মনপ্রাণ ঢেলে দিতে পারে নিঃশেষ করে। যে সর্বদা তারই মর্জী রক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকবে। জীবনের পবিত্র লক্ষ্যে ও কাজে যেই প্রিয়া ও অংকশায়িনীর সহায়তা সে লাভ করবে। তার থেকে সর্বোত্তম চরিত্র ও আচার-ব্যবহার শিখবে। এরূপ সত্যিকারের সঙ্গিনী, যে হবে তার ঘরের আলো, অন্তরের শান্তি, অবসরে চিত্ত বিনোদিনী, দুঃখ-কষ্ট বিদূরিকা, এমনকি প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতই যে তার চোখের মণি হয়ে সক্রিয় থাকবে।

বলুন দেখি, এরূপ মজার হাজার রঙ-বেরঙের কথা কি আমরা শোনাতে পারি না? এরূপ হাজার ধরনের চিত্তাকর্ষক বুলি কি আমাদের মুখে আসে না? আসে, অবশ্যই আসে। বরং এর চাইতেও চমৎকার লাইন সাজাতে পারি, মন ভুলানো বাক্য রচনা করতে পারি। কিন্তু, কথা হচ্ছে যে, আমরা তো বাস্তব কর্মজীবন নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক আলোচনায় রত হয়েছি। আমরা তো আর এখানে মামার বাড়ীর আবদার তুলে রঙিন স্বপ্নের ঘোরে পুষ্পোদ্যানে উড়ে বেড়াচ্ছি না। পৃথিবীতে এমন লোক পাবেন না যার প্রাণে এ ধরনের কয়েক হাজার আশা-আকাঙ্ক্ষা এর চেয়েও আবেগ নিয়ে বাসা বাঁধে নাই। তবে, বাস্তবায়িত হয় ক'টি?

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কেন প্রায়গুলো বাস্তবায়িত হয় না? কারণ, কর্মজগতের চাবিকাঠি তো আর মানুষের হাতে নয়। যদি তাই হত, তাহলে দুনিয়ায় সবাই সব ধরনের আশাই পুরা করে নিত। প্রয়োজনেও ভাগ্যহত ও আক্ষেপকারী একটা মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না।

আহা! যদি কথার তুড়িতেই মানুষের অবস্থা শুধ্‌রে যেত, তাহলে বিজ্ঞ লেখক বন্ধুর সুবিধার অন্ত ছিল না। সেরূপ ক্ষেত্রে তো আমিও স্বচ্ছন্দে বলে দিতাম–কারুর পক্ষে এর চাইতে সৌভাগ্যের ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, ফুলে ফলে সুসজ্জিত এক বাগিচার মাঝখানে আকাশচুম্বী একটা শাহী প্রাসাদ তৈরী করে বাদশাই ঠাঁট নিয়ে সে জেঁকে বসবে। সামনে তার করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে অসংখ্য চাকর-বাকর, অজস্র দাস-দাসী। যারা ডাকার আগেই হাযির থাকবে, বলার আগেই কাজ করবে, চা'বার আগেই খাবার দেবে। প্রভুর পরাণে সামান্যতম তক্‌লিফ যারা সহ্য করবে না। আর প্রভুটিও সেরূপ উচ্চাভিলাষী, সৎসাহসী ও সুধী ব্যক্তি, যে সমাজ, জাতি ও দেশের দশের যত রকম ভাল'ই থাকতে পারে তা ষোল আনা করে ফেলে ইতিহাসে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার ব্যবস্থা করে থাকে। যুগ যুগ ধরে সে দুনিয়ার

মানুষের মুখে মুখে প্রবাদ বাক্য হয়ে উচ্চারিত হবে। পরবর্তী কালের মানুষ তার উদাহরণ তুলে ধরে তাদের নেতাদের পথ চলার প্রেরণা যোগাবে, বিপুল উদ্যম-উৎসাহ সৃষ্টি করবে তাদের প্রাণে।

সৌভাগ্যক্রমে তার একটা সন্তানও থাকবে। তাকে সে তার মহান চরিত্রের ছাঁচেই ঢেলে গড়ে তুলবে মনের মতন করে। তাকে নিজের মতই নির্মল জীবন ও উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী করে যাবে। খোদাও তার মর্জীর ষোল আনা মর্যাদা দিয়ে সে সন্তানকে মহান স্বভাবসুলভ সঠিক বিবেকশক্তি দান করবেন। যার বদৌলতে সেও হবে চরম ঐশ্বর্যের মাঝে থেকেও নেহাৎ ধর্মভীরু। তাদের গোটা পরিবারে তাই থাকবে না কোন রোগ-শোক-জ্বরা-মৃত্যুর করাল ছায়াপাত। শান্তির বন্যা নেমে আসবে সে সংসারে। তেমনি অঢেল আরামের জেন্দেগানী পার হবে তারা শাহাদাতের শরাবান তহুরা পান করে।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, এরূপ মজার আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপন কাহিনী শুনে কেউ কি কম আনন্দ পাবে? মোটেও নয়। এরূপ রঙিন কামনার সাথে সে আরও কিছু জুড়ে নিয়েও শুনতে প্রস্তুত। কারণ তার নিজস্ব স্বপ্ন বিলাসের সাথে এটা পুরোপুরি খাপ খেয়ে যাচ্ছে। এখন খোদার দিকে চেয়ে একটু বলুন তো, এরূপ চমৎকার জীবন ক'জনের ভাগ্যে এ নশ্বর জগতে জুটেছে? এমনকি ক'জন সম্পর্কেই বা এতটুকু বলা যায় যে, এরূপ জীবনের কাছাকাছিও তারা গিয়েছে?

বিখ্যাত মনীষী প্রধান ও দার্শনিক প্রবররা অনেক কিছু চিন্তা ও গবেষণার পরে দু'দলে ভাগ হয়ে গেছেন। একদল দার্শনিকের মত হচ্ছে, এ পৃথিবীতে শান্তি ও আনন্দ বলতে কিছুই নেই। জীবনের আগাগোড়াই শুধু বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট আর হয়রানি-পেরেশানিতে ভরপুর। তাই তারা নিরাশবাদী সেজে দুনিয়ার ব্যাপারে পলায়নী মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দেন।

আরেকদল দার্শনিকের মতে, মানুষের পার্থিব জীবন ভাল-মন্দে, সুখ-দুঃখে বিমিশ্রিত। সৌভাগ্য সে ব্যক্তির যে এর ভেতরে থেকে সুখের জীবন বেছে নিতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে সেই জীবনের গোপন চাবিকাঠি। আর সে জানে, কিভাবে দুঃখময় জীবনের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকতে হয়। এরূপ ব্যক্তি জীবনভর এই বিশ্ব সাগরের অথৈ জলে ঝাপ দিয়ে তরংগে তরংগে ভেসে চলে। কখনও প্রবল তরংগের কবলে পড়ে বেশ করে ডুবনি খায়, কখনও বা সে তরংগের তাড়ায় ভেসে উঠে আলোর ঝলকে উদ্ভাসিত হয়। এভাবেই তার পার্থিব জীবনটা উত্থান-পতনের

ভেতর দিয়ে শেষ হয়ে যায়। তারপরে সে পাড়ি জমায় সেই অবিনশ্বর জগতে, যেখানে তার এ জীবনের কঠোর সংগ্রামের সুফল মজুদ রয়েছে। সেখানে গিয়ে হয় সে স্থায়ী শান্তির কোলে আশ্রয় নেবে, নয় চির অশান্তির দাবানলে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হতে থাকবে।

এ দু'দলের প্রথম দলের মতে তো আমাদের মন এ জন্য সায় দেয় না যে, তার শিক্ষা ও অনুমান প্রকাশ্য ব্যাপারের বিপরীত। এখন বিবেচ্য হচ্ছে দ্বিতীয় দলের অভিমত। এ মতটা অবশ্যি বিবেচনাযোগ্য এবং পার্থিব জীবনের বাস্তব পন্থারূপে গ্রহণ করার জন্যও উপযোগী।

তবে, এই দুর্বল মানব জাতি–যারা এমন কি প্রায়ই সুখ-দুঃখ ও আরাম-আয়েশের কারণ খুঁজে পায় না, কোন্ কারণে কোন্‌টা আসে তা ঠিক করতে পারে না, এ জীবনের জটিলতা তাদের কাছে এরূপভাবে প্রকট হয়ে ওঠে যে, কখনও তারা ভাল ছেড়ে মন্দের দিকেই সকল প্রচেষ্টাকে জড়ো করে দেয়। ফলে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও এমন ব্যাপারে জড়িয়ে যায়, যা থেকে সজ্ঞানে তারা বাঁচবারই ইচ্ছা পোষণ করত।

নশ্বর দুনিয়ায় তো এমন কোন ভার নেই যার সাথে মন্দ কিছুটা জুড়ে নেই। এমন কোন নির্ভেজাল সুখ নেই যার সাথে বিন্দুমাত্র দুঃখ মিশে নেই।

هر جاکه گل است خار است
وهر جاکه نور است نار است

যেখানেই আছে ফুল, কাঁটা আছে তার,
যেখানেই আলো রয়, সাথেই আঁধার।

* * *

তাই যে ব্যক্তি ভাল ও কল্যাণকর দিককে মন্দ ও ক্ষতিকর ব্যাপার থেকে বেছে বের করে নেবার শক্তি রাখেন, নিঃসন্দেহে সে-ই পৃথিবীর বুকে সবচাইতে সৌভাগ্যের জীবন লাভ করেন। তারা এমনকি সেই আসহাবে সোফফার মর্যাদা লাভ করবেন, যাঁরা ছিলেন রসূলের সংসার বিরাগী সাহাবী।

এখন কথা হচ্ছে যে, সে মর্যাদা লাভের উপায় কি? মানুষ তো আর দুনিয়ার প্রয়োজন থেকে মুক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়? একে অপরের সাহায্য না নিয়েও তো তারা চলতে পারে না। মানুষ যে কাজই করতে থাক না কেন, তাতে যদিও কোন সুবিধা

দেখা দেয়, সাথে সাথে অসুবিধাও দেখা দেয় অনেক। যেখানেই একটা কল্যাণ পাওয়া যায়, কয়েকটি অকল্যাণ এসে পর পর তার সাথে জুড়ে যায়। যদি কেউ ভাল কাজের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, তার সাথে অংশগ্রহণ করে হয়ত এমন সব লোক, যারা তা করে তোলে খারাপ। তার যদি একটা বিপদ কেটে যায়, সাথে সাথে বিভিন্ন সংশ্রব থেকে বহু বিপদ এসে তাকে ঘিরে। এভাবেই মানুষ এ নশ্বর দুনিয়ায় তাদের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করার আগেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

এরূপও দেখা যায় যে, একটা কাজ সবার কাছেই সমানভাবে ভাল মনে হয়। তবুও দেখা যায়, একদল লোক তা থেকে দূরে থাকে। এটা হয় কেন? তাদের শক্তিও রয়েছে সে ভাল কাজটা করার। কিন্তু, সামাজিক, জাতীয় বা গোত্রীয় বাঁধন তাদের সে পথে এগিয়ে যেতে বাধা দেয়। এসব ব্যাপার মানুষের মনে এরূপ মারাত্মক প্রভাব ফেলে যে, সে কিছু করার আর উৎসাহ বোধ করে না। মন ভেঙ্গে যায় তার, বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় একেবারেই। তখন যে কি করতে হবে, তা সে ভেবে পায় না।

ঠিক তেমনি মুহূর্তে যদি মানুষ চেতন না হারায় এবং বিচলিত না হয়ে তাঁরই পথে পা বাড়ায় যাঁর হাতে নিখিল সৃষ্টির সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাহলেই সব সমস্যা চুকে যায়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করেই সে কেবল মানসিক শান্তি ও সুস্থিরতা লাভ করতে পারে। তখন সে এমনকি সৃষ্টিজগতের ভেতরে স্রষ্টার অসীম লীলাখেলার অনন্ত সৌন্দর্য বুঝতে পেরে বিস্মিত না হয়ে পারে না। সবটাতেই তখন সে মঙ্গল দেখতে পায় আর দেখতে পায়, দুনিয়ায় ভাল ও মন্দ ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে রয়েছে। স্রষ্টার এটাই হচ্ছে উঁচুদরের এক সৃষ্টিরহস্য। মানুষ সে রহস্যের দ্বার উদঘাটন করতে অক্ষম।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

অর্থাৎ ঃ ভাল ও মন্দকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখে আমি তো তোমাদের পরীক্ষা করছি। অবশেষে আমার কাছেই তোমরা ফিরে আসবে।

তাই সহস্র প্রতিকূল পরিবেশ ও আবহাওয়ার সাথে সংগ্রাম করে যে সঠিক ও সরল পথে স্থির থাকতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তিই হই ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে, যে কখনও বামে, কখনও ডানে অর্থাৎ ঝোড়ো হাওয়ার তালে তালে এদিক ওদিক দুলতে থাকে তার পরিণাম খোদাই ভাল জানেন।

এবারে আসল কথায় আসা যাক। অবশ্য এটাও মানুষের একটা আকাঙ্খা যে, তার স্ত্রী খোলামেলাভাবে অপরাপর মানুষের সাথে গোটা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েও নিতান্ত পুণ্যময়ী সতী সাধ্বী থাকবে। শুধু তাই নয়, স্ত্রীর খায় খাতিরদারীতে সে আরও অনেক উদার হতে প্রস্তুত। স্ত্রী যাতে তার চেয়েও সুখে থাকে, সে ব্যবস্থার জন্য তার প্রাণান্ত চেষ্টা চরিত্তিরে ক্রুটি হয় না। বিন্দুমাত্র দুঃখ কষ্ট যেন স্ত্রী লক্ষ্মীকে স্পর্শ না করে, তার মরণ যেন কেয়ামতেও না আসে, দৈন্য ও ব্যাধির যেন সে নামও শুনতে না পায়-এমনি হাজার আকাঙ্খা স্বামী বেচারার মনের মণিকোঠায় দানা বাঁধতে থাকে।

এতো গেল স্বার্থপরতার দিক। মানুষ বহু নিঃস্বার্থ কামনাও পোষণ করে। স্ত্রী জাতির মতো গোটা স্বামী জাতিও সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাক, আর এভাবে গোটা দেশে সুখের ফিরদাউস নেমে আসুক-এও মানুষের কামনা।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, এ সবকিছুই হচ্ছে মানুষের খেয়ালী পোলাও মাত্র। মানুষ হাজার চেষ্টা করেও দুঃখ-কষ্ট থেকে চিরমুক্তি লাভ করবে না। মরণের হাত থেকেও তাদের নিস্তার নেই। দৈন্য ব্যাধিও তার পেছনে ছাড়বে না। স্বভাব বিরুদ্ধ কাজও তাকে দেখতে হবে, করতে হবে। উপায় নেই। তাদের আকাঙ্খিত পূর্ণ আযাদীর স্বপ্নও তাদের সীমিত করতে হবে। চাপা দিতে হবে তা নিজের গরজেই। তা না হলে সেই একটা আকাঙ্খা মেটাতে গিয়ে তাকে হাজার বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তা বন্ধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমাদের লাগামহীন স্বাধীনতার উদগ্র কামনার মুখে লাগাম দেওয়া।

আমি অস্বীকার করছি না যে, পর্দার কোন খারাপ দিক নেই, স্বীকার করছি যে পর্দা প্রথা একটা বিপদই বটে। কিন্তু সাথে সাথে বলছি যে, সে বিপদ আমাদের তার চাইতেও মারাত্মক বিপদের হাত থেকে বাঁচাবে। কাজেই তাকে ভাল বলে না মেনে উপায় কি?

তাই আমি সবাইকে অনুরোধ করব, সব ব্যাপারেই যেন তাঁরা মনের চাহিদা মেটাবার জন্যে কোমর বেঁধে না নামেন। কারণ, দৈনন্দিন জীবনে আমরা অহরহ দেখছি যে, অনেক কিছু আমরা চেয়েও পাই না। আবার না চেয়েও আমরা অনেক সময় এমন বস্তু পেয়ে বসি, যা পাবার কল্পনাও করতে পারি না। অথচ পাবার আগে যদি আমরা ঘূর্ণাক্ষরে বুঝতে পারতাম তার রহস্য, তাহলে আগেই তা থেকে দূরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা চালাতাম।

যারা নারী সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়, তাদের অধিকাংশের ধারণা এরূপ দেখা যায় যে, স্বয়ংসম্পূর্ণ পুরুষের সাথে স্বয়ংসম্পূর্ণ নারীর অস্তিত্ব তাদের সামনে রয়েছে। সে নারীর কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অসম্পূর্ণতা নেই। সর্ববিধ সৌন্দর্যের সমন্বয়ে সে নারী বড়ই মনোমুগ্ধকর। সে নারী সৌন্দর্যে ও চারিত্রিক নির্মলতায় নিখুঁত ও পরিপূর্ণ। স্বামীর সে তাই চোখের মণি। সংসারের সবার সে প্রাণের শান্তি। উচ্চশিক্ষিতা, স্ব-দায়িত্বে সচেতন এবং ঘরসংসারের সবকিছুই সে সামলে নেয় অনায়াসে।

এতকিছু করার পরেও তার সময়ের মূল্যবোধ তাকে এত বেশী সময় বাঁচিয়ে দেয়, যাতে করে সে স্বচ্ছন্দে বাইরের কাজেও পুরুষের সাথে সমান তালে পা রেখে এগিয়ে যেতে পারে। ঘরসংসারের সর্ববিধ কাজ সে নিমেষের ভেতরে গুছিয়ে নিয়ে দেশ ও জাতির সেবা ও সংস্কারে নেমে যায়। পণ্ডিতদের সাথে সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও বিতর্কে যোগ দেয়। দার্শনিকদের নীতি নির্ধারণ সমস্যা ও ভূগোল শাস্ত্রবিদদের ভৌগোলিক অনুসন্ধান কার্যেও তার মূল্যবান সময়ের বেশ একটা বড় অংশ উৎসর্গ করে দেয়।

স্থুল কথা, সে স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী ভেতর ও বাইরের সর্ববিধ কাজের অশেষ যোগ্যতা ও গুণাবলীর অধিকারিণী। আমারও বিশ্বাস, এরূপ নারী যদি সত্যিই হ'ত, যদি তা পাওয়ার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা থাকত, তাহলে কতই না ভাল হ'ত! তবে কথা হচ্ছে, মানব জীবনের এমন সূক্ষ্মতম ধারাও রয়েছে যা আমাদের ধারণায় আসে না এবং দুনিয়ায় এমন সব সময় ও অবস্থার উদ্ভবও হয়ে থাকে, যা বড় বড় পণ্ডিতদের মাথায় খেলে না। তাই দেখছি, বিজ্ঞ লেখক বন্ধুর কোন কোন কথা যেন মনের ওপরে বিন্দুমাত্রও দাগ কাটতে চায় না।

যখন আমরা সমাজের বিশেষ কোন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই, তখন যে জগতে থাকি তার মোটামুটি অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা রাখা আমাদের ওপরে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তারপর সেই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমাদের বিবেচনা করতে হবে কোন কিছুর ভাল-মন্দ সম্পর্কে এবং খতিয়ে দেখতে হবে যে, মানুষের প্রকৃতিগত অবস্থার সাথে তার কতটুকু সামঞ্জস্য বা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। তাহলেই আমরা কোন ব্যাপারে হয়ত নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব। আমাদের মতামত ও উপদেশ তখন আর অবাস্তব ও অসম্ভব হয়ে দেখা দেবে না।

ধরে নিন, যখন আমরা নারী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে যাই, তখন

আমাদের আগেই জেনে নিতে হবে যে, আমরা সেই নারী সম্পর্কেই আলোচনা করছি, যারা আমাদেরই মত মানুষ। তাদের মধ্যে রয়েছে মানুষের সব ধরনের দুর্বলতা ও বাসনা কামনা। সাথে সাথে আমাদের এও ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা এমন একটা জগতে বাস করি, যা পাপ-তাপ ও দুঃখ-দুর্দশামুক্ত স্বর্গপুরী নয় আদৌ। ঠিক এরূপ ধারণা নিয়ে যখন আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করতে বসব, হলফ করে বলতে পারি, তখনই আমাদের ভেতরের সব উৎসাহ ও উন্মাদনা বরফ হয়ে যাবে। তখন আমরা যা বলব তা বিন্দুমাত্রও খোদা ও তাঁর প্রকৃতির বিধানের বিরুদ্ধে যাবে না, মানব প্রকৃতির ব্যতিক্রম বলে প্রমাণিত হবে না। তখনই আমাদের মতামতের দাম হবে। প্রভাব বিস্তার করবে তা সবার ওপরে। আমাদের শ্রমও তখন সার্থক হয়ে উঠবে।

বিরুদ্ধবাদীরা বলছেন পর্দা প্রথা নারীর জীবনে তিনটা মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে ঃ

১। পর্দা প্রথা নারীর স্বাস্থ্য দুর্বল করে দেয়। তাকে বহু রোগের শিকারে পরিণত করে। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নরম করে ফেলে। এসব মূলত তাদের চারিত্রিক শক্তিও দুর্বল করে দেয়। এ যুক্তির ভিত্তিতেই তারা দাবী করে যে, পর্দানশীন নারীরা জৈবিক তাড়নায় বেশী ব্যতিব্যস্ত থাকে। কারণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শক্তি ও সুস্থতা ভেতরের উত্তেজনা চেপে রাখার ব্যাপারে সহায়ক হয়ে থাকে। আর সেটার দুর্বলতার ফলেই মানুষ জৈবিক তাড়নার শিকারে পরিণত হয়ে থাকে। এভাবে মানুষ শেষ পর্যন্ত বাসনা কামনার হাতে বন্দী জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

২। পর্দা প্রথার কড়াকড়ির ফলে পুরুষরা নিজ নিজ ভাবী স্ত্রীকে ভালভাবে দেখেশুনে নিতে সমর্থ হয় না। তার ফলেই সমাজে তালাকের হিড়িক দেখা যায়। দাম্পত্য জীবন অসুখী হবারও এটাই বড় কারণ।

৩। পর্দা প্রথাই নারীকে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখছে। তার ফলেই তারা ইচ্ছেমত স্কুল বা বোর্ডিংয়ে থেকে জ্ঞান ও সংস্কৃতির যথাযথ উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ পায় না।

এখন আমি এ তিনটা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলব যে, পর্দানশীন নারী ততখানি রুগ্ন ও দুর্বল স্বভাবা হয় না, যতখানি হয় পর্দাহীন নারীরা। তাদের থেকে তুলনামূলকভাবে পর্দানশীন নারীরা বেশীর ভাগই সুস্থ ও সবল থাকে। এ কথা এতই উজ্জ্বল সত্যে পরিণত হয়েছে, তা যে কোন এশিয়াবাসী একটু খেয়াল

করলেই পরিষ্কার বুঝতে পারে।

একে একে তেরশ বছর পেরিয়ে গেল মুসলিম নারীরা পর্দায় থেকে আসছে। যদি পর্দা নারীদের দুর্বলতারই কারণ হ'ত তাহলে অপরিহার্য ছিল যে, পুরুষানুক্রমে তা বেড়েই চলত। পরিণামে মুসলিম নর-নারী দুনিয়ার বুকে দুর্বলতম মানুষের সেরা নজীর হয়ে দাঁড়াত। প্রাণীতত্ত্বের শিক্ষা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এরূপ পরিণতি লাভের কথাই আমাদের বলছে।

কিন্তু আমরা তো আজ তার বিপরীতই দেখছি। সচরাচর দেখা যাচ্ছে যে, পর্দানশীন নারীর সন্তান-সন্তুতি পর্দাহীন নারীর সন্তান-সন্তুতি থেকে প্রায় ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য দফতরের যত রিপোর্ট দেখা গেছে, তাতে কোথাও এ কথার সংকেত নেই যে, পর্দানশীন নারীরাই বেশি মরছে এবং পর্দাই নারীর স্বাস্থ্য ধ্বংস করে ফেলেছে। যদি পর্দাই স্বাস্থ্যহানি ও অপমৃত্যুর কারণ হ'ত, তাহলে মুসলমান নারীরাই তুলনামূলকভাবে বেশি মরত ও রুগ্ন থাকত। তাছাড়া মুসলমান পুরুষদের তুলনায়ও মুসলমান নারীর মৃত্যুর হার কয়েকগুণ বেশি হওয়া উচিত ছিল। অথচ, বাস্তব অভিজ্ঞতা তো তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এখন বাকি র'ল নারী স্বাধীনতার চাঁইদের এ যুক্তি-"পর্দানশীন নারীরা অধিকতর কামপ্রবণ"। অদ্ভুত অসংলগ্ন প্রলাপ। মনোবিজ্ঞানের বাস্তবভিত্তিক বিধানের সাথে বিন্দুমাত্রও সামঞ্জস্য নেই এর।

এ কথা না জানে এমন লোক পৃথিবীর বুকে নেই যে, মানুষের ভেতরে বাসনা কামনার তীব্রতা তখনই বাড়ে যখন চারপাশে তার উপকরণ ঘিরে থাকে। যখন মানুষ নির্বিঘ্নে কামনা চরিতার্থ করার সুযোগ পায়, তখন স্বভাবতই তার জ্ঞান ও বিবেক লোপ পেয়ে থাকে।

তাই জিজ্ঞেস করছি, জ্ঞানের মাথা না খেয়ে থাকলে বলুন তো, কামনার উদ্রেক করার মত উপকরণ কোন নারীদের সবচাইতে বেশী হাতে? পর্দানশীন নারীদের, না অলিতে গলিতে পুরুষের সাথে মুক্ত অঙ্গনে বিচরণকারিণীদের? যে নারীরা পুরুষানুক্রমে পর্দায় থেকে থেকে ধর্মীয় প্রেরণায় এরূপ উদ্বুদ্ধ রয়েছে যে, অন্য পুরুষ দেখলেই দূরে পালায়, তাদের ওপরে কি কামনার বহ্নি লেলিহান শিক্ষা বিস্তার করবে, না যারা দিনরাত অন্য পুরুষের সাথে অবাধে গলাগলি ও ঢলাঢলি করে বেড়ায় তাদের ওপরে করবে? বলাবাহুল্য, দ্বিতীয় ধরনের নারীদের ভেতরেই কামনার আগুন জ্বলবে হাজার গুণ বেশী।

মনোবিজ্ঞানও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমাদের দাবীই সত্য। তবুও সে দলীল এক পাশে রেখে আর একটা দলীল পেশ করছি। তা হচ্ছে এইঃ মানুষ যখন কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণের পূর্ণ সুযোগ দেখতে পায় তখন তাতে সে খুবই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। তখন এমনকি সে লজ্জা শরম, ডর ভয়, মান-মর্যাদা, সবকিছুর মাথা খেয়ে বসে। নিজের মেজাজ ঠিক রাখার শক্তিই সে হারিয়ে ফেলে। নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন সে পংকিলতার অতল সাগরে ডুবে যায়।

উদাহরণ নিন। দুটো তরুণ এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়ছে। উভয়ে একই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করছে। তাদের একজনের বাড়ী সে স্কুল থেকে অনেক দূরে। তাই তার পরিবারবর্গ থেকেও সে বহুদূরে অবস্থান করছে। সেখানে যে কোন কাজের দরুন শুধু তার নিজের সুনাম দুর্নামের প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখা দেবার নয়। ফলে তার যে কোন ধরনের বাসনা চরিতার্থ হওয়ার পথে অন্য কোন প্রশ্ন এসে অন্তরায় সৃষ্টি করে না।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় যুবকটি সেখানেরই ছাত্র। পাড়াপড়শীর ভেতরে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করছে। নিজের ঘরেই বাপ-মা, ভাই-বোনদের বেষ্টনীর ভেতরে সে থাকছে। চারদিক থেকেই সবার কড়া নজর রয়েছে তার ওপরে। তাই তার যে কোন বাসনা চরিতার্থ হওয়ার পথে এতই বাধা রয়েছে যে, একটা দূর না হতেই আরেকটা এসে দেখা দেয়।

এখন বলুন তো, এ যুবক দু'টির কার ভেতরে বাসনা চরিতার্থ করার প্রবণতা বেশী হয়ে দেখা দেবে? কেইবা নিজের মনের ওপরে দখল রাখতে ব্যর্থ হবে?

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, প্রথমোক্ত যুবকই বাসনার শিকারে পরিণত হবে। কেউ কি বলবে যে, তার স্বাস্থ্য ও শক্তি তাকে যৌবনের সেই বন্ধনহীন উন্মাদনার হাত থেকে বাঁচাবে? কখ্খনও নয়। পরন্তু, স্বাস্থ্য ও শক্তি তো তাতে আরও ইন্ধন যোগাবে। তাকে নানাভাবে স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। এটা কোন কাল্পনিক কথা নয়। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা এ কথাই সাক্ষ্য দিচ্ছে। যদি তা না হ'ত, তাহলে যত স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী নরনারীকে সর্বত্র পবিত্র জীবন যাপন করতে দেখা যেত। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীতই দেখা যায়।

পক্ষান্তরে, যত অসচ্চরিত্র নর-নারী দেখা যায়, তারা প্রায়ই স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রাচুর্যের অপব্যবহার করে থাকে মাত্র। অধিকাংশ পাপিষ্ঠ ও পাপিয়সীকেই স্বাস্থ্য ও শক্তির অধিকারী দেখা যায়।

এখানে কেউ হয়ত প্রশ্ন করবেন যে, অসৎ নর-নারীর সাথে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবতার কি সম্পর্ক রয়েছে? যদি তাদের স্বাস্থ্যের সাথে জ্ঞানের সুস্থতাও যুক্ত হ'ত, তাহলে অসচ্চরিত্র হবার পথে তা তাকে বাধা দিত।

অথচ আমরা তো দেখছি তার বিপরীত। অধিকাংশ দুশ্চরিত্র ও বিলাসপ্রিয় লোকই তো শিক্ষা ও সংস্কৃতির অমূল্য ভূষণে সেজেগুঁজে চলছে আর তাদেরই বলা হচ্ছে আলোকপ্রাপ্ত সমাজ। আরও একটু এগিয়ে বলা চলে যে, ইউরোপ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত তথাকথিত উচ্চ ডিগ্রীধারীদের ভেতরেই তো চরিত্রহীনতার মাত্রা বেশী দেখা যায়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান জগত থেকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে বিমণ্ডিত হয়ে এসেই তো তারা আমাদের পশ্চাৎপদ দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের চাইতে বেশী বাসনা কামনার দাস হয়ে চলছে।

যে শিক্ষা দীক্ষা মানুষকে সভ্যতা ও মানবতার বিরুদ্ধে যেতে বাধা দেয়, তা হচ্ছে নিতান্তই সাধনা সাপেক্ষ। অর্থাৎ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নামক মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই সেই পর্যায়ে পৌঁছে থাকেন। অথচ সেরূপ অগাধ শিক্ষা ও মনীষা দীর্ঘদিন সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা চালানোর মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের প্রতিটি ধারা ও অংশ খুঁটে খুঁটে দেখে তা নিয়ে অবিশ্রান্তভাবে মাথা ঘামানোর পরেই সেরূপ দিব্যজ্ঞান লাভ হতে পারে। তখনই শুধু তাদের ভেতরে বিবেক এতখানি প্রাধান্য লাভ করবে যার ফলে সে কিছুতেই সভ্যতা ও মানবতা বিরোধী কোন কিছু করতে যাবে না। সেটাই হচ্ছে মানবতার পূর্ণ স্তর। অথচ ক'জন মানুষের দ্বারা সাধারণত তা সম্ভবপর? দুনিয়ার সব দেশ ও জাতির থেকে এরূপ ক'জন মনীষী বের করা যাবে?

তাই সেরূপ আকাশকুসুম কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাবে, এ বিরাট মহাদেশ তথা দুনিয়ার অধিকাংশ স্থানই সেই শিক্ষা ও সভ্যতা থেকে একেবারেই বঞ্চিত রয়েছে। এমনকি ভবিষ্যতেও গোটা মহাদেশ মনীষীময় হয়ে যাবার আদৌ সম্ভাবনা নেই। আমার এ কথার ভেতরে কোন বাড়াবাড়ি নেই। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই এর প্রমাণ সংগ্রহ করা যাবে। তাই প্রত্যেক জ্ঞানী ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই এর প্রমাণ হাতে নাতে পেয়ে যেতে পারেন।

সে যাক, ওপরের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, তুলনামূলকভাবে পর্দানশীন নারীদের ভেতরে কামপ্রবণতা কমই দেখা দেবে এবং তাদের মস্তিষ্কে দুশ্চিন্তা কমই ঠাঁই নেবে। পক্ষান্তরে বেপর্দা নারীদের ভেতরেই যে

তার প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে এবং যাবেও, তা সর্বজনমান্য কথা।

দৈহিক দুর্বলতা ও জ্ঞান শক্তির বিচারেও দেখা যায় যে, এশিয়ার নারীদের চাইতে ইউরোপের নারীরা পশ্চাৎপদ। শারীরিক দুর্বলতা শুধু চার দেয়ালের ভেতরে থাকার দরুনই দেখা দেয় না; বরং এছাড়া বহু অন্য কারণ রয়েছে তার জন্যে। চরম দুঃখ-কষ্ট, অভাব দৈন্য, উপবাস অনশন, প্রণয় বিরহ ইত্যাদি নারীকে বেশির ভাগ দুর্বল করে থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা সামনে রেখে যারা বিচার বিবেচনা করে দেখার সুযোগ পাবে, তাদের সামনে এ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়বে যে, ইউরোপের নারীদের জীবনে সে সব দুর্বলতার উপকরণ সচরাচর প্রচুর পরিমাণে জুটে যায়।

নারী চরিত্র দুর্বল হবার লক্ষণ বিভিন্ন জাতির ভেতরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দেয়। তার ভেতরে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্মক লক্ষণ হচ্ছে আত্মহত্যার হিড়িক। অপরাধ প্রবণতার কারণ অনসুন্ধানকারী লোমব্রুসো প্রমুখ প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ জ্ঞানহারা না হয়ে কখনো আত্মহত্যা করতে পারে না। যেহেতু দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার উপরেই জ্ঞানের সুস্থতা নির্ভরশীল, তাই তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলেই আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব যে, কোন্ এলাকার নারীদের দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতা বেশী থাকে।

'রিভিউ অভ রিভিউজের' একাদশ খণ্ডে ইতালীর সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ বছরে ৫৬৯ জন নারী আত্মহত্যা করেছে এবং ঠিক এই ক'বছরেই ফ্রান্সে ৫৮৬৯ জন নারী আত্মহত্যা করেছে। এসব ঘটনা সামনে রেখে বিচার করে বলুন দেখি, সে তুলনায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কতসংখ্যক নারী আত্মহত্যা করেছে?

এসব আত্মহত্যার কারণ প্রণয় বা দারিদ্র্য যাই হোক না কেন, মূলত তা কাপুরুষতা-দৈহিক ও মানসিক দৌর্বল্যের পরিচায়ক। তাই বলা চলে যে, প্রাচ্যের নারীরা পাশ্চাত্যের নারীদের চাইতে দৈহিক ও মানসিক শক্তি বেশী রাখে বলেই তারা সংযমের পরিচয় বেশী দিয়ে চলছে।

মানুষের কামপ্রবণতা ও আত্মসংযমের অভাব যখন দৈহিক ও মানসিক দৌর্বল্যের ফল, তখন নির্ঘাত বলা চলে যে, এশিয়ায় নারীরা ইউরোপের নারীদের চাইতে সেক্ষেত্রে অনেক সবল। এর আরও প্রমাণ রয়েছে। ইউরোপের সর্বত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম বিকাশ দেখা যাচ্ছে। তারা খুব ভাল করেই জানে যে, মাদকদ্রব্য যত অনর্থের মূল। তার ক্ষতিকর দিক অজস্র। তবুও তো তারা আজ পর্যন্ত তা ছাড়তে

পারছে না। অথচ এই সামান্য একটা বদঅভ্যাসের বিনিময়ে তারা দৈহিক, আর্থিক ও চারিত্রিক বহু ক্ষতিসাধন করে চলছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ভেবে দেখুন যে, তারা অন্যান্য ব্যাপারে কতটুকু আত্মসংযম রক্ষা করতে সক্ষম। তার তুলনায় এশিয়ার দেশগুলোতে কি অধিক আত্মসংযমের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না?

পর্দার দ্বিতীয় ক্ষতিকর দিক বলা হয়েছে ভাবী স্ত্রীকে দেখেশুনে তাড়িয়ে বাজিয়ে নেবার সুযোগ না পাওয়াকে। সমাজে আজকাল নাকি সে কারণেই তালাকের এত হিড়িক দেখা যাচ্ছে এবং দাম্পত্য জীবন বড়ই দুঃখময় হয়ে চলেছে। এর দ্বারা তারা মূলত এ কথাই বলেছে যে, নারীদের যত দোষ-ত্রুটি আজ তালাকের কারণ হয়ে উঠেছে, তার মূলে রয়েছে পর্দা প্রথা।

আমি বলছি, এ অভিযোগ একেবারেই ভূয়া। কারণ, নারীদের ত্রুটির কারণে তালাকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া কিংবা পুরুষের বিরুদ্ধে নারীদের যুলুম অত্যাচারের অভিযোগ শুধু এশিয়াবাসী মুসলমানদের ভেতরেই দেখা যাচ্ছে না। এর চাইতেও বেশী দেখা যাচ্ছে সুসভ্য ইউরোপ ভূখণ্ডে। এর আলোচনা এ বইয়ের "জড় সভ্যতার বদৌলতে" অধ্যায়ে পেয়ে যাবেন।

এখন থেকে গেল তৃতীয় অভিযোগ। তা হচ্ছে এই-পর্দা প্রথা নারীকে শিক্ষা ও সভ্যতার ময়দান থেকে দূরে রাখে। এ অভিযোগও ভিত্তিহীন ও অহেতুক। কারণ যে কোন মেয়ে পাঁচ বছর বয়স থেকে শুরু করে বার বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে অবাধে পড়াশুনা করতে পারে। এ দীর্ঘ সাত বছরে তাকে বেশ করে শিক্ষা ও সভ্যতায় ভূষিত করে দেওয়া যেতে পারে।

এছাড়াও দেশ ও জাতির শুভাকাংখীরা ইচ্ছা করলেই সবখানে এরূপ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে পারে যা পুরোপুরি নারীদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। সেরূপ ব্যবস্থা যেখানে চলে, সেখানে নারীদের মুক্তভাবে শিক্ষা নেয়ার পথে কেউই বাধা দেবে না। তবে, সেখানে যাবার বা ফেরার পথে অবশ্যই তারা পর্দা রক্ষা করবে।

এখানে প্রশ্ন তোলা হবে যে, এরূপ উচ্চশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী কোথায় মিলবে? তার উত্তরে আমি বলব, এসব এরূপ বাজে ও বেহুদা প্রশ্ন যার জবাবই দেওয়া সঙ্গত নয়। কারণ সদিচ্ছা ও সৎসাহস থাকলে মানুষ সবই অনায়াসে করতে পারে। কোন কিছুর অভাব তার থাকে না। بهر کارے کہ همت بستہ گردد
اگر خارے بود گل دستہ گردد

দুর্জয় ইচ্ছার মুখে কন্টক প্রাচীর,
কুসুম কানন হয়, জেনে নাও বীর।

* * *

সৎসাহস ও সদিচ্ছা থাকলে সবই হতে পারে-হয়েছেও। তবে তাড়াহুড়ো করে, মুহূর্তে সব কিছু পেতে যাবার মোহই আমাদের ব্যর্থ করে দেয়। তাই সব পেতে যেয়ে আমরা সবই হারাই। যে কোন গঠনমূলক কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে পূর্ণতালাভ করে।

সবদিক আলোচনা শেষ করে এখন আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছব যে, পর্দাপ্রথা আদৌ অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা নয়। দৈহিক ও মানসিক দৌর্বল্য আনে না। কামপ্রবণতা বাড়ায় না। দাম্পত্য দুঃখের মূল বলেও প্রমাণিত হয় না। পক্ষান্তরে, বিচার বিবেচনা করে দেখা যায় যে, পর্দা প্রথা এমনি এক রক্ষাকবচ যা নর-নারীকে বহু অপরাধমূলক কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, সমাজকে অসংখ্য অনাচার থেকে পবিত্র রাখে। হ্যাঁ, তার ওপরে যদি চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রাচীরও যুক্ত হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে জড় সভ্যতা মানবতার ওপর যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে তারও প্রতিকার আশা করা যাবে।

পর্দা কি লোপ পাবে?

পর্দা প্রথা চিরতরে লোপ পাওয়া আর তার পরিণামে গোটা মানব সমাজের ওপরে পর্যালোচিত সর্ববিধ ব্যাধি ও বিপদ আত্মপ্রকাশ করা মোটেও অসম্ভব ব্যাপার নয়। কারণ, জড়সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্য আজকের মত আগেও অনেকবার বহু দেশ থেকে পর্দার মত বহু প্রথার বিলোপ ঘটিয়েছে। অবশ্য আজ প্রাচ্যবাসী বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে যে, ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই পেড়ে যেসব বিধি-নিষেধের বেড়ি সমাজ থেকে দূর করা হয়েছে, তা মূলত মানবজাতির বহুতর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই আরোপিত হয়েছিল। তাই সেরূপ কিছু ঘটলে অবাক হবার কারণ নেই। তবে, আধুনিক সভ্যতা এসে সমাজের সেযব বিধি নিষেধ দিনের পর দিন তুলে দিচ্ছে, তার ফলে মানব সমাজ যে কয়েক যুগ ধরে কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদ আপদ ও দুঃখ-কষ্ট ভুগে চলেছে, তা বুঝতে আর কারোই বাকী নেই।

মানুষের এ একটা স্বভাব দেখা যায় যে, যখন কোন একটা ব্যবস্থা কিছুমাত্র তাদের অপছন্দ হয়ে যায়, তখন তা সর্বতোভাবেই বর্জন করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। তার ভেতরে কতটুকু ভাল-মন্দ রয়েছে এবং তার কতটুকু ছাড়তে হবে আর কতটুকু রাখা চলে তা নিয়েও তারা বিচার বিবেচনা করে দেখতে রাজী হয় না। এভাবে মানুষ যখন তার জীবনে কোন বাধা বন্ধনের বালাই দেখতে অনিচ্ছুক হল, অমনি যেখানে বিন্দুমাত্রও বাধা বন্ধনের গন্ধ রয়েছে, তা থেকেও তারা দূরে পালাতে শুরু করল এবং সব ধরনের বাধা বন্ধন ছিঁড়ে চলল।

বর্তমান সভ্যতার বদৌলতে মানুষকে এমনি এক ভূতে পেয়ে বসেছে। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা তা পরিষ্কার বুঝতে পারব। এখানে আমি তার কয়েকটা উদাহরণ তুলে ধরছি।

পৃথিবীর বুকে ধর্মনায়করা একদিন অপ্রতিহত প্রভাব ও প্রতিপত্তি জমিয়েছিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা মানুষকে এমনি কঠোর নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল যে, তার খপ্পর থেকে পরিত্রাণ লাভ করার শক্তি কারোরই ছিল না।

ধর্মীয় সেই দোর্দণ্ড প্রতাপের পরবর্তী ধাপেই আরম্ভ হল আধুনিক সভ্যতার যুগ। আধুনিক সভ্যতা এসে ধর্মকে সঠিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারত। সেটাই হত

বিবেকসম্মত কাজ। তা না করে ধর্মনেতা, ধার্মিকসমাজ মায় ধর্মকেই তারা সবখান থেকে চিরতরে নির্বাসিত করার জন্য লেগে গেল। এ ব্যাপার আমরা দৈনন্দিন দেখতে পাচ্ছি।

এভাবে দেখা যায় যে, যারা মানব সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থানীয় ছিল বা অন্য কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের বদৌলতে সমাজ নায়ক হয়ে বসত, তাদের সংকীর্ণ মনোভাবের দরুন তারা মূর্খ সমাজকে কোনরূপ সুযোগ সুবিধা দিত না। জনসাধারণ তাদের স্বাধীন বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে বা তার উৎকর্ষ সাধন করবে, এতটুকু স্বাধীনতা তাদের দেওয়া হত না। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে এটাই কামনা করা গিয়েছিল যে, এখন থেকে এমন একটা সুন্দর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে যাতে করে, মানুষের সর্বাধিক ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের সুবন্দোবস্ত হবে। কিন্তু, তখনও মাত্রা স্থির রাখা হল না।

ফল দাঁড়াল বিপরীত। নতুন সভ্যতা এসে মানুষ নির্বিশেষে সবাইকেই এরূপ বল্গাহারা স্বাধীনতা দিল যে, নেহাত অজ্ঞ ও গণ্ড মূর্খরাও যে কোন জটিল ব্যাপারে চোখ বুঁজে মতামত দেয়। অথচ যা বুঝবার জন্য বড় বড় পণ্ডিতদের পর্যন্ত গলদঘর্ম হতে হয়, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার যে তাদের আদৌ ক্ষমতা নেই সেটুকুও বুঝে না। তাই দেখছি, আজকের সভ্যতার একটা সাধারণ নিয়ম হয়েছে খোদায়ী বিধানকে অস্বীকার করা ও কাল্পনিক মনগড়া বিধানে বিশ্বাস রাখা। তারই ফলে আজ দিকে দিকে দেখা দিয়েছে অনাচার ও অরাজকতার ব্যাপক প্লাবন।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায়, বিভিন্ন যুগে রাজা-বাদশাহ্‌র দল দাম্ভিকতার চরম দেখাতে গিয়ে জ্ঞানবুদ্ধির বেড়া ভেঙ্গে অত্যাচার ও অবিচারের প্রাঙ্গণে পদক্ষেপ করেছিল। তারা খোদার স্বাধীন সৃষ্টিকে ক্রীতদাস বা তার চাইতে নিকৃষ্ট কিছু ভেবে চলত। নতুন সভ্যতা এসে তাদেরে শুধু নির্ধারিত সীমার ভেতরে আবদ্ধ রেখেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং রাষ্ট্র ও সরকারের নাম নিশানা পর্যন্ত বিলুপ্ত করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছে। তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য নতুন সভ্যতা হিংস্র পথ বেছে নিল। এভাবেই নৈরাজ্যবাদী ও এনার্কিষ্ট দলের অভিযান শুরু হল। তাদের কার্যধারা আজ আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

নীতি ও আদর্শবাদের ধারক ও বাহক পীর ও পুরোহিতরা শালীনতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে গিয়ে এরূপ কড়াকড়ির আশ্রয় নিলেন যার ফলে লোক এ নশ্বর দুনিয়ার সব কাজকর্ম ভুলে সন্ন্যাসের পথকেই উত্তম ভাবতে শিখল। নতুন

সভ্যতা এসে এক্ষেত্রেও সঠিক পন্থা অনুসরণ করতে সমর্থ হল না। তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার শ্লোগান তুলে মানুষকে নৈতিকতার বাঁধন ছিন্ন করে পংকিলতার অথৈ সাগরে ঝাঁপ দেবার উস্কানি দিল।

ফল দাঁড়াল এই, নব সভ্যতার দোহাই পেড়ে মানুষ আজ এমন গর্হিত কাজও নিঃসংকোচে করে চলছে, যার নাম শুনলেও যে কোন বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এমনকি অবলা পশুও সে সব কাজ থেকে দূরে থাকাকেই ভাল ভেবে চলছে।

নারীদের ওপরেও একযুগে কড়াকড়ির মাত্রা এতখানি বেড়ে গিয়েছিল যে, তাদের মুখে তামার তালা জুড়ে দেয়া হত। মাংস খাওয়া বা বিন্দুমাত্র হাসির রেখা মুখে ফুটে ওঠা তাদের নিষিদ্ধ ছিল কঠোরভাবে। গোটা নারীজাতিকেই সেদিন জড়বস্তুরূপে গণ্য করে পণ্যদ্রব্যের মত বেচাকেনা করা হত।

নতুন সভ্যতা আসার সাথে সাথেই মানুষ নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। কিন্তু, তার স্বরূপ কি? বিবেক বুদ্ধিসম্মত উপায়ে কি তার প্রতিকার ব্যবস্থা হচ্ছে? ইন্‌সাফের সাথে কি সে পথে এগিয়ে যাওয়া যাচ্ছে?

কখ্খনও নয়। পরন্তু তাদের এরূপ বল্গাহীন স্বাধীনতাই আজ দেয়া হল যে, এমন কি দাম্পত্য জীবনের বিরুদ্ধেই তারা বড় বড় গ্রন্থ রচনা করে চলল। বিয়ের নাম নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দিতে তারা আদাজল খেয়ে লেগেছে। তারা আজ প্রকাশ্যে মিছিল করে দাবী তুলছে যে, মুক্ত পৃথিবীতে যথেচ্ছা ভ্রমণ করে জৈবিক তৃষ্ণা মেটাবার স্বাধীনতাও তাদের দিতে হবে। যেখানে যার সাথে যতক্ষণ ইচ্ছা তারা যেন স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের পূর্ণ অধিকার পায়।

নব সভ্যতার এসব বিস্ময়কর অবদান (?) যে কোন সুধী ব্যক্তির দৃষ্টি এড়াতে পারে না। দুঃখ তো এখানেই যে, আমরা প্রাচ্যবাসীরা সেই নব সভ্যতাকে তলিয়ে না দেখে বিন্দুমাত্র তা পরখ করে দেখার তকলীফ স্বীকার না করে, চোখ বুঁজেই কবুল করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছি। এমনকি তার যে সব ব্যবস্থাকে আমরা সুস্পষ্ট ক্ষতিকর বলে জানতে পেরেছি, তাও অনুসরণ করতে আদৌ দ্বিধা করছি না। অথচ, পাশ্চাত্যের এই অন্ধ অনুকরণই আমাদের অখণ্ড শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে এবং প্রাচ্য দেশগুলো আজ পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন শক্তির টানা-পোড়েনের কবলে পড়ে বিপর্যস্ত ও অচল হয়ে চলছে।

যা হোক একথা সত্যি যে, যদ্দিন আমাদের এ কার্যধারা অব্যাহত থাকবে, যদ্দিন আমরা পাশ্চাত্যের মোহে অন্ধ সেজে চলার হাত থেকে নিস্তার না পাব, যদ্দিন এ মোহ ভেঙ্গে দেবার মত আমাদের ভেতরে একটা শক্তিশালী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দল গড়ে না উঠবে, তদ্দিন কোনরূপ পরিবর্তনের আশা করা–

دماغ بيهوده پخت وميال باطل ست

আহাম্মকের স্বর্গবাস ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

* * *

আজ যেভাবে অধিকাংশ তরুণ, এমনকি বুড়োদের চোখেও লজ্জা শরমেই বালাই দেখা যাচ্ছে না, শালীনতা ও সম্ভ্রমের লেশমাত্র দেখা যাচ্ছে না, তদ্রুপ এটাও অসম্ভব নয় যে, মুসলিম নারী সমাজ তাদের চৌদ্দশ বছরের পুরুষানুক্রমিক পর্দাপ্রাচীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। সে দুর্দিন যেন খোদা আমাদের না দেখান, এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

প্রবীণ মুরুব্বিদের কাছে শোনা যায়, তাদের তরুণ বয়সে অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যুবাও প্রবীণদের এক মজলিসে বসা বা এক সাথে বসে ধূমপান করা অপরাধ বলে বিবেচিত হত। অভিজাত পরিবারের তো কথাই নেই, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারেরও এ রীতিনীতি কঠোরভাবে প্রতিপালিত হত।

কিন্তু আজ আমরা এ কোন্ তামাশা দেখছি? আজকের সভ্যতার সব চাইতে চিত্তাকর্ষক ও চমৎকার অবদান (?) হচ্ছে এমনি ব্যক্তি স্বাধীনতা, যাতে করে বেপরোয়াভাবে যে যার সামনে দিয়ে ইচ্ছে সোজা গিয়ে দিনে দুপুরে শহরের নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করে কিংবা সেখান থেকে কোন বারাংগনাকে গাড়ীতে তুলে রাজপথে সবার সামনে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। অথচ, তাদেরে সে পথ থেকে ফেরাবার সক্রিয় প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে অবৈধ কাজ–একেবারেই বেআইনী।

এসব অনাচার দেখা দিল কেন? কারণ, সভ্যতার নবালোক অন্ধকারের যবনিকা উন্মোচনের নামে লাজ শরমের পর্দাও ছিন্ন করে ফেলেছে এবং বল্গাহীন ব্যক্তি স্বাধীনতা আজ কোন বিধিনিষেধ বা শালীনতার মর্যাদা দেয়া নিষ্প্রয়োজন ভাবছে।

আমরা আজ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, ইউরোপের জড়সভ্যতা প্রাচ্য জগতের নৈতিক ও সামাজিক মেরুদণ্ড চুরমার করে দিচ্ছে ও তার থেকে আমরা তেমন বৈষয়িক কল্যাণও পাচ্ছি না। তবুও আমরা সে সভ্যতার যজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করার জন্য

উন্মাদ হয়ে চলছি। তাকে আমরা রহমতের ঝর্ণাধারা বলে ভেবে বসেছি।

এসব দেখে শুনে আর অসম্ভব বলে মনে হবার কারণ থাকে না যে, ধীরে ধীরে আমরা নব সভ্যতার বদৌলতে নিজেদের ভেতরকার যতসব মহান নীতি ও আদর্শকে চিরতরে বিদায় দিয়ে গোটা জাতিকে ধ্বংসের অতল গুহায় ঠেলে দেবো। খোদা রক্ষা করুন, যেসব দুরারোগ্য সামাজিক ব্যাধির কথা আমি উল্লেখ করে এসেছি, সেদিন তা সবই আমাদের ভেতরে মারাত্মকরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। আমাদের বর্তমান রুগ্ন সমাজদেহে আবার যখন সেসব ভয়াবহ রোগ দেখা দেবে, তখন গোটা সমাজ এরূপ ব্যাধি জর্জরিত ও বিপর্যস্ত হবে, যা বর্ণনা করার সাহস আমার নেই আদৌ।

খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তিনি মুসলমানদের নিরাশাবাদী জাতিরূপে গড়েননি। ইসলামের দুর্বার প্রাণশক্তি তাদের ভেতরে চরম আশাবাদের শালীন স্বভাবের মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে। তাই মুসলমানদের চরিত্রে অজেয় মনোবল ও আত্মবিশ্বাস ভিত গেড়ে বসেছে। এ দুটো আজ তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, আজ আমাদের ভেতরে সাময়িকভাবে যে আধুনিক সভ্যতার অশুভ ছায়াপাত ঘটেছে, আজ হোক কি কাল হোক অবশ্যই তার বিরুদ্ধে আমাদের এরূপ আত্মাভিযান মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, যার প্রভাবে তা সমূলেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং আবার আমাদের আদর্শবাদী কাফেলা নবীন উদ্যমে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলবে। সেদিন আমরা এই চিত্তবিকার প্রসূত মনগড়া নতুন মত ও পথকে পদাঘাত করে পূর্বপুরুষরা যে আদর্শ পথে চলে দুনিয়ার বুকে অমর ইতিহাস রেখে গেছেন, সেই পথেই ছুটে চলবো। যে আদর্শ নারীদের ব্যাপারে সব চাইতে উদার ও ইনসাফমূলক পন্থার নির্দেশ দিয়েছে, একদিন আমরা সবাই আবার সেই আদর্শের রাজপথ ধরে এগিয়ে চলবো। যেভাবে একদিন আমরা গোটা মানব জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলাম, তদ্রুপ আবার আমরা মানবতার ত্রাণদাতা জাতি হিসেবে পৌরুষদীপ্ত ভূমিকা গ্রহণ করব।

জড় সভ্যতার অবদান!

আগে যা কিছু বলে এলাম তার ওপরে আগাগোড়া একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে যে কেউ পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, এমনকি এই জড়সভ্যতার স্রষ্টারা পর্যন্ত তাদের জগতে যথার্থ নারী আখ্যা পাবার মত কাউকে খুঁজে না পাবার পূর্ণ স্বীকৃতি দান করছেন। তাঁরা আরও বলছেন যে, সামাজিক অবস্থার চক্রজালে যে নারীরা আবদ্ধ হয়েছে, তাদের পূর্ণাংগ রূপ বিকাশলাভ তো দূরের কথা, তারা তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব ভুলে গিয়ে এমন সব কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, যা একাধারে তাদের নিখুঁত জীবন যাত্রার চাহিদার ও প্রকৃতির বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সন্দেহ নেই যে, আমি যদি তাদের মত হতেম যারা বাইরের চাকচিক্যের মোহে আত্মহারা হয়ে পড়েও মূল ব্যাপার বুঝবার কোন তোয়াক্কা রাখে না, তাহলে অবশ্যই আমি সম্ভ্রমের সিংহাসনে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম নারীদের ইউরোপের অলিতে গলিতে বিপর্যস্ত নারীদের পদাংকানুসরণের জন্য পরামর্শ দিতাম সবার আগেই।

তবে অসুবিধা হল এই, এ ব্যাপারে কলম ধরার আগেই আমাকে স্বীয় লব্ধজ্ঞান ও সৃষ্টি রহস্যের দিব্য আলোকে মূল সত্যকে ভাল করে দেখে নিতে হয়েছে। তাতে আমি পরিষ্কার জানতে পেরেছি যে, মানব জীবনে নারীর গুরুত্ব এছাড়া অন্য কারণে রয়েছে, আর তা তারা গোড়া থেকেই অর্জন করে এসেছে।

আমি আরও দেখতে পেলাম, ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টারা নারী সমস্যা সম্পর্কে যেসব মতামত পোষণ করে তাও সেই সত্যেরই সমর্থন যোগাচ্ছে। তারাও প্রকাশ্য ময়দানে জোর গলায় ঘোষণা করছে, যে সব পন্থা ও কার্যাবলী নারীকে তার সেই স্বাভাবিক দায়িত্ব থেকে ফিরিয়ে রাখে, অচিরেই তার বিলোপ সাধন করতে হবে

বলা বাহুল্য, সেসব মনীষীদের যতগুলো উদ্ধৃতি আমি এ বইয়ে নিয়েছি, তা থেকে যে কোন পাঠক-পাঠিকা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, বাইরের ঢাকঢোল ও চাকচিক্য মূল ঘটনার চাইতে কতখানি দূরে। ফলে তাঁরা অবশ্যই আমার সাথে অন্ততঃ নারী সমস্যার সমাধান ব্যাপারে একমত হতে সমর্থ হবেন। কারণ, যার গাভী সে যা বলে, তা যদি আমরা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিই, তাহলে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে আমাদের যে সীমাহীন খেসারত দিতে হবে তাতে আর সন্দেহ কি?

তাছাড়া 'নারী সমস্যা' 'নারী সমস্যা' বলে শ্লোগান তুলেই এটাকে একটা 'সমস্যা' করে তোলা হয়েছে। মূলতঃ এটা কোন সমস্যাই নয়–সোজা ব্যাপার। কারণ, এর সমাধানকল্পে কোন গবেষণা বা চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। সৃষ্টিজগতের প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই যে কোন মানুষের চোখে এর সমাধান ধরা পড়ে। সে অনায়াসে বুঝতে পারে যে, খোদা যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে ভেতরে ও বাইরে সে ভাবেই গড়ে তুলেছেন। প্রতিটি সৃষ্টিজীবকে বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে যার যার উপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দৈহিক মানসিক শক্তি দান করা হয়েছে, সে যেন তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে পারে। অবশ্য তার সে বিশেষ শক্তি এতটুকু ব্যাপকভাবে দেয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে সে তা থেকে অন্য কাজও কিছু কিছু করতে পারে। তাই সে তার দায়িত্বের সীমা রেখার বাইরে গিয়ে অপরের কাজেও হস্তক্ষেপ করার কিছুটা ক্ষমতা রাখে। এরূপ অবস্থায়–

كُلُّ جَدِيدٍ لَذِيذٌ

(প্রত্যেক নতুন জিনিসই মজার বটে)

– প্রবাদ বাক্যের শিকারে পরিণত হয় স্বভাবতই। তার অর্থ এ নয় যে, সে সেই নতুন কাজের উপযোগী। এ ভাল লাগার মূলে রয়েছে নিত্য-নতুনের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ।

নতুনের প্রতি এই স্বাভাবিক আকর্ষণ যদিও কোন মানুষকে কিছুদিনের জন্য বিপথে টেনে নেয়, কিছুদিন না যেতেই সে আবার তার ভুল বুঝতে পারে এবং সেই শক্তিবিরুদ্ধ কাজে তার বিরক্তি এসে যায়। তখন নতুনের মোহের সেই পথে সে যে সব সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছিল, একে একে তা সবই উধাও হয়। তার বদলে সে তাতে দেখতে পায় যত রকমের খারাপ ও অসুবিধাজনক ব্যাপার।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আজ হঠাৎ যদি আমরা শুনতে পাই যে, কোন এক নারী বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করে এসে বিরাট রাজনৈতিক হোতা সেজে বসেছেন, অমনি আমাদের প্রাণে অজ্ঞাতেই যেন বেশ একটা আনন্দের দোলা লেগে যায়। সাথে সাথে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠি এবং তাকে নারী জগতের এক পূর্ণাঙ্গ তারকা বলে ধারণা করে ফেলি। সংবাদপত্রে ফলাও করে তাঁর বক্তৃতা ছাপাই। মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক তাঁর প্রবন্ধ বের হতে থাকে। তা নিয়ে চায়ের আসরে ও ঘরে ঘরে উল্লাসের লহরী বয়ে যায়।

কিন্তু এভাবে একের পর এক করে যখন নারীরা রাজনৈতিক মঞ্চগুলো দখল করে বসে, দলে দলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক ও কারিগর বেরিয়ে এসে পুরুষদের পুরুষানুক্রমিক আসনগুলো জেঁকে বসতে থাকে এবং হাজার ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অরাজকতা এসে আমাদের জানিয়ে দেয় তার ধ্বংসাত্মক পরিণামের কথা, তখনই আমাদের চিন্তাস্রোত এরূপ মোড় নেয় যে, সে পুরুষবেশী নারীদের আমরা আর দু'চোখে দেখতে রাযী হই না।

অবশ্য সে সম্বিৎ ফিরে আমাদের খুবই বিলম্বে। তাই তা আর ফলপ্রসূ হয় না। গোটা সমাজই তখন সে অভিশাপে জর্জরিত হয়ে যায়। এমনকি সমাজের সামগ্রিক রূপই তখন বদলে যায়। তখন আমরা দু'দিকেই সর্বগ্রাসী অথৈ সমুদ্দুর দেখতে পাই, যার কোনদিকেই যেতে পারি না। এ সময়ে যদি আমরা নারীদের ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করি তাদের পূর্বাবস্থায়, তাহলে আমাদের তখনকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই আমূল পরিবর্তিত রূপ তার পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি তাদের সে অবস্থায় চলতে দিই, তাহলে তার পরিণামে এরূপ মারাত্মক ও স্থায়ী সামাজিক ব্যাধি জন্ম নেবে যার আর প্রতিকার চলবে না কোন দিন। তখন আমরাও আবার ইউরোপীয় মনীষীদের মতই অনর্থক চীৎকার ও হাহাকার তুলতে থাকব। সেসব চীৎকারের নমুনা আপনারা এ বইতেও আগে দেখে এসেছেন।

আজকের ইউরোপ ও আমাদের প্রাচ্যদেশের ভেতরে তুলনা করতে গিয়ে এ কথাটা বলাই ঠিক হবে যে, যখনই আমরা শুনতে পাই ইউরোপের নারীরা রাজা, মন্ত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি সবকিছুই হচ্ছে, অমনি এরূপ আশ্চর্যজনক নতুন খবরে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজেদের অস্তিত্বের খবর ভুলে যাই। তখন দিশে পাইনে যে, আমাদের করতে হবে কি? ভবিষ্যতে এর পরিণতি কি দাঁড়াতে পারে সেটুকু ভাববার অবকাশ তো আমাদের আদৌ থাকে না। তক্ষুণি আমরা প্রস্তুত হয়ে যাই আমাদের নারীদেরও ইউরোপের নারীদের মত শিক্ষা ও সংস্কৃতির উচ্চশিখরে তুলে ধরতে। তখন যদি কেউ বাধা দিতে আসে, অমনি তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে দূরে হাঁকিয়ে দিই। তাকে কল্পনা বিলাসী, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুসারী, সংশয়বাদী, সংকীর্ণমনা ইত্যাদি হাজার রকমের খেতাবে ভূষিত করি।

ঠিক এরূপ অবস্থায় যদি তাদের সামনে আমরা এগিয়ে গিয়ে বলি ঃ বন্ধুগণ! যে ইউরোপের নজীর তুলে ধরে তোমরা এই হাঙ্গামা শুরু করে দিয়েছ, তারা নিজেরাই এখন নারী ডাক্তার, নারী ইঞ্জিনিয়ার আর নারী কারিগরদের দৌরাত্ম্যে ত্রাহি ডাক

ছাড়ছে। এখন তারা নারীদের এসব ভূমিকায় দেখতে নারাজ। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে যথাযোগ্য শিক্ষা লাভ করে এখন তাদের দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে। যার ফলে তারা এখন তীব্র লেখনী ও বক্তৃতার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে সে দেশবাসীকে পূর্বাবস্থায় ফিরে নেবার জন্য। তারা ব্যাকুলভাবে আবেদন জানাচ্ছে সবার কাছে যথাসত্বর এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাবার জন্যে।

তাহলে আমাদের এ সুদীর্ঘ বক্তৃতা যে আদৌ তাদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করবে না তা নির্ঘাত বলা চলে। সে নবালোকে উদ্ভাসিত বন্ধুরা একে আগাগোড়া ধাপ্পা ভেবে এর কোন কথাই কানে তুলবে না। তারা ইউরোপের নারীদের বিস্ময়কর অগ্রগতির কিস্‌সা কাহিনী শুনে এরূপ সম্মোহিত হয়ে আছে যে, জ্ঞান ও বিবেককে তাদের কাছেই ঘেঁষতে দিতে তারা নারাজ।

কিন্তু উপায় কি? এ হচ্ছে প্রকৃতির রীতি। অথবা বলা যায়, এ এক সাংস্কৃতিক আপদ। সবল জাতির কাছে তা পরাজয় স্বীকার করে, আর দুর্বল জাতির ওপরে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে। দুর্বল এশিয়াবাসী আজ এমন সব ব্যাপারেও সবল ইউরোপের অনুসরণ করছে, যা একান্তই ইউরোপের ব্যাপার। যদি সেসব অন্ধ অনুসারীদের কাছে তাদের সেরূপ কাজের অর্থ ও উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে কিছুই জবাব দিতে পারে না।

এর একটা সাধারণ উদাহরণ নিন। আমাদের দেশে বিদেশী ভাষায় একে অপরকে দেখা হওয়া মাত্র সালাম দেওয়ার পদ্ধতি রয়েছে। অথচ তার একটা অক্ষরও আমাদের অনেকেই বুঝে না। এমনকি তারা ঠিকমত উচ্চারণও করতে পারে না। যে কোন জাতির অনুন্নত সমাজের এ দশাই দেখা যায়। তবে, শিক্ষিত সমাজের অবশ্যই সেরূপ অবস্থা থেকে মুক্ত থাকা উচিত। শুধু তাই নয়, তাদের হওয়া উচিত গোটা সমাজের আদর্শস্থানীয় ও পথের দিশারী। তাঁদের দেখে জাতির বিভ্রান্ত লোকগুলো পথ পাবে ও লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হবে। এই চরম বিভ্রান্তির যুগে তাঁদের আশ্রয় নিয়ে তারা নিস্তার লাভ করবে।

'আল মারআতুল জাদীদা' রচয়িতা পর্দা প্রথার উপরে হামলা চালাতে গিয়ে ও তার কুফল দেখাবার খাতিরে নিজের খেয়াল খুশিমত এশিয়ার নারীদের দুর্গতি ও এসব দেশে অজস্র তালাক অনুষ্ঠিত হবার কথা উল্লেখ করেছেন। এ দুটো হল তাঁর মতে অকাট্য দলীল। তাই তিনি পর্দা প্রথাকে যত দুর্গতি ও অনাচারের মূল হিসেবে অনতিবিলম্বে তা উচ্ছেদের জন্য সুপারিশ করেছেন।

আমি তার জবাবে বলতে চাই যে, সেসব দলীল একেবারেই ভিত্তিহীন ও গ্রহণের অযোগ্য। আমি তো বলবো যে, পর্দা প্রথাই তাদের এর চাইতে হাজার গুণ দুর্গতির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র রক্ষাকবচ। তা না হলে আজ যে তাদের কি দশা ঘটত তা খোদাই জানেন। আরেক কথা, যখন নগণ্য মূর্খ নারীরা পর্দা প্রথার বদৌলতে অজস্র ধরনের মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হচ্ছে, তখন অবশ্যই শিক্ষিতা ও সুযোগ্য নারীরা, এমনকি সাধারণ শিক্ষা ও যোগ্যতার অধিকারিণী হলেও এই পর্দা প্রথা তাদেরে অধিকতর মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখতে ও সফল জীবন অর্জন করতে সহযোগিতা করবে। এমনকি, এটাই হবে তাদের গন্তব্যের একমাত্র দিশারী।

আমরা বুঝতে অক্ষম যে, এতে আশ্চর্য হবার কি রয়েছে? পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব ঘটনাবলী রয়েছে তা কি এটাই সাক্ষ্য দিচ্ছে না যে, যদি নারীদের সর্ববিধ দুর্গতির মূল একমাত্র পর্দা প্রথা হত এবং তা বিলোপ করলেই সব অকল্যাণ দূর হয়ে যেত, তাহলে পর্দা বিরোধী ইউরোপে কিছুতেই নারীদের সব চাইতে বেশী দুর্গতি দেখা দিত না? এশিয়ায় যে দু'টো দুর্গতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ইউরোপের দেশগুলোতেই তো তা বেশী মাত্রায় দেখা যাচ্ছে। কেন সেসব দেশে পর্দা বিলোপের সাথে সাথে নারীদের সেসব দুর্গতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেল না?

মূলতঃ, ব্যাপার হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যে ব্যক্তি পৃথিবীর কিছুটা খবরাখবর রাখে, সে নিশ্চয়ই জানে যে, পর্দা বিরোধীরা নারীর যে দুঃখ নিয়ে গলা ছেড়ে কান্না জুড়েছে, তা পর্দাহীন জড় সভ্যতাপুষ্ট এলাকায়ও যথেষ্ট দেখা যাচ্ছে।

চরম দৈন্য ও অধঃপতনের দিক বিবেচনা করলেও স্বয়ং 'আল মারআতুল্ জাদীদা'র রচয়িতার সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় যে, ইউরোপীয় সভ্যতায় সে অবস্থা আমাদের প্রাচ্য সভ্যতা অধ্যুষিত এলাকা থেকে কঠিনতম হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি লিখেছেন– আদমশুমারীর শেষ রিপোর্টের হিসেবে দেখা গেছে যে, মিসরে ৬৩৭৩১ জন নারী কর্মচারী ও শ্রমিক রয়েছে। পক্ষান্তরে, ফ্রান্সে পঞ্চাশ লক্ষেরও অধিক নারী নিজের উদর সংস্থানের জন্য শ্রমিক-মজুরের স্তরে নেমে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে বাধ্য হচ্ছে। যদি উভয় দেশের জনসংখ্যানুপাতে হার ধরা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, ফ্রান্সে শতকরা ১৪ জন ও মিসরে শতকরা ত(১,২) জন নারী শ্রমিকের দফতরে নাম লিখাতে বাধ্য হয়েছে।

এর থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চরম সভ্য দেশ ফ্রান্সে নারীরা আমাদের

চরম অনুন্নত মিসর ভূমির নারীদের চাইতেও বেশী দৈন্য ও অনশন জর্জরিত হয়ে চলেছে। কিন্তু বিজ্ঞ লেখক অজ্ঞাতে এ স্বীকৃতিটা দেয়ার পরেই লিখেছেন ঃ

"এসব নারীদের এভাবে বাইরের পরিশ্রমে লিপ্ত থাকার দরুণ ঘরের কাজ আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।"

সোবহানাল্লাহ। পরস্পর বিরোধের অদ্ভুত সমন্বয়! ইউরোপের যে বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেখানকার আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টাদের যা মতামত, তার সাথে ওপরের মন্তব্যের সামঞ্জস্য কোথায়? এরূপ বিতর্কমূলক ব্যাপারে আমাদের তো উচিত সে দেশেরই সুধী সমাজ তথা বিজ্ঞ সমাজ ও অর্থনীতিবিদদের মতামত থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা। কারণ, তাঁরাই তাঁদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাঙ্গাগড়া সম্পর্কে আমাদের চাইতে অনেক ভাল খোঁজখবর রাখেন।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ 'সোল সায়মান' ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মনীষী বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তিনি তো খাস ইউরোপের ভূখণ্ডে বসেই চিৎকার করে ফিরেছেন যে, কারখানা ও ফ্যাক্টরী এসে নারীদের ঘর-সংসারের কাজ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এবং সেগুলোর দৌরাত্মেই হাজার হাজার সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করছি, এর পরেও কি আমরা বলতে পারি যে, বাইরের কর্মব্যস্ততা নারীদের সংসারের কাজে আদৌ প্রভাব বিস্তার করেনি? আমরা তো দেখছি যে, শুধু সোল সায়মানই নন, বরং মানব সভ্যতা ও জীবন ধারার প্রতিটি বিশেষজ্ঞই এ ব্যাপারে তাঁর সাথে পূর্ণ একমত। ব্যাপারটা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার ও লেখককে তা মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য আমি স্যামুয়েল স্মাইলাসের একটি উদ্ধৃতি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করছি। তিনি 'আল্ আখলাক' নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"যে বিধান নারীদের বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক কারখানায় কাজ-কারবার চালাবার অনুমতি দিচ্ছে, সে বিধান দেশের সমৃদ্ধি যতই বাড়িয়ে থাক না কেন, পারিবারিক জীবনের ভিত্তি যে নেড়ে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তা আজ সাংসারিক জীবনের ওপরে মারাত্মক আঘাত হেনে চলছে। দাম্পত্য জীবনকে ভিত্তি করে রচা সোনার সংসারগুলোর সুখের সৌধ চুরমার করে দিয়েছে। এ বিধান এসে স্ত্রীকে স্বামীর বুক থেকে, সন্তানকে মায়ের কোল থেকে এবং পরমাত্মীয়কে স্নেহ-প্রীতির বন্ধন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যাতে করে সমাজ থেকে নারী

চরিত্রগুলো পূর্ণরূপে লোপ পেয়ে গেছে। কারণ, নারীর প্রকৃত দায়িত্ব হচ্ছে ঘর সংসারের কাজগুলো সুসম্পাদিত করা। নিজের ঘর, তার সর্ববিধ সাজ-শৃঙ্খলা, ছেলেপিলেদের সেবাযত্ন ও প্রতিপালন এবং সাংসারিক আয়-ব্যয়ে সমতা বিধান ইত্যাদি কাজে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করাই হল নারীর আসল কাজ। কিন্তু, কলকারখানা এসে নারীদের এ সব কাজ থেকে একেবারেই দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আজ আর ঘর ঘর নেই। সন্তান-সন্ততির খোঁজ খবর নেয়া হয় না। নারী আজ বেপরোয়ার জগতে বাস করছে। দাম্পত্য জীবনের তাগিদ আজ আর তাদের ভেতরে নেই। এক কথায়, তাদের আজ সৎ স্বভাবা স্ত্রী বা পুরুষের প্রকৃত প্রেয়সী বলবার জো নেই। আজ তারা জীবন সংগ্রামের কঠিন ক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসেবে নিজেদের প্রমাণ দিয়ে চলছে। এরূপ পরিস্থিতিতে মানুষের জ্ঞানগত ও মানসিক বিপর্যয় দেখা দেয়া খুব স্বাভাবিক। অথচ এ দুটোর সুস্থতার উপর নির্ভর করছে গোটা মানব জাতির মর্যাদা।"

উপরের এ বর্ণনা দেখে আর কারো বুঝতে কি কষ্ট হবে যে, পাশ্চাত্যের নারীরা প্রাচ্যের নারীদের চাইতে বহুগুণে বেশী দৈন্য জর্জরিত ও দয়ার ভিখারী? এখানে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, ঘর সংসারের কাজ ভুলে বাইরের কাজ করতে গিয়েই সে দেশের নারীরা অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিস্থিতি ও অকথ্য অনাচারের শিকারে পরিণত হয়ে চলছে। এর পরিচয় আমরা সেখানকার মনীষীদের বর্ণনা থেকেই পেয়ে থাকি। সে ক্ষেত্রে আমাদের কি অধিকার রয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের ঘরের কথা আমাদের ডেকে শোনাচ্ছেন আর আমরা তা অবিশ্বাস করে চলব? সংসারের মালিক কি তার সংসারের খবর বেশী রাখে, না বাইরের লোকে বেশী খবর রাখে? তাঁদের বর্ণনাকে তাই ভুল বলে মনে করবার কোনই অবকাশ থাকতে পারে না। তাই বলছি পর্দা প্রথার বিলোপ সাধনই যদি নারীদের সুদিন ডেকে আনত কিংবা তাদের দুঃখ-কষ্ট বিন্দুমাত্রও লাঘব করত, তা হলে পর্দাহীন ইউরোপীয় নারীদের এতসব দুর্গতি দেখা দিল কেন?

বিবাহ বিচ্ছেদের হিড়িক কোথায় চলছে তা খতিয়ে দেখতে গেলেও আমরা এ কথাই জানতে পাই যে, সভ্যতা ও সম্পদের প্রাচুর্য যে দেশে সব চাইতে বেশী, বিবাহ বিচ্ছেদের মাত্রাও সে দেশেই সব চাইতে বেশী। সে দেশের পণ্ডিত ও দার্শনিক সমাজ তা দেখে চরম দুর্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে এবং এর কোনই প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছে না।

ফ্রান্সের বিখ্যাত "রিভিউ অভ রিভিউজে" সম্পাদকের অনুরোধক্রমে আমেরিকার

বিখ্যাত লেখক 'লুসেন' আমেরিকায় বিবাহ বিচ্ছেদের যে চরম হিড়িক দেখা দিয়েছে তার একটা খতিয়ান প্রকাশ করেন। তা এই পত্রিকার পঁচিশতম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তার থেকে আমরা জানতে পাই যে, আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স্ রাজ্যেই ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র এক বছরে ১৬২২টি বিবাহ বিচ্ছেদ দাবীর মামলা রুজু হয়েছে। অথচ সেখানে তার আগের বছরে মাত্র ৭৭০টি মামলা এ ব্যাপারে দায়ের করা হয়েছিল। এর থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সভ্যতা ব্রদ্ধির সাথে সাথে সে সব দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের মাত্রাও দ্রুত বেড়ে চলেছে।

সে রাজ্যেই আরও দেখা গেছে যে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গড়ে ১০৫ জনের ভেতরে একজন মাত্র বিবাহ করত। অথচ সভ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সে হারও কমে গিয়ে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রতি ১২২ জনে মাত্র একজন বিবাহিত পাওয়া গেল। এভাবে উত্তরোত্তর বিবাহের হারও কমে চলেছে।

আমেরিকার 'ওহিও' রাজ্যের আদমশুমারী ও হিসাব নিকাশ থেকে এরূপ দুঃখজনক পরিস্থিতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩৫ বছর আগে সেখানে এক বছরে ২২১৯৮টা বিয়ে রেজিস্ট্রী হয়েছে এবং তার ভেতরে ৮৩৭টা বিচ্ছেদ দেখা যায়। মানে, প্রতি সাড়ে ছাব্বিশ জনে একটা বিচ্ছেদ ঘটে। অথচ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৩৩৯৫৮টা বিয়ে রেজিস্ট্রী করা হয় এবং সে বছরে বিচ্ছেদের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৭৫৩টি, মানে, প্রতি সাড়ে বারটি বিয়েতে একটা বিচ্ছেদ গড়ে দেখা গেল।

আরও দেখা গেছে যে, মাত্র দশ বছরের ভেতরে সে দেশে বিয়ের সংখ্যা স্বাভাবিক অনুপাত থেকে ৮৪৮৮৯টা কমে গেছে। পক্ষান্তরে, বিচ্ছেদের আনুপাতিক সংখ্যা সে সময়ের ভেতরে ১১০০০ বেড়ে গেছে।

সেই প্রবন্ধকার এ সব সংখ্যার উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেনঃ

'সন্দেহ নেই যে, যদি আমেরিকায় নারী জীবনের উপরে আধুনিকতার বন্যা নেমে না আসত তা হলে 'ওহিও' রাজ্যে অন্যূন ৯৪২৫৬টা পরিবার গড়ে উঠত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম দেশ ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দু'হাজার বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। তার ভেতরে ৬৪১টারই বিচ্ছেদ ঘটে। মানে, প্রতি তিনটি বিয়ের একটা ভেঙ্গে গেল।

স্থূল কথা, 'রিভিউ অভ রিভিউজ' পত্রিকার সেই সংখ্যায় 'লুসেন' বিয়ে ও তালাকের যে সরকারী রিপোর্টের উল্লেখ করেছেন, তা থেকে আমেরিকার অধিকাংশ

রাজ্যে বিয়ে ও তালাকের যে সমানুপাতিক হার দেখা যায় তা নিম্নরূপঃ

কেন্টাকী	রাজ্যে	প্রতি	দশ	বিয়েতে	এক	তালাক
ম্যাসাচুসেট্‌স্	"	"	একুশ	"	"	"
রোজল্যাণ্ড	"	"	তের	"	"	"
চিকাগো	"	"	আট	"	"	"

আদমশুমারীর সে রিপোর্টে আরও জানা গেছে যে, চিকাগো আদালতে প্রতি বছর তিনশ' পঞ্চাশটা তালাক রেজিস্ট্রী হয়। অথচ সে শহরের লোকসংখ্যা তেইশ লক্ষের বেশী নয়। এ সব ঘটনার উল্লেখ করে পরিশেষে স্বয়ং 'লুসেন' লিখেছেনঃ

"সারকথা এই যে, আজ তালাকের সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে চলছে। এ ক্ষেত্রে সব চাইতে ভয়াবহ দুর্ভাবনার ব্যাপার এই যে, এর শতকরা আশিটা তালাকই নারীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের ভেতরে তালাকের ধারণা খুবই কম। কারণ, যে পুরুষ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দেয় তার সমাজে মুখ দেখানো ভার। তাই দেখা যায়, যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীর দৌরাত্ম্যে একেবারেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখনও তাকে তালাক দেবার কথা চিন্তা না করে অন্য স্ত্রী খুঁজে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন স্ত্রীলেক তাকে বিয়ে করতে রাজী না হয় , ততক্ষন সে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতে আদৌ প্রস্তুত হয় না।"

এই বিজ্ঞ লেখকই আমেরিকায় তালাক যে কত সস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে সম্পর্কে লিখেছেনঃ

"বহু হতভাগা স্বামী নিজ নিজ স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক প্রাপ্তির খবর তখনই জানতে পারে যখন স্ত্রীধন বা দস্তুর অন্য স্বামী নিয়ে দিব্যি আরামে ঘর করে চলে।"

এখন দেখা প্রয়োজন যে, তালাকের কারণ কি কি? বেশীর ভাগ তালাকের কারণ দাঁড়ায় এই-স্বামী, স্ত্রীর যথাযোগ্য ভরণ পোষণ দিতে পারে না এবং তাদের নিজের ওপরে চলার জন্য ছেড়ে দেয়।

মিঃ লুসেন লিখেছেনঃ

"১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বোষ্টন শহরে উচ্চতম আদালতের উদ্বোধন উপলক্ষে তিন দিন ধরে নর-নারীর বিরাট ভীড় জমে উঠেছিল। আশ্চর্য যে, তাদের সবাই ছিল তালাকপ্রার্থী! তাই পয়লা সপ্তাহেই ৭৫টি তালাক অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত দেখা গেছে যে, পুরুষরাই স্ত্রীদের তালাক দিয়েছে।"

মোদ্দা কথা, এসব হিসাব নিকাশ ও অনভিপ্রেত ঘটনাবলী পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, 'আল্ মারআতুল্ জাদীদা'র বিজ্ঞ লেখক তালাকের যে সব কারণ নিয়ে আহাজারী করেছেন, তা বেশী পরিমাণেই দেখা যাচ্ছে তাঁরই স্বর্গ দেশে তথা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্ববৃহৎ কেন্দ্রে। যদি পর্দা প্রথাই সব অনর্থের মূল হত, তাহলে এটা অপরিহার্য ছিল যে, তথায় কিছুতেই নারীদের এরূপ শোচনীয় পরিস্থিতি দেখা দিত না।

অবশ্য আমার কাছে আমেরিকার তালাকের ভয়াবহ ও আশংকাজনক হার শুনে আশ্চর্যবোধ করবেন। মূলতঃ আমি এতে আদৌ অতিরঞ্জনের প্রশ্রয় দেইনি। কারণ, সেখানের মনীষীদের থেকেই আমি এসব সংগ্রহ করেছি। 'রিভিউ অভ রিভিউজ' এর সেই সংখ্যায়ই এসব হিসাব নিকাশ উল্লেখ করার পরে মন্তব্য করা হয়েছেঃ

"যা হোক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ছাউনিতে আজ আগুন লেগে গেছে। বেশী করে আগুন লাগাবার চেষ্টায় রয়েছে। বরং মাঝ থেকেও অতি দরদীরা বেশী করে আগুন লাগাবার চেষ্টায় রয়েছে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সংসার তথা জীবন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার কাজে আধুনিক নারীদের হাতই বিশেষভাবে সক্রিয় রয়েছে।

উপরের আলোচনার ওপরে একটা উড়ন্ত পাখীর দৃষ্টি ফেলেও যে কেউ অগত্যা মেনে নিতে বাধ্য হবে যে, নারীদের দুর্গতির যেসব অভিযোগ তোলা হচ্ছে তার যথাযথ প্রতিকারের জন্য আমাদের কিছুমাত্রায় সভ্য হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে মাত্র। আর সে শালীনতা কেবলমাত্র পর্দা প্রথার স্থায়ী প্রবর্তন দ্বারাই রক্ষা পেতে পারে– অন্য কিছুতে নয়।

কারণ, এটাই হচ্ছে নারীদের একমাত্র রক্ষাকবচ, আর এর ফলেই পুরুষরা তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব থেকে ছিনিয়ে বাইরে টেনে এনে চরম লাঞ্ছনার মুখে নিক্ষেপ করতে সমর্থ হবে না। দেখা গেছে, যেখানেই নারীরা তাদের নির্দিষ্ট সীমারেখা ছেড়ে বাইরে পা রেখেছে, তাদের মর্যাদা সেখান থেকেই লোপ পেয়ে চলেছে। ফলে, অচিরেই তারা ধ্বংস ও অধঃপতনের চরম গুহায় আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। আধুনিক সভ্যতায় তাদের অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এ ব্যাপারটা আমি ভালভাবেই প্রমাণ করে এসেছি। তাই বলছি যে, নেহাৎ মামুলী একটা ব্যবস্থার দ্বারাই নারী জাতি তাদের মাতৃত্বের মর্যাদার আসন অলংকৃত করে চলতে পারে এবং নিজেদের দাম্পত্য জীবন ভিত্তিক সংসারকে প্রেম প্রীতিময় সোনার সংসারে পরিণত করতে পারে।

এই একক দীক্ষার মাধ্যমেই মানব সমাজ সর্ববিধ ব্যাধি ও অনাচারমুক্ত হতে পারে। অন্ততঃ তা এত কমে যাবে যে, তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হবে। এর ফলে ঘর-সংসারের যে শ্রী ফিরে আসবে তা সুনিশ্চিত। তা হয়ে দাঁড়াবে সর্ববিধ কল্যাণ ও সুখের আকর। এ প্রথা এসে গোটা পরিবারকেই আনন্দমুখর করে তুলবে।

আমার এ দাবীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেতে পারি আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত ও অভিজাত পরিবারের জীবন প্রণালী থেকে। তাদের সব পরিবারে প্রায়ই একটা সুখময় পরিবেশ বিরাজ করছে। দুর্নীতি ও অনাচারের প্লাবন থেকে তারা অনেকটা মুক্ত। অথচ আরেক দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জড়সভ্যতার চরম উন্নত দেশগুলোর পারিবারিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। দৈনন্দিন সেখানে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য বিদায় নিয়ে চলছে এবং আশংকাজনক ভাবেই সে পরিস্থিতি ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। এসবের প্রমাণ আমরা উপরে উদ্ধৃত হিসাব নিকাশ থেকেও মোটামুটি পেয়ে গেছি। আলোচনা বেড়ে যাবার ভয়ে আমি এখানে অধিক প্রমাণ নিয়ে ঘাটাঘাটি করলাম না।

এটাতো সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, ইউরোপীয় দেশগুলোর যেসব পুরুষ ও নারী বেশীর ভাগ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে থাকে, তারা আমাদের দেশের সে সব নর-নারীর থেকে অনেক বেশী শিক্ষা ও সভ্যতার অধিকারী যাদের ভেতরে বিচ্ছেদের ব্যাপারটা কদাচিৎ দেখা যায় মাত্র। তাই যদি আমাদের এ দেশের নারীরা অশিক্ষিতা বিধায় তালাকের মাত্রা বেশী দেখা দিত, তা হলে ইউরোপের উচ্চশিক্ষিতা নারীদের ভেতরে কেন তা ভয়াবহরূপে বিস্তৃতি লাভ করে চলছে? এসব আলোচনা থেকে আমরা পরিষ্কার এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, তালাকের প্রাচুর্য দেখা দেয়ার জন্য দায়ী পর্দা পথা বা নারী শিক্ষার অভাব নয়—অন্য কিছু বটে।

এবারে আরেক প্রশ্ন আলোচনা করছি। যদি আমাদের এখানে পুরুষরা নারীদের মর্যাদার চোখে দেখতে রাযী নয় বলেই ভাত কাপড় দিতে নারাজ হত, তাহলে জড়সভ্যতার অনুসারীদের ভেতরে এ আপদ মোটেই দেখা দিত না। কারণ, নারীর প্রতি অবজ্ঞা তো তাদের ভেতরে নেই। তারা সবাই নারীর মর্যাদা দিচ্ছে বলে দাবী করছে। তারা যতখানি নারী দরদী আর নারীদের তারা যতখানি খাতিরদারী করে চলছে, তার লেশমাত্রও নাকি প্রাচ্যজগতে দেখা যায় না।

আমরাও মেনে নিলাম যে, তাদের দাবীই ষোলআনা সঠিক। তবে এ প্রশ্নের আমরা কি জবাব দিতে পারি যে, তাদের দেশের পরিসংখ্যান বিভাগের রিপোর্টগুলোতে যত তালাকের হিড়িক দেখা যাচ্ছে, তার মূলে বেশির ভাগ দেখা

যাচ্ছে স্ত্রীকে ভাত-কাপড় না দেয়া? এর জবাবে তো আর আমাদের এ কথা বলার যো নেই যে, তারাও নারীদের অমর্যাদার চোখে দেখে। কারণ সেটা তাদের প্রকাশ্য দাবীর একেবারেই বিপরীত কথা। তারা তো নারীদের দরদে জান-মাল সবই উৎসর্গ করে বসে আছে। যদি তাদের সে জন্য আমরা মূর্খ বা অসভ্য ভাবি তাও বিলকুল ভুল হবে। কারণ, ইউরোপে এমন একটা মানুষ বের করা দুঃসাধ্য, যে মানুষটি কিছুমাত্র লেখাপড়া জানে না। তাই মনেতে হবে যে, রোগ এগুলো নয়, অন্য কিছু।

নারী স্বাধীনতার দাবীদাররা বড় জোর দিয়েই এ কথাটা বলে থাকে যে, পর্দা প্রথা পুরুষদের দেখেশুনে স্ত্রী বেছে নেবার পথে বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি করে চলছে। এই পর্দার দরুনই ভাবী দম্পত্তি পারস্পরিক জানাশোনা ও বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে স্থায়ী দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পায় না। বিশেষ করে পুরুষরা তাদের জীবন-সংগিনীকে গ্রহণ করতে গিয়ে এতটুকুও জানার সুযোগ পায় না যে, ভাবী জীবন তাকে নিয়ে সুখে কাটানো যাবে কিনা। তাই দেখা যায়, তালাকের মূলে প্রধানত পর্দা প্রথাই দায়ী।

আমাদের কথা হচ্ছে, প্রথমত আমাদের স্তরে বা আমাদের মাঝামাঝি ধরনের শিক্ষিত মহলের ভেতরে তালাক এতই কম দেখা যায়, যাতে এককথায় তার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। তাই বলতে হয় যে, যদি পর্দা প্রথার দরুন পারস্পরিক জানাশোনার অসুবিধার ফলেই তালাকের মাত্রা বেশি দেখা দিত, তাহলে আমাদের এ দু' শ্রেণীর ভেতরেই তালাকের মাত্রা বেশী দেখতে পেতাম। আমাদের দেশে তো শুধু নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের ভেতরেই কিছুটা বেশী তালাক দেখা যায়। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মহলের ভেতরে তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বিয়ের আগে ভাবী স্ত্রীকে তাড়িয়ে বাজিয়ে দেখে নেয়াটাই যদি তালাকের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়াত, তা হলে যে ইউরোপে নারীদের রাস্তাঘাটে, বাসে, রেস্তোরাঁয় যথেচ্ছা জানার ও বুঝার সুযোগ রয়েছে নারী স্বাধীনতার বদৌলতে, যার ফলে তারা খোদার ইচ্ছায় হাজার ধরনের লাঞ্ছনাও ভোগ করে চলেছে, সেখান কেন তালাকের মাত্রা সবচাইতে বেশী দেখা যাচ্ছে? তারা বেশ করে তাদের ভাবী স্ত্রীদের যেভাবে যখন যেথায় ইচ্ছা পরীক্ষা-নিরীক্ষা যত ধরনের হতে পারে, অবাধে যতদিন ধরে খুশী, চালিয়ে নেয়। অথচ সেখানের আশংকাজনক তালাকের হিড়িক দেখে তো তাদের সুধী সমাজ কঠিন দুর্ভাবনার ভিতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এমন কি তার ফলে সে দেশে ব্যাপক ধ্বংস দেখা দেওয়াও অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়ত, পর্দা বিরোধী বন্ধুদের দাবী মতে "ইশ্‌ক-মহব্বতের মাধ্যমে যদি বিয়ে হয়, তাহলে নাকি আর সেখানে কোনদিন তালাকের প্রশ্ন দেখা দেয় না। আর তা হতে পারে শুধু পর্দা প্রথার অবর্তমানে। পর্দা ব্যবস্থা তালাক বন্ধের এই একমাত্র হাতিয়ারটাই নাকি লোপ করে দিয়েছে।" যদি এ কথাই সত্যি হয়, তাহলে ইউরোপে তো ইশ্‌ক-মহব্বতের সয়লাব বয়ে চলছে। তাতে নাকানি চুবানি না খেয়ে তো সে দেশের কেউ কখনো বিয়ে করছে না। এমন কি কোর্টশীপের বিধান মোতাবেক বিয়ে না হলে সেটাকে বিয়ে বলেই আইনগত স্বীকার করা হয় না। তবুও বুঝতে পারছি না যে, সে দেশে মহান ইশ্‌কের সেই অচ্ছেদ্য বন্ধনগুলোও কি করে এত ঘন ঘন বিচ্ছেদের শিকারে পরিণত হয়?

এ ব্যাপারটা যারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে চান, তারা অবশ্যই আমার ওপরোল্লিখিত উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলোকে সামনে নিয়ে বিচারে বসবেন। তাহলে এ রহস্যের গভীর অতলে প্রবেশ করে সব কারণ খুঁজে বের করতে পারবেন। তা না হলে ভাসা ভাসা শ্লোগান শুনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। আর তার ফলে মূলে পৌঁছার সুযোগ নাও ঘটতে পারে। তাই তার জন্য এটাও প্রয়োজন যে, জীবন পদ্ধতির সবদিকই গভীর দৃষ্টি নিয়ে দেখবেন এবং তার অনুকূল ও প্রতিকূল সব ব্যাপারগুলো খুঁটে খুঁটে দেখে জ্ঞানের মানদণ্ডে তা ভাল করে যাচাই করে নেবেন। তা হলেই সেই কল্পিত ব্যাধির মূল রহস্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

এখন এ কথার আলোচনা বাকী রয়েছে যে, আমাদের জীবনধারায়ও এরূপ ব্যাধির উৎপত্তি কিরূপে হল? সে ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, আমাদের দেশের যেসব নর-নারীর ভেতরে এ ব্যাধিটা প্রবল দেখা যায়, তারা শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে একেবারেই বঞ্চিত। আমার ধারণা, যদি তাদের কিছুটা শিক্ষাদীক্ষা লাভেরও ব্যবস্থা থাকে, তাহলে আমাদের সমাজ এতখানি সংশোধিত হয়ে যাবে যে, অপর জাতি তা দেখে হিংসায় জ্বলে মরবে এবং হয়তো তা তাদের পথও দেখাবে। আমরা তখন গোটা দুনিয়ার অনুকরণযোগ্য হয়ে দাঁড়াবো।

আমার এ দাবী প্রমাণহীন নয় আদৌ। এর জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের ভেতরে সেসব ব্যাধি নেই বললেই চলে। তাই আমরা যদি এর চাইতেও ব্যাপকহারে শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের ভেতরে এরূপ সুদিন দেখা দেবে, যখন আমাদের এই সভ্যতাপ্রিয় সুধী বন্ধুদের আজকের সভ্যতার মত এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে না।

মোট কথা, আমাদের নারীদের বেলায় দেশে যেসব হাল্কা কারণে অবিচার অনাচার দেখা যাচ্ছে, তা সামান্য চেষ্টায়ই অল্প সময়ে দূর হতে পারে। এ জন্য আমাদের পক্ষে এটা আর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে না যে, আমাদের প্রচলিত জীবন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টিয়ে নিয়ে নতুন জীবন ব্যবস্থা গোড়া থেকে শুরু করব ও প্রাচীন সৌধকে চুরমার করে নতুন সভ্যতার ইমারত গড়ে তুলব। আমাদের তো দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, পর্দা প্রথা আমাদের ভেতরে খোদার বিশেষ অনুগ্রহরূপে বিরাজ করছে এবং তা আমাদের জন্য খোদাদত্ত রক্ষাকবচ। পর্দা প্রথাই আমাদের সমাজকে নানা ধরনের দুষ্টক্ষত থেকে রক্ষা করছে আজও।

পক্ষান্তরে, ইউরোপের সমাজ জীবনে পর্দাহীনতা এরূপ ভয়াবহ ও স্থায়ী আভ্যন্তরীণ ব্যাধি সৃষ্টি করেছে যার প্রতিকারের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ইউরোপের অবস্থা জানে, সে নিশ্চয়ই এ কথাটা স্বীকার করবে।

মনীষী 'ঈদোলী' প্যারিসের কাউণ্ডারস্ কলেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক সাহিত্যিক টমাস কার্লাইলের বিখ্যাত 'Heroes & Heroes Worship' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

"সন্দেহ নেই যে, আধুনিক যুগের জটিলতা বড়ই ভয়াবহ ও মারাত্মক। সঙ্গে সঙ্গে এও বলা চলে না যে, গোটা ইউরোপের পূর্বাকাশে এ উষার আভাস শুধু আজই দেখা দিয়েছে।"

ওপরের এ ভূমিকাটুকু জুড়ে নিয়েই তিনি সমগ্র ইউরোপের অনেকগুলো ধারাবাহিক বিপ্লব বিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছেন যা সর্বদাই মানব জীবন ধারায় অশান্তির প্লাবন নামিয়ে এনেছে। তারপর তিনি কার্লাইলের নীচের উদ্ধৃতিটা প্রমাণ স্বরূপগ্রহণ করে মন্তব্য করেছেন যে, সে সবের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বিপর্যয় দেখা দেয়া অপরিহার্য। তাই ইউরোপের জীবন ধারায় অশান্তি ও অস্থিরতা দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক।

টমাস কার্লাইল লিখেছেন ঃ

"এটা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার যে, অসত্য ও কৃত্রিমতার পর্দা ফাঁক হয়ে একদিন না একদিন সত্যের আলো বেরিয়ে আসবে। এ সত্য যে ধরনের হোক আর যেভাবেই আসুক না কেন, স্বরূপে প্রকাশ পাবেই। সত্যের জয় অনিবার্য বলেই হোক, কিংবা ফরাসী বিপ্লবের নামে অথবা অন্য যে কোন উপায়ে হোক–অবশেষে যে আমরা

সত্যের দিকেই ফিরে আসব তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সত্যের কথা আমি বলছি তা যেদিন আত্মপ্রকাশ করবে, অসত্যকে জ্বালিয়ে ছারখার করার জন্য জাহান্নামের আগুনই নিয়ে আসবে, এছাড়া অন্য কোন উপায়ে তার আবির্ভাব সম্ভবপর নয়।"

এত কিছু আলোচনার পরেও যদি আমাদের ভেতরে এমন কেউ থাকে যার এসব ভীতিপ্রদ সতর্কবাণী ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণেও সম্বিৎ ফিরে না এবং এরপরেও সে ইউরোপের জড়সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের জন্য জিদ ধরে বসে থাকে, বিশেষ করে নারী স্বাধীনতার সমস্যা নিয়ে তবুও বাড়াবাড়ি করতে চায়, তা হলে তার দাওয়াই আর আমাদের হাতে নেই। কারণ, আমি এ ব্যাপারে ইউরোপের সমগ্র চিত্রটাই তুলে ধরেছি এবং সে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সেখানকার কল্যাণকামী মনীষীরা কিভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন তাও দেখিয়েছি। তাঁরা আজ সব বিখ্যাত পত্রিকাতেই এর বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তাঁরা এ পর্যন্ত লিখেছেন যে, আমাদের সমাজ জীবনের সামিয়ানার শুধু দু'দিকেই আগুন লাগেনি, বরং তার মাঝখানেও আগুন লেগে গোটা সামিয়ানা জ্বলতে বসেছে। সেসব উচ্চশিক্ষার অধিকারী মনীষীরা এন্‌সাইক্লোপেডিয়ায় এও লিখেছেন ঃ

"পরিণামে এ অবস্থা থেকে কিভাবে আমরা মুক্তি পেতে পারি? যদি এ কোন অপ্রতিষেধ্য বিপর্যয় না হয়ে থাকে তাহলে তার প্রতিকার কিসে?"

ঊনবিংশ শতাব্দীর এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার এ বাক্যটি আমি এর আগেও একবার উদ্ধৃত করেছি।

নারীর যথোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা

নারী স্বাধীনতা সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হল। এর সব দিকই পুংখানুপুংখরূপে ঘেটেঘুটে সঠিক জ্ঞান ও বিবেকের মানদণ্ডে তা বিচার বিবেচনা করে আমরা অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমাদের নারী সমাজ তথাকথিত ভূ-স্বর্গ ইউরোপের নারী সমাজের তুলনায় হাজার গুণ ভাল অবস্থায় রয়েছে। তাদের ভেতরে বর্তমানে যা কিছু অন্যায় অবিচার দেখা যাচ্ছে, তা দূর হতে পারে একমাত্র দূরদর্শিতার ভিত্তিতে কায়েম করা শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার থেকে।

তাই আমাদের আজ সেরূপ একটা নিখুঁত ব্যবস্থা খুঁজে বের করতে হবে। নারীদের প্রয়োজনীয় ও যথোপযোগী শিক্ষাদর্শ খুঁজে বের করে সমাজের বর্তমান অনাচারটুকুও মুছে ফেলতে হবে। তা হলে নির্ঘাত আমাদের সেই আদর্শ ব্যবস্থাই অনুসরণ করতে হবে যা খোদায়ী বিধানের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর সত্য বাহক সরোয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থার সাথে পূর্ণ সঙ্গতি রাখে। তিনিই নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمات

অর্থাৎ ঃ বিদ্যা অর্জন করা প্রতিটি নর-নারীর জন্য ফরয। সুতরাং এ হাদীস মেনে নেয়া আমাদের ওপরে যে অপরিহার্য তাতে সন্দেহ নেই। তিনি আরও বলেছেন ঃ

خذ الحكمة ولايفرق من اى دعاء خرجت ؟

অর্থাৎ ঃ জ্ঞান আহরণ কর। কার ডাকে তুমি জ্ঞানের পথে চললে, সে ভেদাভেদ ভাবতে যেয়ো না।

তাই নারীদের যথোপযোগী ও যথার্থ শিক্ষা দুনিয়ার যেখানেই থাক না কেন আর যে জাতির কাছেই পাই না কেন, তা গ্রহণ করতে আমাদের বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে এতটুকু সংকীর্ণতাও মনে স্থান দেয়া উচিত নয় যে, যাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা অনুসরণ করতে যাচ্ছি, ঐহিক ও পারলৌকিক ক্ষেত্রে তারা আমাদের সমকক্ষ কি না।

অপরদিকে আমাদের এ কথাটাও সাথে সাথে খেয়াল রাখতে হবে যে, কোন কিছু গ্রহণ করতে হলে তার আগে আমাদের জ্ঞান ও বিবেক নিয়ে সে জিনিসকে ভালভাবে যাচাই না করে অন্ধভাবে ঝুঁকে পড়া কিছুতেই ঠিক হবে না। এ ক্ষেত্রেও আমাদের প্রিয় রাসূলের (সঃ) নির্দেশ হচ্ছে ঃ

المؤمن فطن حذق

অর্থাৎ ঃ ঈমানদার হবে জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন।

তাই আমাদের হারানো ইউসুফ যদি একান্তই কোনখানে মিলে যায়, তাহলে তাকে আমরা বিনা দ্বিধায় মাথায় তুলে নিব। সেক্ষেত্রে তো আমরা বড় রকমের এক ধর্মীয় নির্দেশই কার্যকরী করার সুযোগ পেয়ে যাব। যেমন, রাসূলে খোদা (সঃ) নির্দেশ করেছেন ঃ

الحكمة ضالة المؤمن يأخذها انى وجدها

অর্থাৎ ঃ জ্ঞান হচ্ছে ঈমানদারের হারানো মানিক। যেখানেই পাবে তুলে নিবে।

যদি আমরা আমাদের কাম্য বস্তু কোথাও দেখতে না পাই, তাহলে আপন মন ও মগজ খাটিয়ে তা বের করে নিব। জ্ঞান ও চিন্তা শক্তির সাহায্যে নিজেরাই এরূপ এক পথ আবিষ্কার করে নিব, যা মানব সমাজের মর্যাদা ও প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়। এ জন্য আমরা নিখিলের স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করতেও ভুলব না। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিবেন। ঐশী মদদের হাত এসে তখন আমাদের এদিক ওদিক ব্যর্থ প্রয়াস চালানো থেকে বিরত রাখবে। কারণ, খোদা তো আমাদের পথ দেখাবার ওয়াদা করেছেন। তাঁর ওয়াদা সত্য ও অটুট। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ .

অর্থাৎ ঃ আর যারা আমার পথ খুঁজে ফিরে তাদের আমি অবশ্যই আমার পথ দেখাই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআ'লা সৎলোকের সাথে থাকেন।

আমার ধারণা এই যে, দুনিয়ার অন্যান্য জাতির ভেতরে নারী শিক্ষার যে পদ্ধতি ও ব্যবস্থা রয়েছে, তার থেকে কাটছাট করে কিছু বের করে নেয়া কঠিন পরিশ্রম ও দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নেয়ার শামিল। কারণ, সে সব জাতির মনীষীরা প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন যে, তাদের ভেতরে নারী শিক্ষার যে পদ্ধতি রয়েছে তার পরিণাম খুবই

ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। তাই সে পদ্ধতি যে ব্যাপকভাবে রদবদলের প্রয়োজন তা না বললেও চলে। এ অবস্থায় তাদের অনুসরণ করতে যাওয়া যে চূড়ান্ত বোকামীর পরিচায়ক তাতে আর সন্দেহ কি? এরূপ নির্বুদ্ধিতা তো ক্ষমার অযোগ্য। তা ছাড়া যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান রয়েছে সে কখনও তা সমর্থন করতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপদেশ না মানার অর্থই হচ্ছে নিজকে কঠিনতর বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া ও অজস্র বিপদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা।

ইউরোপের নারী শিক্ষা পদ্ধতি যে অশেষ ক্ষতিকর ও নারী প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী তা প্রমাণ করার জন্য এখন আমি পৃথিবীর সবচাইতে সভ্য ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতির নারীশিক্ষা পদ্ধতিকে সামনে রেখে আলোচনা করতে চাই। তা কোন্ জাতি? দুনিয়ার বুকে যাদের জীবন পদ্ধতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সবচাইতে উত্তম বলে বিবেচিত হয়ে চলছে। আমি অবশ্য আমার দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য সে দেশের আজেবাজে লোকের মতামত নেব না। বরং যাঁরা সে দেশে শিক্ষাদীক্ষা ও মনীষায় সবার শীর্ষস্থানীয় তাঁদের মতামতই তুলে ধরব। আমি সেসব মনীষীর অভিমতই উদ্ধৃত করব যাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাজাত্যপ্রীতি ও মর্যাদা মেনে নিতে সে দেশে দ্বিমত দেখা যায় না।

বিখ্যাত ইব্রানী দার্শনিক সোল সাইমনের মর্যাদা বিশেষভাবে ফ্রান্স ও সাধারণভাবে সমগ্র ইউরোপে দিবালাকের চাইতেও উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি 'রিভিউ অভ রিভিউজের' অষ্টাদশ সংখ্যায় লিখেছেন ঃ

"১৮৪৮ সনের সবার কাছে এ অভিযোগ শোনা যেত যে, নারীদের শিক্ষা ও সভ্যতার দিকে আদৌ লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আজ দেখছি তার উল্টা অভিযোগ শুরু হয়েছে। আজ আবার বলা হচ্ছে যে, নারীদের শিক্ষাদীক্ষা সীমালংঘন করে যাচ্ছে। হ্যাঁ-অবশ্যই তাদের অবস্থাটা চরম অবনতি থেকে উন্নতির সীমা ছাড়িয়ে এখন মারাত্মক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।"

এরপরে এই বিজ্ঞ দার্শনিক যে শিক্ষাপদ্ধতি নারীকে পুরুষ হবার প্ররোচনা যোগায় তার বিরুদ্ধে চীৎকার দিয়ে বলে উঠলেন ঃ নারীর নারী থাকাই অপরিহার্য।

তারপর তিনি নারীদের এই বাউণ্ডুলেপনার দরুন ঘর সংসারের কি দুর্গতি দেখা দেয় তা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এটা আমি আগেই আলোচনা করে এসেছি এবং হুবহু উদ্ধৃত করে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। তাই তার পুনরালোচনা অনাবশ্যক মনে করি।

এসব কথা তো ফ্রান্সের মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কেই বলা হল। এখন যদি আপনারা সভ্যতার তীর্থভূমি ইংল্যান্ডের অবস্থা জানতে চান, তা হলে তাদের নারী শিক্ষার ভ্রান্ত পদ্ধতি সম্পর্কে মনীষী শ্যামুয়েল স্মাইলাস যা বলেছেন হুবহু তাই আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তাঁকে ইংল্যাণ্ডের অন্যতম সেরা লেখক ও নৈতিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম গুরু বলে সবাই মেনে নিয়েছে। তাঁর বহু গ্রন্থ ফরাসী ও ইউরোপের অন্যান্য বিখ্যাত ভাষায় অনূদিত হয়ে বহুল প্রচার লাভ করেছে। তিনি তাঁর 'আল্ আখ্লাক নামক পুস্তকে লিখেছেন ঃ

"রোমকদের যে কোন অভিজাত ও ভদ্রঘরের মহিলার জন্য ঘরকন্না ও সেলাইয়ের কাজে নিজকে ব্যাপৃত রাখাই ছিল প্রশংসার ব্যাপার। আমাদের যুগে বলা হয় যে, নারীদের ততখানি রসায়ন শাস্ত্র শেখা দরকার যা থেকে সে হাড়ি পাতিলে পাকের সময় উথলে ওঠা বস্তুকে সামলে নিতে পারে। ভৌগোলিক শিক্ষাও তার এতটুকু দরকার যে, নিজের ঘরের দোর জানালা ও আলো বাতি রাখার ব্যবস্থাটা নির্ভুলভাবে করতে পারে।"

এছাড়া যে লর্ড বায়রন নারীদের উপরে মাত্রাতিরিক্ত আসক্ত ছিলেন এবং নারীদের অনুসরণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে যাঁর বদনামের সীমা নেই, তিনিও লিখেছেন যে, নারীদের লাইব্রেরীতে তৌরাত ও পাকপ্রণালী ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থই থাকা উচিত নয়। নারীদের চরিত্র ও প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড বায়রনের এ অভিমত অত্যন্ত কঠোর ও অযৌক্তিক মনে হয়।

কথা হচ্ছে যে, একদিকে তো এতখানি কঠোর সিদ্ধান্ত নারীদের ব্যাপারে নিয়ে রাখা হয়েছে, অপরদিকে আজকাল তার সম্পূর্ণ বিপরীত মতও যথেষ্ট দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় দলের সে উন্মাদনা ভাবিয়ে তোলার মত ও প্রকৃতির বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ, দ্বিতীয় পক্ষ নারীদের এতখানি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পক্ষপাতী যাতে করে যথাসম্ভব তারা পুরুষদের সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমর্থ হয়। এমন কি নর ও নারীর ভেতরে দেহগত পার্থক্য ছাড়া যেন আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। রাজনীতিতেও যেন তাদের পুরোপুরি স্থান দেয়া হয় এবং নারীরা যেন কঠোর জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদায় পুরুষের সাথে সমকক্ষতা করে চলতে পারে।

এর থেকে আপনারা ইউরোপের সেরা দেশ দুটোর অবস্থা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করলেন। এখন শুনুন আমেরিকার কথা। আমেরিকার নারীশিক্ষা ব্যবস্থা অনুপযোগিতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টির জন্য সেখানকার বিখ্যাত প্রবন্ধকার 'লুসেন'-এর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত সাময়িকী

'রিভিউ অভ রিভিউজ'-এ সম্পাদকের অনুরোধক্রমে আমেরিকার নারীদের সব দিক আলোচনা করে একটা অমূল্য প্রবন্ধ দিয়েছিলেন। পঁচিশতম সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে মিঃ লুসেন নারীদের স্কুল কলেজগুলোর বিস্তারিত হাল হকিকত তুলে ধরেছেন। তিনি তাতে লিখেছেন ঃ

"কিন্তু এরূপ মনে না করে উপায় নেই যে, সে স্কুল কলেজগুলো এ জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেন নারীরা তাতে লব্ধ শিক্ষা দীক্ষাকে জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আরেক কথায় মহিলা ডাক্তার, মহিলা ইঞ্জিনিয়ার, মহিলা ব্যারিস্টার ইত্যাদি হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তারা সে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

তাই দেখা যায় যে, সেসব স্কুল-কলেজে নারীদের সুসভ্য ও চরিত্রবতী করে তোলার ব্যবস্থা খুবই কম। মানে নারীসুলভ শিক্ষার তাতে একান্তই অভাব। অথচ তাদের যা শেখানো হচ্ছে তা খুবই শক্ত। নারীরা অগত্যা সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো, যথা রসায়ন বিদ্যা, জড় বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদি শেখার জন্য আদা জল খেয়ে লেগে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, তরুণী সেসব কঠিন বিষয়েও শীর্ষস্থান অধিকার করে ডিগ্রী হাসিল করে থাকে এবং যাবতীয় বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আসে, ঘর-সংসারের ক্ষুদ্রতম ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্রও জ্ঞান থাকে না।"

এসব অভিমত তাঁরাই দিচ্ছেন যাঁরা সেখানকার ঘর-সংসারেরও কর্তা। তাঁদের মতামতকে কি করে আমরা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেব?

তাই আমি মুসলিম সমাজকে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রচলিত নারীশিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণের জন্য তখনই পরামর্শ দিতে পারি, যখন ওপরের মতামতগুলোকে সম্পূর্ণ বাজে বলে মনে করতে পারি। কিংবা তাঁরা যত বড় মনীষীই হোন না কেন এবং যতই সে দেশের শীর্ষস্থানীয় বলে বিবেচিত হোন না কেন, তাঁদের মূর্খ ও ধাপ্পাবাজ বলে আখ্যায়িত করি। হাঁ-আমরা যদি ততখানি নেমে আসতে পারি, তা হলে যাকে ইচ্ছে অনুসরণ করতে পারি এবং কোন কিছুই আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না। কিন্তু, যদি সত্যকে স্বীকার করে নেবার সৎসাহস রাখি এবং তা অনুসরণ করারও ইচ্ছে রাখি, তাহলে আমাদের ওপরে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় ইউরোপের অবস্থাটাকে বিবেচনা করে দেখার সাথে সাথে যেসব কাজ তাদের এরূপ বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিয়েছে তা থেকে আমাদের বাঁচার চেষ্টা চালানো। তা হলে আর আমাদের মনীষী সোল সাইমনের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হবে না ঃ

"আগে আমাদের ভেতরে নারী শিক্ষার অভাব বলে অভিযোগ উঠত এবং আজ তার বদলে আমরা নারী শিক্ষায় বাড়াবাড়ির কান্না জুড়ে দিয়েছি।"

সারকথা

আমি আমার গোটা আলোচনায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাজাত এমন সব অকাট্য দলীল প্রমাণের সন্নিবেশ ঘটিয়েছি যা অস্বীকার করার মানে চোখে দেখা ও হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করা ব্যাপারকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। অবশ্যি সেটা একেবারেই অসম্ভব কথা। তবুও আমার এ ভয়টা রয়েই গেল যে, আমার দীর্ঘ আলোচনাটি কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়ে ক্রমাগত যেভাবে চালিয়ে এনেছি, তাতে পাঠক-পাঠিকাদের স্মৃতি বিভ্রাট ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা হয়তো নারীদের পর্দা প্রথার অপরিহার্যতা কিসে, সে মোদ্দাকথাটুকুই ভুলে আছেন।

তাই আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে, নারীদের পর্দা প্রথার অপরিহার্যতা সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে যে যুক্তি প্রমাণের উল্লেখ করে এসেছি, সেগুলোই দুচার পৃষ্ঠার ভিতরে মোটামুটিভাবে আবার বলে দিব। তাহলে একবার দৃষ্টি বুলিয়েই সমগ্র ব্যাপারটি যে কেউ সহজে আয়ত্ত করে ফেলতে সমর্থ হবে। তবে সেগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ গোটা বইয়ে ছড়িয়ে আছে। আমি তা সাথে সাথে স্মরণ করে নেবার ভার পাঠক-পাঠিকার ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। তাঁরা যেন প্রয়োজন হলে গোটা বই আবার পড়ে ফেলেন।

আমার সমগ্র আলোচনার সারকথা এই ঃ

(১) পুরুষের তুলনায় নারী দৈহিক দিক থেকে বেশ দুর্বল। তুলনামূলকভাবে জ্ঞানোপার্জনের ক্ষমতাও তাদের কম। নারীর ভেতরে যা ন্যূনতা তা এ জন্য নয় যে, তারা পুরুষের অধীন হয়ে হেয় জীবন যাপন করবে। বরং তাদের স্বাভাবিক ও বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য এর চাইতে অধিক ক্ষমতা তাদের প্রয়োজনীয় নয়। এটা হচ্ছে নেহাৎ প্রকৃতিগত ব্যাপার। তাই নারীরা সবাই মিলে যদি যুগ যুগ ধরে হাজার সাধনা ও সংগ্রাম চালাতে থাকে, তবুও দৈহিক ও মননের দিক থেকে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করা তাদের পক্ষে কোনদিন সম্ভবপর হবে না।

(২) প্রত্যেক সৃষ্ট জীবেরই একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নারীর বৈশিষ্ট্য তাদের দৈহিক ও জ্ঞানিক যোগ্যতা-নির্ভর নয়, বরং তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্মিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষমতাভিত্তিক। সেদিক থেকে নারীরা পুরুষের চাইতে অনেকগুণে অগ্রগামী ও উঁচু

পর্যায়ের। বলা বাহুল্য নারীর সূক্ষ্ম ও সতেজ অনুভূতি শক্তি এবং তাদের অশেষ কোমল মনোভাব ও অপরের কল্যাণে স্বীয় সর্বস্ব বিলীন করার সদিচ্ছা ইত্যাদি গুণাবলীতে তারা পুরুষকে সর্বদাই হার মানিয়ে এসেছে।

তাই, যদি এসব অতুলনীয় ও অমূল্য গুণাবলী নারীর ভেতরে সুন্দরভাবে বিকাশ লাভের জন্য স্বাভাবিক ও যথোপযোগী পরিবেশ পায়, তাহলে তাদের অধিকার আদায় ও উপভোগের জন্য পুরুষের মত তাদের ঢাল-তরবারির সাহায্য নিতে হয় না ; বরং এসব আত্মিক শক্তির দুর্বার প্রভাব তাদের সমাজের বুকে এরূপ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যে, সব পুরুষই তাদের সামনে মাথা নত করে দেয় আপনা থেকেই।

কিন্তু স্রষ্টার বিধানই এরূপ যে, নারীরা এ আত্মিক শক্তি ততদিন পর্যন্ত অর্জন করতে পারবে না যদ্দিন তারা পুরুষের আওতাধীন হয়ে তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত না হবে। বর্তমান অবস্থায় অবদানের দিক থেকে যতই তারা পুরুষদের হার মানিয়ে দিক না কেন, এমন কি তাদের দাসে পরিণত করেই নিক না কেন, তবুও এ কথা বলা চলবে না যে, নারীরা পুরুষদের স্বীয় গুণাবলীর সাহায্যে বন্দী করে রাখতে পেরেছে। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে তাদের সেই হাতিয়ারই ভোঁতা হয়ে যাবে এবং তাদের নিজস্ব গুণাবলীর ঔজ্জ্বল্যে ভাটি লাগবে। তার ফলে তারা এমন এক টানা হেঁচড়া ও সমস্যার পড়ে যাবে, যা তাদের আদৌ অভিপ্রেত নয়।

(৩) নারী তাদের সে বৈশিষ্ট্য তদ্দিন অর্জন করতে পারবে না যদ্দিন তারা গিন্নী বা মা হয়ে ঘর সংসার, সন্তান লালন পালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় আত্মনিয়োগ না করবে। এটা শুধু কর্তব্য সম্পাদনের খাতিরেই কর্তব্য চালানো নয় ; বরং নারীর স্বভাবজাত প্রতিভার পতিপালন ও স্ফুরণ ব্যবস্থা। তাদের আভ্যন্তরীণ প্রেরণা ও অনুভূতির সঠিক বিন্যাস তখনই হতে পারে যখন সে প্রেয়সী কিংবা জননীরূপে জীবন যাপন করে চলে। কারণ, এ জন্যই তাদের দৈহিক ও আত্মিক বিশেষ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(৪) নারীদের পুরুষের কাজকারবারে অংশগ্রহণ এবং বাইরের জীবন সংগ্রামের কঠোর ক্ষেত্রে তাদের পাশাপাশি স্থান নেয়ার অর্থই এই যে, তারা নিজেদের স্বাভাবিক শক্তিগুলোকে স্বহস্তে গলা টিপে মারল এবং স্বীয় প্রতিভাগুলোকে চিরতরে লোপ করে দিল। ফলে তাদের বৈশিষ্ট্যই শেষ হয়ে যাবে এবং সমাজের বুকে তারা আপদ হিসেবেই বেঁচে থাকবে।

তাই দেখা যায় যে, ইউরোপের নারীদের ঘর-সংসারের বাইরে গিয়ে পুরুষদের সাথে কাজ করাটা সে দেশের মনীষীদের বিবেচনায় জাতির অন্তরে ও দেহে মারাত্মক আঘাতস্বরূপ। তা থেকে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষ ইচ্ছে করলে নারীদের কঠিন বিপদে ঠেলে দিতে পারে। তাই সে দেশের মনীষীরা নারীদের আবার ঘরে ফিরিয়ে আনার ওপরে পুরোপুরি জোর দিচ্ছেন।

(৫) সাধারণভাবে মানব জাতির কল্যাণ ও বিশেষ করে নারী জাতির মঙ্গলের জন্যই তাদের পর্দায় থাকা অপরিহার্য। কারণ, পর্দা হচ্ছে নারী স্বাধীনতা ও অধিকারের রক্ষাকবচ এবং তা কিছুতেই তাদের লাঞ্ছনা ও বন্দী জীবনের পরিচায়ক নয়। আমি এ কথাও প্রমাণ করে এসেছি যে, পর্দা কিছুতেই নারী জীবনে পূর্ণতা আনয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। বরং তা তাদের সার্থক জীবনের সব উপায়-উপকরণ জুগিয়ে দেয়। অবশ্য দুনিয়াতে কিছুই অবিমিশ্র ভাল নয়। তাই পর্দায় যদিও কিছুটা ক্ষতিকর দিক রয়েছে, তবু তার মোকাবেলায় তাতে এতগুলো ভাল দিক রয়েছে যে, তার মূল্য ও গুরুত্ব মানব সমাজের পক্ষে অপরিমেয়।

তার ভেতরে সবচাইতে ভাল ও উজ্জ্বল দিক হল, পর্দা নারীদের স্বাভাবিক দায়িত্বের বাইরে পা রাখতে দেয় না। বস্তুত, সেই সব প্রকৃতিসম্মত কাজের ভেতরেই নিহিত রয়েছে নারীদের সর্ববিধ কল্যাণ। এ পর্দাই নারীদের অমূল্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রতিপালিত করে উজ্জ্বলরূপে বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়। সেগুলো হচ্ছে তাদের জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার একক হাতিয়ার।

(৬) জড়সভ্যতাপুষ্ট নারীদের বাইরের চাকচিক্য যতই দেখা যাক না কেন এবং তাদের ব্যাপার যতই চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, তারা কিছুতেই পূর্ণরূপে নারী নয় এবং নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনের পথে কোনদিনই তারা পা রাখতে সমর্থ হবে না। তাই সে দেশের মনীষীরাই এর বিরুদ্ধে সুর তুলেছেন এবং এই প্রবাহ বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছেন।

(৭) ইউরোপ ও আমেরিকার সব দেশেই নারী শিক্ষা পদ্ধতি তাদের প্রকৃত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে আদৌ কল্যাণকর হয়নি। তার সাক্ষ্য আমরা কিছু আগেই সে দেশের মনীষীদের মতামত থেকে পেয়ে এসেছি।

(৮) ইসলাম নারীদের ব্যাপারে যে পথ দেখিয়েছে, তা নারীর স্বভাব প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি খাপ খায়। মনে হয় যেন ইসলামের শিক্ষাগুলো নারীদের যাবতীয়

বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা ভালভাবে গড়ে তোলার ছাঁচস্বরূপ। অর্থাৎ যদি সেই শিক্ষা অনুসারে নারীদের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিপালিত হয়, তাহলে মুসলিম মা-বোনরা নিজদের স্বাভাবিক দায়িত্ব ভুলে বাইরে পা রাখার কথা ভুলে গিয়ে স্বীয় সীমারেখার ভেতরে থেকে নিজদের পূর্ণ ও স্বার্থক নারীরূপে প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে।

(৯) মুসলিম মহিলাদের ভেতরে নারীত্বে উচ্চতম ও পূর্ণতম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে শুধু এতটুকুই অভাব রয়েছে যে, তারা প্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকুও পাচ্ছে না। যখন তাদের ততটুকু শিক্ষা দেয়া হবে, তখন তাদের ভেতরে আর কোন কিছুরই অভাব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এই নয়টা মৌলিক কথার সমর্থনেই আমি যত রকমের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাজাত দলীল প্রমাণ জড়ো করে আমার দাবী প্রমাণিত করে এসেছি। আমি আধুনিক দুনিয়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা ও সবচাইতে খ্যাতনামা মনীষীদের মতামত দ্বারা আমার দাবীকে জোরালো করতে প্রয়াস পেয়েছি। তদুপরি আমি এ আলোচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছি। যদিও সে পথ ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কঠিন, তবুও সে পথে চলার ভেতরে আমার দুটো উদ্দেশ্য রয়েছে।

প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে পর্দা প্রথার সমর্থকদের দাবী জোরদার করে তোলা। তারা যেন পর্দা বিরোধীদের হামলায় ঘাবড়ে গিয়ে আবার নিজদের অনুসৃত ভাল জিনিসকে বর্জন না করে বরং দৃঢ়তার সাথে তা আঁকড়ে থাকে। সাথে সাথে তারা যেন তাদের অনুসৃত পন্থার সারবত্তা ও সত্যতা বুঝতে পারে। তারা যেন জানতে পারে যে, দুনিয়ার বুকে যত আন্দোলন বাহ্যত যে ভাবেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, অবশেষে তার গতি কার্যত প্রকৃতির বিধানের মূল কেন্দ্রের দিকেই ফিরে আসবে। আর প্রকৃতির বিধান তো সে পথেরই নির্দেশ দেয় যা আমাদের সত্য ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছে।

আসল কথা এই যে, মুসলমানদের ভেতরে মূলত খারাপ বা অনুতাপ করার মত কোন কাজই নেই। তারা অবশ্যই নিত্য নতুন ভ্রান্ত প্রবাহের বিরুদ্ধে প্রকৃতিস্থভাবে আত্মরক্ষা করে চলার ফরয আদায় করে যাচ্ছে। এর ফলে তারা জড়সভ্যতার পাগলা ঘোড়ার সাথে দৌড়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতি থেকে যতই পেছনে পড়ে থাকুক না কেন, তা তাদের ভেতরগত কোন দৌর্বল্য বা ব্যাধির জন্য নয় মোটেই। হ্যাঁ–কতিপয় বাহ্যিক ও ক্ষণস্থায়ী দুরবস্থা তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যা সামান্য প্রচেষ্টায়ই দূর হতে পারে। সেটুক দূর হলেই মুসলমানদের পূর্ব শক্তি ও সামর্থ্য ফিরে আসবে। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে মুসলমানরা স্থিরতা ও দৃঢ়তায় জড়সভতার অনুসারীদের

চাইতে নিঃসন্দেহে বেশী যোগ্য।

জড়সভ্যতা মানবতার চেহারা বিগড়ে কুশ্রী করে ফেলেছে এবং মানব প্রকৃতিকে প্রায় সব দিক থেকেই মুছে ফেলার ব্যাপারে আদৌ ত্রুটি করেনি। এমনকি এর ফলে জড়বাদীদের ভেতরে এরূপ হাজার ধরনের ধ্বংসাত্মক ব্যাধি দেখা দিয়েছে যা শীঘ্রই তাদের দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে বিদায় দেবার হুমকি দিচ্ছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আমাদের যেসব ভাইরা অহেতুক হাত গুটিয়ে পর্দা বিলোপের পেছনে লেগে গেছে, তারা যেন অন্তত এতটুকু মেনে নিতে বাধ্য হয় যে, আমরা শুধু সংস্কার ও রেওয়াজ রীতির অন্ধ অনুসরণের খাতিরেই পর্দা প্রথার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি না ; বরং আমাদের এ কাজ প্রকৃতির বিধানের সংরক্ষণ ও সহায়তার জন্যই করা হচ্ছে। প্রকৃতি কি বস্তু? তা হচ্ছে দ্বীন ইসলাম। আমি সেই প্রকাশ্য সত্যের নির্দেশিত দায়িত্বই প্রতিপালন করে যাচ্ছি, দুনিয়ার বুকে যে সত্যের বিধান মুসলমানদের পর্দার শিক্ষাই দিয়ে চলছে।

আশা করি, এর ফলে হয়তো আমার সেই মাননীয় বন্ধুরা ভেবে চিন্তে পর্দা ছিঁড়ে ফেলার বদলে জুড়ে রাখার জন্যই উদ্বুদ্ধ হবেন। তাঁরা হয়তো এর ফলে আমাদের সুরে সুর মিলিয়ে অচিরেই সেই সামাজিক ব্যাধি দূর করার প্রয়াস পাবেন, যা আমাদের আশু বিপদ ডেকে আনার উপক্রম করছে। এভাবে আমরা জাতি ও ধর্মের খাতিরে সেই পবিত্র দায়িত্বটাকে একযোগে সম্পাদন করে চলব যার অপরিহার্যতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও বিবেক সর্বদাই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

- আমীন-

পরিশিষ্ট

নারী স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বিশ্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের অভিমত

"নারীর নারীই থাকা উচিত"। হ্যাঁ–অবশ্যই নারীকে নারী থাকতে হবে। তাতেই তাদের কল্যাণ এবং এই একমাত্র বৈশিষ্ট্যই তাদের কল্যাণকর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। প্রকৃতির বিধান এটাই। এভাবেই প্রকৃতি তাদের পথের নির্দেশ দিয়েছে। তাই তারা নিজেদের যতখানি প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়ায়ে চলবে, তাদের মর্যাদা ও সাফল্য ততখানিই বেড়ে চলবে। আর যতই তারা প্রকৃতির ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে থাকবে, ততই তাদের বিপদ বেড়ে যাবে।........ যে নারী ঘরকন্না ছেড়ে বাইরের কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, সন্দেহ নেই যে, সে পূর্ণাঙ্গ এর কর্মী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে আর নারী থাকে না।

– সোল সাইমন (ইউরোপের বিখ্যাত জড়বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক)

*   *   *

"যেসব নারী সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি দাম্পত্য জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করে, স্রষ্টা যে উদ্দেশ্যে তাদের বিশেষ ধরনের দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা দান করেছেন, সেটাই তারা বেমালুম ভুলে চলছে। তাদের মেজাজ ও প্রকৃতিতে তাই আজ আর সে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মাধুর্য নেই, যা তাদের বয়সী অপর নারীদের ভেতরে স্বভাবতই দেখা যায়। তারা আজ এমন এক স্তরে এসে পৌঁচেছে যে, 'নপুংসক' ছাড়া তাদের আর কিছুই বলার জো নেই।"

– অধ্যাপক জিওম ফ্রেয়ারো (মানবীয় জীবন পদ্ধতির বিখ্যাত সমালোচক)

*   *   *

"আমার মতে 'নারী স্বাধীনতা আন্দোলন' নগ্ন উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছুই নয়। দুঃখের বিষয়, এরা আজ এমন এক উন্মাদনায় মেতে চলেছে। তাদের এ অপকর্ম পরিষ্কার প্রমাণ করছে যে, তারা নিজেদের মূল্য বুঝবার ও দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা হারিয়ে বসেছে। আজ যদি তোমাদের দাবী অনুসারে নারীরা সব অধিকার হাসিল করে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা শুরু করে দেয়, তাহলে বন্ধুরা আমার, খুব

ভালভাবে জেনে রেখ, তাদের বাড়াবাড়ি সীমা ছাড়িয়ে চলল। পরিণামে পূর্ণ দাসী বৃত্তিই তাদের ভাগ্যে ফিরে আসবে।"

–মনীষী প্রুডেন (বিশ্ববিখ্যাত সমাজবাদী দার্শনিক)

* * *

"যেভাবে আমাদের যুগে নারীর সামাজিক অবস্থা নিয়ে বিভ্রান্তির ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়ে চলেছে, এ ধরনের বিপ্লব ও বির্বতন মানব জাতির ইতিহাসে প্রত্যেক যুগেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির বিধান নারী শ্রেণীকে সর্বদাই ঘরকন্নার কাজে নিয়োজিত রেখে আসছে। এ বিধানে কোনদিনই বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয়নি। স্রষ্টার এ বিধান এতই সঠিক ও সুচিন্তিত যে, যুগে যুগে এতসব বিভ্রান্তি ও বিপ্লব দেখা দেয়া সত্ত্বেও এতে কোন ব্যতিক্রম দেখা দেয়নি। এ শাশ্বত বিধান হাজার বাধার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে অব্যাহত গতিতে সব আন্দোলনের ওপরে মাথা তুলে চলছে।

–অগাস্ট কোঁতে (জড়-দর্শনের জনক)

* * *

"মেয়েদের লাইব্রেরীতে ধর্মগ্রন্থ ও পাক-প্রণালী ছাড়া আর কোন বই থাকা উচিত নয়।" –লর্ড বায়রন

* * *

নারীরা দিন দিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতই উন্নতি লাভ করছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতই তারা এগিয়ে চলেছে, পুরুষরা ততই তাদের তালাক দিয়ে চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এ তালাকের হিড়িক মাত্রা ছাড়িয়েছে। এ ব্যাপার আজ এরূপ ভয়াবহ স্তরে পৌঁচেছে যে, প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কিংবা অন্য সব দেশের লোক তা কল্পনাও করতে পারবে না।

– ম্যাডাম ডাফরিনো

* * *

পুরুষদের বিয়েতে অরুচি আর বিচ্ছেদে রুচি বিশেষ করে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে দিন দিন যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারতা লাভ করছে। আজ নারীদের উচ্ছৃঙ্খলাচরণ ও উম্মাভাবের যে মারাত্মক পরিণতি সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করছে, তার যথাবিহিত প্রতিকার সম্পর্কে আইন প্রণেতাদের সতর্ক হতে হবে।

–বিভিউ অভ রিভিউজ (ফ্রান্সের বিখ্যাত সাময়িকী)

*   *   *

যা ভেবে সব চাইতে বিস্মিত হতে হয় তা হচ্ছে এই যে, অতীতেও রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক বিপ্লব ও বিপর্যয়ের মূল্যে যে কারণ সক্রিয় ছিল আজও হুবহু তাই দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ সে ধরনের উঁচু পর্যায়ের অবনতি ও বিপর্যয়ের ব্যাপারে নারীর রহস্যজনক হাতই বেশী কাজ দিয়েছে।

– মনীষী লুই পেরুল

*   *   *

"ঐতিহ্যবাহী রোমকগণ! যে বিধান তোমাদের স্ত্রীদের অনুগত রাখছে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত করেছে, তা তুলে দিয়ে তোমরা তাদের নিত্য নতুন মর্জী ও বাসনার সাথে তাল রেখে চলতে পারবে কি? এত সব বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও তাদের কতটুকু স্বদায়িত্বে নিয়োজিত রাখতে পেরেছ? মনে রেখ, আজ যদি তারা সামান্যতম প্রশ্রয়ও পায় তাহলে একদিন সব ক্ষেত্রেই তোমাদের সাথে সমকক্ষতা করতে চাইবে এবং তাদের সে সাম্যের দাবী না মেনে তোমাদের গত্যন্তর থাকবে না।"

– মনীষী কাটন (বিখ্যাত রোমক দার্শনিক)

*   *   *

আধুনিক নারীদের অবস্থা আজ কি দাঁড়িয়েছে? তারা বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের জীবন যাপন করছে। কাজ-কারবারের গোটা দুনিয়ায় পুরুষের একচেটিয়া রাজত্ব চলছে। এমন কি সেলাই ও শিল্পের কাজেও পুরুষরা দখল জমিয়ে বসেছে। ফলে, নারীদের করতে হচ্ছে যত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ও প্রাণান্ত পরিশ্রমের কাজ। এখন বলুন, সর্ববিধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতা নারীরা কি উপায়ে জীবন ধারণ করবে? তারা কি চরখা চালিয়ে খাবে, না রূপ দেখিয়ে দেহের বেসাতি চালাবে? অবশ্য তাও তাদের সবার থাকলে তো?"

–মনীষী ফাওরিয়া

*   *   *

"আমাদের আধুনিক সমাজে নারী স্বাধীনতার যে চরম দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে, তাদের নির্লজ্জ চালচলন ও হাসি-তামাসা, হাবভাব ও সাজসজ্জা বিশেষত তাদের রূপের প্রদর্শনী, যে তুমুল মহড়ার আয়োজন চলছে, তাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে,

আমাদের ওপরে রোমকদের চাইতেও কঠিন বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসছে। নারীদের রং ঢং ও হাল ফ্যাসানের চালচলন যে মানব চরিত্রের ওপরে বিষময় প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, তা শুধু আমরা আগে অনুভব করছি না, বরং আমাদের খ্যাতনামা সাহিত্যিকরাও এ ব্যাপারে জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি লাভ করছে, তাতেও নারীদের এই বল্গাহীন চালচলন ও চরম বেহায়াপনার চিত্র আঁকা হয়েছে। যেসব নারী এ উন্মাদনার চরমে পৌঁচেছে, প্রসাধন ও বিলাস ব্যসনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে ঘর সংসার উজাড় করে চলছে, তাদের থেকে কিভাবে যে আমরা মুক্তিলাভ করব তা বুঝতে পারছি না। তারা আজ শালীনতা ও সভ্যতার মাথা খেয়ে বসেছে এবং সমাজ ব্যবস্থার মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলার উপক্রম করেছে। এক কথায় বলা চলে–এ রোগের দাওয়াই নেই।

এশিয়ার কেউ যদি আমাদের এসব শুন্তে পায়, তাহলে আঁৎকে উঠবে। কারণ, এসব তাদের কল্পনারও বাইরে। কিন্তু সে বেচারারা এর বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস পাবে না। তারা ভেবে চলছে ঃ শিক্ষা ও সভ্যতায় ইউরোপ আমাদের অনেক উর্ধ্বে। তাই ইউরোপের সব কাজই ভাল। যা খারাপ দেখায়, তা হয়ত আমরা বুঝতে অপারগ বলেই খারাপ মনে হচ্ছে। আমাদের চিন্তা শক্তি তা বুঝবার মত এখনও উন্নত হয়ে ওঠেনি। তাই ইউরোপীয়দের সমালোচনা করার অধিকার আমাদের এশিয়াবাসীদের নাই।'

-(এন্সাইক্লোপেটী)

*   *   *